৩য় খণ্ড

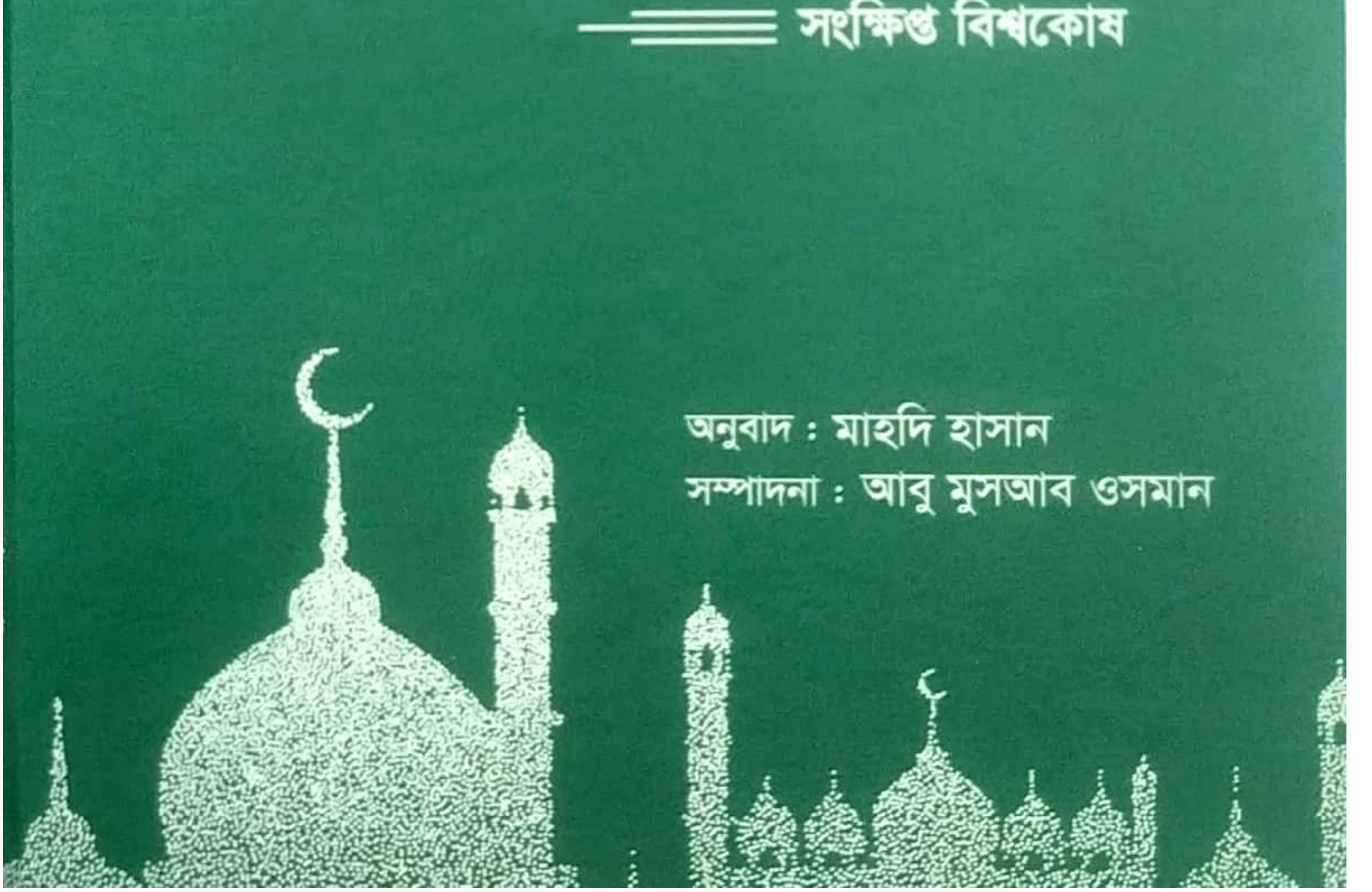
ইসলামপূর্ব যুগ থেকে নিকট অতীত

ইসলামি ইতিহাস

সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ

অনুবাদ : মাহদি হাসান

সম্পাদনা : আবু মুসআব ওসমান



ইসলামি ইতিহাস

সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ

ইসলামি ইতিহাস

সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ
[ইসলামপূর্ব যুগ থেকে নিকট অতীত]

তৃতীয় খণ্ড

আব্বাসি খিলাফত আমলে প্রতিষ্ঠিত

মাকতাবাতুল হাসান

ইসলামি ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ (৩য় খণ্ড)

প্রথম প্রকাশ : মুহাররম-১৪৪১/সেপ্টেম্বর-২০২০

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল [illegible]

গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স

৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com - niyamahshop.com - wafilife.com

ISBN : 978-984-8012-60-4

Web : maktabatulhasan.com

মূল্য : ৩১০০/- টাকা মাত্র [৫ খণ্ড একত্রে]

Islami Itihash Sonkhipto Bissokosh (3rd Part)

Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh

E-mail : rakib1203@gmail.com Facebook/maktabahasan

* * *

وَمَا فَتِئَ الزَّمَانُ يَدُوْرُ حَتّٰى   مَضٰى بِالْمَجْدِ قَوْمٌ آخَرُوْنَا

وَأَصْبَحَ لَا يُرٰى فِي الرَّكْبِ قَوْمِيْ   وَقَدْ عَاشُوْا أَئِمَّتَه سِنِيْنَا

وَآلَمَنِيْ وَآلَمَ كُلَّ حُرٍّ   سُؤَالُ الدَّهْرِ : أَيْنَ الْمُسْلِمُوْنَا؟

কালের অবিরাম পদচারণা এখনো আছে চলমান; ওদিকে গৌরব-মর্যাদার পথে ভিন্ন জাতি ধাবমান,

বছরের পর বছর যারা দিয়েছে নেতৃত্ব, আমার সে স্বজাতি আজ কাফেলায় গরহাজির-অপস্রিয়মাণ!

আমায়-তোমায় স্বাধীন সকলকে পীড়া দেয় কালের নিঠুর প্রশ্ন—কোথায় হারাল, কোথায় লুকাল রাহবার জাতি মুসলমান?

* * *

সংক্ষিপ্ত সূচি

পঞ্চম অধ্যায়

আব্বাসি খিলাফত আমলে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

কয়েকটি বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রের ইতিহাস

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আন্দালুস রাষ্ট্রের ইতিহাস

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উবায়দি সাম্রাজ্যের ইতিহাস

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জিনকি ও আইয়ুবি রাষ্ট্রের ইতিহাস এবং ক্রুসেড-বিরোধী জিহাদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মামলুক রাষ্ট্রের ইতিহাস

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়

আব্বাসি খিলাফত আমলে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ-১৭

কয়েকটি বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রের ইতিহাস

ভূমিকা ১৯

১. রুস্তমিয়া রাষ্ট্র ২১

রুস্তমিয়া শাসকদের তালিকা ২২

২. ইদরিসিয়া রাষ্ট্র ২২

ইদরিসিয়া রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য কীর্তি-অবদান ২৪

ইদরিসিয়া রাষ্ট্রের শাসকগণের বংশলতিকা ২৬

৩. আগলাবিয়া রাষ্ট্র ২৭

আগলাবিয়া রাষ্ট্রের শাসকগণের তালিকা ২৯

৪. মরক্কোর বনু যিরি রাষ্ট্র ৩০

যিরি রাজপরিবারের বংশলতিকা ৩৩

৫. তুলুনিয়া রাষ্ট্র ৩৪

তুলুনিয়া রাষ্ট্রের শাসকগণের তালিকা ৩৬

৬. ইখশিদিয়া রাষ্ট্র ৩৭

ইখশিদিয়া রাষ্ট্রের শাসকগণের তালিকা ৩৯

৭. বনু হামদান রাষ্ট্র ৪০

বনু হামদানের বংশলতিকা ৪২

৮. সামানিয়া রাষ্ট্র ৪৩

সামানিয়া রাজপরিবারের বংশলতিকা ৪৫

৯. গজনবি (সুবুক্তগিন) রাষ্ট্র ৪৬

সুবুক্তগিন রাজপরিবারের শাসকগণের বংশলতিকা ৪৯
১০. খোরাসান ও মাওয়ারাউন নাহার-কেন্দ্রিক খোয়ারিজম রাষ্ট্র ৫০
খোয়ারিজম শাসকগণের তালিকা.................................. ৫২
১১. ঘুরি রাষ্ট্র.. ৫২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-৫৫

আন্দালুস রাষ্ট্রের ইতিহাস

আন্দালুসে মুসলিম জাতি.. ৫৭

আন্দালুসের ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রথম স্তর

উমাইয়া খিলাফতের অনুগত শাসনব্যবস্থার কাল...................... ৬০

আন্দালুসের ইসলামি সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় স্তর

খিলাফতের কর্তৃত্বমুক্ত স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থার কাল........... ৭১
১. আবদুর রহমান আদ-দাখিল ও আন্দালুসে উমাইয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা.. ৭১
অভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহের সমাধান................................ ৭১
বহিস্থ সমস্যাসমূহের সমাধান ৭৩
স্থিতিশীল অধ্যায়ের সূচনা ৭৫
২. হিশাম বিন আবদুর রহমান.................................. ৭৭
৩. হাকাম বিন হিশাম বিন আবদুর রহমান আদ-দাখিল ৭৯
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হাকামের কঠোর আচরণ ৭৯
৪. আবদুর রহমান বিন হাকাম.................................... ৮১
নরম্যান জলদস্যুদের হামলা ৮২
মুসতারিবিনদের বিদ্রোহ... ৮৩
দ্রষ্টব্য : পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ অনুধাবনে সহায়ক কিছু তথ্য ৮৫

আন্দালুসের ইসলামি সাম্রাজ্যের তৃতীয় স্তর

ক্ষয় ও বিভক্তির কাল বা প্রথম বিভক্তির কাল ৮৭

বিষয় পৃষ্ঠা

আন্দালুসের ইসলামি সাম্রাজ্যের চতুর্থ স্তর

ক্ষয় ও বিভক্তির পর পুনরায় সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি অর্জনের কাল ৯০

১. আবদুর রহমান আন-নাসির লি দ্বীনিল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ৯০

অভ্যন্তরীণ সমস্যা দূরীকরণে আবদুর রহমানের গৃহীত নীতি ও পদক্ষেপ ৯১

দ্রষ্টব্য : ইবনে হাফছুনকে নিয়ে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মিথ্যাচার ৯২

বহিস্থ খ্রিষ্টানরাষ্ট্রের মোকাবিলায় আবদুর রহমান আন-নাসির ৯৩

নিজেকে খলিফাতুল মুসলিমিন ঘোষণা ৯৫

২. হাকাম আল-মুসতানসির বিল্লাহ বিন আবদুর রহমান আন-নাসির ৯৭

হাকামের শাসনামলে আন্দালুসের বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনের পরিস্থিতি ... ৯৮

আন্দালুসের ইসলামি সাম্রাজ্যের পঞ্চম স্তর

হাজিব পদবিধারী আমিরিয়া পরিবারের কর্তৃত্বের কাল ১০০

২য় হিশাম বিন হাকাম বিন আবদুর রহমান আন-নাসির ১০০

আন্দালুসের ইসলামি সাম্রাজ্যের ষষ্ঠ স্তর

দ্বিতীয়বার বিভক্তি এবং আন্দালুসে উমাইয়া শাসনের পতনের কাল ১০৬

আন্দালুসের উমাইয়া শাসকগণের তালিকা ১০৭

আন্দালুসের ইসলামি সাম্রাজ্যের সপ্তম স্তর

গোষ্ঠীভিত্তিক বিভক্ত রাষ্ট্রশাসকদের শাসনকাল ১১০

মুসলমানদের পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং খ্রিষ্টানদের রাজ্য বিস্তৃতি...... ১১২

লাঞ্ছনার মাঝে এক টুকরো বীরত্ব-গৌরব! ১১২

গোষ্ঠীভিত্তিক বিভক্ত আন্দালুসের উল্লেখযোগ্য শাসকপরিবারের তালিকা ১১৫

আন্দালুসের ইসলামি সাম্রাজ্যের অষ্টম স্তর

আন্দালুসে মাগরিবকেন্দ্রিক মুরাবিতি শাসনের কাল ১১৭

বিষয় পৃষ্ঠা
মুরাবিতি সাম্রাজ্য পরিচিতি ১১৭
জাল্লাকার যুদ্ধ (Battle of Zallaqa) ১১৯
দ্রষ্টব্য : ইউসুফ বিন তাশফিন ইতিহাসের এক অবমূল্যায়িত বীর যোদ্ধা ! ১২৫
মুরাবিতি শাসকগণের তালিকা ১২৬
আন্দালুসের ইসলামি সাম্রাজ্যের নবম স্তর
আন্দালুসে মাগরিবকেন্দ্রিক মুওয়াহহিদি শাসনের কাল............ ১২৭
মুওয়াহহিদি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ বিন তুমার্তের আত্মপ্রকাশ ১২৭
আরিকের যুদ্ধ (Battle of Alarcos) ১২৯
ইকাবের যুদ্ধ ১৩০
মুওয়াহহিদি শাসকদের তালিকা ১৩১
আন্দালুসের ইসলামি সাম্রাজ্যের দশম স্তর
গ্রানাডায় বনু আহমার (বনু নাসর)-এর শাসনকাল ১৩২
আত্মসমর্পণের শর্তসমূহ ১৩৮
পতন-পরবর্তী সময়ে আন্দালুস থেকে ইসলাম নিশ্চিহ্নকরণ ১৪১
আন্দালুসের মরিস্কোদের জীবনে নেমে আসা দুর্যোগের কিছু খণ্ডচিত্র ১৪২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ-১৪৫
উবায়দি সাম্রাজ্যের ইতিহাস

উবায়দি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস.. ১৪৭
দ্রষ্টব্য : একক খিলাফতব্যবস্থা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের সেতুবন্ধন..... ১৪৯
উবায়দি সাম্রাজ্যের প্রথম স্তর
খলিফাদের কর্তৃত্ব ও সমৃদ্ধির যুগ.. ১৫০
মাগরিব অঞ্চলে অব্যাহত গোলযোগ ও বিদ্রোহ মোকাবিলা......... ১৫০

বিষয় | **পৃষ্ঠা**
উবায়দি শাসকদের মিশর জয়ের প্রচেষ্টা ১৫৩
কায়রো নগরীর পত্তন এবং জামে আযহার প্রতিষ্ঠা ১৫৫
দরজিয়া (The Druze) সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ ১৫৯
উবায়দি সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় স্তর
উজিরদের কর্তৃত্বের যুগ ১৬৩
উবায়দি (ফাতিমি) সাম্রাজ্যের খলিফাগণের তালিকা................ ১৭১
উবায়দি (ফাতিমি) সাম্রাজ্যের খলিফাগণের বংশলতিকা........... ১৭৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ-১৭৫
জিনকি ও আইয়ুবি রাষ্ট্রের ইতিহাস এবং ক্রুসেড-বিরোধী জিহাদ

ইসলামি প্রাচ্যে ক্রুসেড আগ্রাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস............... ১৭৭
ক্রুসেড আগ্রাসনের কার্যকারণসমূহ এবং ক্রুসেড আগ্রাসন মোকাবিলায় মুসলিম উম্মাহর সংগ্রামী জিহাদ ১৭৭
প্রথম ক্রুসেড.. ১৭৭
প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রুসেড হামলার মধ্যবর্তী সময়ের পরিস্থিতি ১৮৩
ইমাদুদ্দিন জিনকির পিতা হাজিব আক সুনকুর তুর্কমানির পরিচিতি.. ১৮৪
ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় ইমাদুদ্দিন জিনকি ১৮৫
জিনকি পরিবারের আতাবিক পদবিধারীদের বংশলতিকা ১৯০
দ্বিতীয় ক্রুসেড ১৯১
নুরুদ্দিন-সালাহুদ্দিন মনোমালিন্য ১৯৯
সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদের ইন্তেকাল ২০১
সুলতান নুরুদ্দিনের ইন্তেকাল-পরবর্তী পরিস্থিতি ২১৯
আইয়ুবি রাষ্ট্রের সুলতানদের বংশলতিকা.............................. ২২২
সালাহুদ্দিন আইয়ুবির পিতা নাজমুদ্দিন আইয়ুব বিন শাযির পরিচিতি.. ২২২

বিষয় পৃষ্ঠা
হিত্তিনের যুদ্ধ ২২৪
আল-কুদস পুনরুদ্ধার ২২৭
শত্রুর সঙ্গে আচরণে সুলতান সালাহুদ্দিনের উদারতা ২২৯
তৃতীয় ক্রুসেড ২৩১
চতুর্থ ক্রুসেড ২৪৪
পঞ্চম ক্রুসেড ২৪৫
ষষ্ঠ ক্রুসেড ২৪৭
দ্বিতীয়বার আল-কুদস পুনরুদ্ধার ২৫০
সপ্তম ক্রুসেড ২৫১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ-২৫৫

মামলুক রাষ্ট্রের ইতিহাস

মামলুক পরিচিতি ২৫৭
এক. বাহরি (সালিহি) মামলুক রাষ্ট্র ২৫৯
সাইফুদ্দিন কুতুজের দায়িত্বগ্রহণ ২৬০
শাসকদের অপরিণামদর্শী আচরণ, ক্ষমতা রক্ষার জন্য পারস্পরিক লড়াই এবং শত্রুর বিষয়ে উদাসীনতা ২৬১
ইযযুদ্দিন বিন আবদুস সালাম ২৬৩
তাতারি আগ্রাসন মোকাবিলায় মুসলমানদের অভিযান ২৬৩
আইনে জালুতের যুদ্ধের এক বিস্ময়কর দৃশ্যপট ২৬৪
আয-যাহির রুকনুদ্দিন বাইবার্স বুনদুকদারি ২৬৬
হালাকু খানের চাচাতো ভাই বার্কে খানের ইসলাম গ্রহণ ২৬৬
বার্কে খানের ইন্তেকাল ২৬৮
নতুন করে তাতারদের হুমকি ২৬৮
ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সুলতান বাইবার্স ২৬৯

বিষয়	পৃষ্ঠা

অষ্টম ক্রুসেড ২৭২

নবম ক্রুসেড ২৭৪

দ্রষ্টব্য : অমুসলিমদের ধর্মত্যাগে বাধ্য করা ইসলামে বৈধ নয় ২৭৭

হিমসের যুদ্ধ ২৭৭

হালাকু খানের বংশধর গাজানের ইসলাম গ্রহণ ২৮১

গাজানের শাম দখলের প্রচেষ্টা ২৮২

তাতারি দুর্যোগ মোকাবিলায় ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর অবিস্মরণীয় ভূমিকা ২৮২

শাকহাবের যুদ্ধ ২৮৪

শিয়াদের পুনরুত্থান ২৮৫

বাহরি মামলুক রাষ্ট্রের সুলতানগণের তালিকা ২৮৮

দুই. সার্কাসি (বুরজি) মামলুক রাষ্ট্র ২৯১

তাতারি হুমকি আরও একবার! ২৯২

সুলতান আল-আশরাফ বার্সবাই ২৯৩

সাইপ্রাস বিজয় ২৯৪

সার্কাসি (বুরজি) মামলুক রাষ্ট্রের সুলতানগণের তালিকা ২৯৮

মানচিত্র সূচি

বিষয় পৃষ্ঠা

মানচিত্র নং-৭

মুরাবিতিদের আন্দালুস শাসন (৪৮৪-৫৩৯ হিজরি) ১২৫

মানচিত্র নং-৮

অষ্টম-দশম খ্রিষ্টীয় শতকে মুসলিম ভূখণ্ড ও শত্রু ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা ১৩৯

মানচিত্র নং-৯

একাদশ ও দ্বাদশ খ্রিষ্টীয় শতকে মুসলিম ভূখণ্ড ও শত্রু ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা ১৪০

মানচিত্র নং-১০

ত্রয়োদশ-পঞ্চদশ শতকে এভাবেই মুসলমানদের শাসিত অঞ্চল হ্রাস পায় ১৪০

দ্রষ্টব্য সূচি

পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ অনুধাবনে সহায়ক কিছু তথ্য ৮৫

ইবনে হাফছুনকে নিয়ে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মিথ্যাচার ৯২

ইউসুফ বিন তাশফিন ইতিহাসের এক অবমূল্যায়িত বীর যোদ্ধা! ১২৫

একক খিলাফতব্যবস্থা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের সেতুবন্ধন.......... ১৪৯

অমুসলিমদের ধর্মত্যাগে বাধ্য করা ইসলামে বৈধ নয় ২৭৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

কয়েকটি বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রের ইতিহাস

১. রুস্তমিয়া রাষ্ট্র

২. ইদরিসিয়া রাষ্ট্র

৩. আগলাবিয়া রাষ্ট্র

৪. বনু যিরি রাষ্ট্র

৫. তুলুনিয়া রাষ্ট্র

৬. ইখশিদিয়া রাষ্ট্র

৭. বনু হামদান রাষ্ট্র

৮. সামানিয়া রাষ্ট্র

৯. গজনবি (সুবুক্তগিন) রাষ্ট্র

১০. খোয়ারিজম রাষ্ট্র

১১. ঘুরি রাষ্ট্র

হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে আব্বাসি খিলাফত বিভিন্ন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। এসব রাষ্ট্র ছিল সম্পূর্ণই স্বাধীন ও আব্বাসি খলিফার কর্তৃত্বমুক্ত। আব্বাসি সাম্রাজ্যের পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সব দিকে প্রায় একইসঙ্গে এসব স্বাধীন রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করে। এসব অঞ্চলে আপন প্রভাব-প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারের ক্ষমতা তৎকালীন আব্বাসি খিলাফতের ছিল না; ছিল না সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করার মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতা দাবিকারীদের দমন করার শক্তি। কারণ, তখন আব্বাসি খিলাফতের কলকাঠি যারা নাড়ছিল, সেই তুর্কি মামলুকরা আব্বাসি রাষ্ট্রপরিধির সংকোচন ও বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে মোটেও চিন্তিত ছিল না; দারুল খিলাফায় অবস্থান করে খলিফার ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করেই তারা তুষ্ট ছিল।

ভূমিকা

বাগদাদে আব্বাসি খিলাফতের ওপর তুর্কি মামলুকদের একচ্ছত্র আধিপত্য একদিকে যেমন খলিফাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাসকরণে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল, অপরদিকে আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নরদেরকে নিজেদের অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের চিন্তা করার সুযোগ করে দিয়েছিল। কারণ, কোনো বিবেচনায়ই তারা তুর্কি মামলুকদের তুলনায় দুর্বল ছিল না। এ কারণেই হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম অর্ধেক অতিবাহিত না হতেই সুবিশাল আব্বাসি সাম্রাজ্যের পরিসর অতি সংকীর্ণ গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং আব্বাসি রাষ্ট্রভূমি স্বাধীন বিভিন্ন রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। এসব রাষ্ট্রের ওপর আব্বাসি খলিফার কোনো ধরনের কর্তৃত্ব ছিল না।

মৌলিকভাবে এসব রাষ্ট্রকে দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। কিছু রাষ্ট্র স্বতন্ত্র পরিচয় বহন করলেও আব্বাসি সাম্রাজ্যের সঙ্গে মিত্রতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখত। তারা মিম্বরে আব্বাসি খলিফার জন্য দোয়া করত, নিজেদের মুদ্রায় খলিফার নাম উৎকীর্ণ করত এবং বাগদাদে খলিফার খেদমতে বিভিন্ন উপহারসামগ্রী প্রেরণ করত। বিপরীতে কিছু রাষ্ট্র ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন পরিচয়ধারী। তারা আব্বাসি সাম্রাজ্যের সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পর্ক তো রাখতই না; ক্ষেত্রবিশেষে আব্বাসি সাম্রাজ্যের ক্ষতিসাধনেও তৎপর হতো।

আব্বাসি খিলাফতের কর্ণধারগণ এই অরাজকতা দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখতে পারেননি। কারণ, পূর্বেই ইতিহাসের ধারাবর্ণনায় আমরা লক্ষ করেছি, তখনকার খলিফাদের প্রকৃতপক্ষে নির্বাহী কোনো ক্ষমতাই ছিল না।

এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় একটি বিষয় হলো, আব্বাসি খিলাফতের প্রথম স্তরে যেসব স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছিল,

সেগুলোর অবস্থান ছিল ইসলামি বিশ্বের পশ্চিম অংশে অর্থাৎ মাগরিব, আফ্রিকা ও আন্দালুস অঞ্চলে। আর এসব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিভিন্ন আরব বা বার্বার গোত্রের প্রচেষ্টায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন আব্বাসি খিলাফতব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হিসেবেই ইসলামি বিশ্বের মূল অংশে অর্থাৎ প্রাচ্যেও বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। আর যেহেতু এ অঞ্চলের অধিকাংশ জনগণ ছিল পারসিক বা তুর্কি বংশোদ্ভূত, তাই স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রগুলোর প্রতিষ্ঠার পেছনে পারসিক ও তুর্কিদের মূল ভূমিকা ছিল। একে কেন্দ্র করে পারসিক বা তুর্কিদের সাম্প্রদায়িকতার অপরাধে অভিযুক্ত করা মোটেও সমীচীন নয়। কারণ, যতদিন কেন্দ্রীয় খিলাফতব্যবস্থা শক্তিশালী ও ক্রিয়াশীল ছিল, ততদিন তারা এরূপ কিছু করার চিন্তাও করেনি। কিন্তু খিলাফতের মূলকেন্দ্র যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন কুফরি শক্তির মোকাবিলা ও ইসলামি বিজয়াভিযানের ধারা অব্যাহত রাখার অনিবার্য দাবিতেই শক্তিশালী বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। গজনবি, সেলজুক, জিনকি, আইয়ুবি, মামলুক ইত্যাদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পেছনে বিভক্তি-চিন্তা নয়; বরং এই কল্যাণচিন্তাই কার্যকর ছিল।

এই পরিচ্ছেদে আমরা এ জাতীয় স্বাধীন সবগুলো রাষ্ট্রের আলোচনা করব না। আমরা আমাদের আলোচনা এমন গোটা দশেক রাষ্ট্রের বিবরণীতে সীমাবদ্ধ রাখব, মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে যাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রয়েছে। তবে যেসব রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি কালিক ও স্থানিক বিবেচনায় দীর্ঘতা লাভ করেছিল এবং চলমান ইতিহাসের গতিধারায় অনন্যসাধারণ ভূমিকা রেখেছিল, তাদের আলোচনা এ পরিচ্ছেদে না করে সামনে আলাদা আলাদা পরিচ্ছেদে করা হবে।

১. রুস্তমিয়া রাষ্ট্র[১]

[১৬১-২৯৬ হিজরি—৭৭৭-৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ]

প্রতিষ্ঠাতা আবদুর রহমান বিন আবদুল ওয়াহহাব বিন রুস্তম বিন বাহরাম[২]-এর প্রতি সম্বন্ধিত করে এই রাষ্ট্রের নাম 'রুস্তমিয়া' রাখা হয়। আলজেরিয়ার তিয়ারিত (Tiaret) নগরী[৩]-কেন্দ্রিক রুস্তমিয়া রাষ্ট্রের পরিধি ছিল আধুনিক আলজেরিয়াজুড়ে। ধর্মপরিচয়ে রুস্তমিয়া রাষ্ট্রের জনগণ ইবাজিয়া[৪] মতাদর্শের অনুসারী ছিল। অবাক করা বিষয় হলো—রুস্তমিয়া রাষ্ট্রের শাসকগণ রাজতন্ত্র বা উত্তরাধিকারমূলক শাসনব্যবস্থার অনুসারী ছিলেন, যা ইবাজিয়া মতাদর্শের মূলনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী।

পূর্বে আগলাবিয়া রাষ্ট্র ও পশ্চিমে ইদরিসিয়া রাষ্ট্রসহ বিভিন্ন শত্রুভাবাপন্ন শক্তি কর্তৃক পরিবেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও রুস্তমিয়া রাষ্ট্র টিকে ছিল প্রায় দেড় শতাব্দী। রুস্তমিয়া শাসকগণ আন্দালুসের উমাইয়া শাসকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। ২৯৬ হিজরি সনে (৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে)

---

১. উমাইয়া খিলাফতের পতন ও আব্বাসি খিলাফতের সূচনাকালে সংঘটিত গোলযোগের সময় বহুসংখ্যক আলিম ও ধর্মপ্রচারক আফ্রিকার বৃহত্তর মাগরিব অঞ্চলে চলে যান এবং সেখানে দ্বীনপ্রচার শুরু করেন। তারা মাগরিব অঞ্চলের জনগণকে আব্বাসি খিলাফতের বিরুদ্ধাচরণেও উদ্বুদ্ধ করেন। এরই পরিক্রমায় মাগরিব অঞ্চলে আব্বাসি খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং উল্লেখযোগ্য তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে : কায়রোয়ানে সুন্নি মতাদর্শী আগলাবিয়া রাষ্ট্র, ফেজে শিয়া যায়দিয়া মতাদর্শী ইদরিসিয়া রাষ্ট্র এবং তিয়ারিতে ইবাজিয়া মতাদর্শী রুস্তমিয়া রাষ্ট্র।

২. বাহরাম ছিলেন তৃতীয় খলিফা উসমান রাযি.-এর মুক্ত ক্রীতদাস।

৩. অতীতে এ অঞ্চলের নাম ছিল তাহারত।

৪. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ হতে বিচ্ছিন্ন একটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় মতাদর্শ। ইবাজিয়া মতাদর্শীরা ইসলামের মৌলিক ও শাখাগত বিভিন্ন বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর বিপরীত মতাদর্শ লালন করে থাকে। উমাইয়া আমলের জনৈক ধর্মপ্রচারক আবদুল্লাহ বিন ইবাজের প্রতি সম্বন্ধ করে তাদেরকে ইবাজিয়া ফিরকা বলা হয়। অবশ্য নিজেদেরকে তারা বিশিষ্ট ফকিহ ও মুহাদ্দিস তাবেয়ি জাবির বিন যায়দ রহ.-এর মতানুসারী দাবি করে থাকে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর মতে তাদের মতাদর্শের সঙ্গে খারিজি মতাদর্শের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। আধুনিক ওমানের রাষ্ট্রীয় মাজহাব ইবাজিয়া। ওমানের প্রায় ৭০% জনগণ ইবাজিয়া মাজহাবের অনুসরণ করে থাকে। এ ছাড়াও লিবিয়া, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়াতে তাদের সীমিত সংখ্যায় উপস্থিতি রয়েছে।

মাগরিব অঞ্চলে উবায়দিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হলে উবায়দিদের হাতে রুস্তমিয়া রাষ্ট্রের পতন ঘটে।

রুস্তমিয়া শাসকদের তালিকা

১	আবদুর রহমান বিন রুস্তম	:	১৬১-১৭১ হি. (৭৭৭-৭৮৭ খ্রি.)
২	আবদুল ওয়াহহাব বিন আবদুর রহমান	:	১৭১-২০৮ হি. (৭৮৭-৮২৩ খ্রি.)
৩	আফলাহ বিন আবদুল ওয়াহহাব	:	২০৮-২৫৮ হি. (৮২৩-৮৭১ খ্রি.)
৪	আবু বকর বিন আফলাহ	:	২৫৮-২৬০ হি. (৮৭১-৮৭৩ খ্রি.)
৫	মুহাম্মদ বিন আফলাহ	:	২৬০-২৮১ হি. (৮৭৩-৮৯৪ খ্রি.)
৬ (ক)	আবু হাতিম ইউসুফ বিন মুহাম্মাদ	:	২৮১-২৮২ হি. (৮৯৪-৮৯৫ খ্রি.)
৭	ইয়াকুব বিন আফলাহ	:	২৮২-২৮৬ হি. (৮৯৫-৮৯৯ খ্রি.)
৬ (খ)	আবু হাতিম ইউসুফ বিন মুহাম্মাদ	:	২৮৬-২৯৪ হি. (৮৯৯-৯০৬ খ্রি.)
৮	ইয়াকজান বিন মুহাম্মাদ	:	২৯৪-২৯৬ হি. (৯০৬-৯০৯ খ্রি.)

২. ইদরিসিয়া রাষ্ট্র

[১৭২-৩৭৫ হিজরি—৭৮৮-৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ]

প্রতিষ্ঠাতা ইদরিস বিন আবদুল্লাহ বিন হাসানের প্রতি সম্বন্ধ করে রাষ্ট্রের এ নামকরণ করা হয়। ফেজ নগরী-কেন্দ্রিক ইদরিসিয়া রাষ্ট্র ছিল আধুনিক মরক্কোজুড়ে বিস্তৃত। ইদরিসি শাসকরা শিয়া যায়দিয়া মাজহাবের অনুসারী ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে—আকিদাগত দিক থেকে যায়দিয়া মতাদর্শ অন্যান্য শিয়া মতবাদের তুলনায় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর অধিকতর নিকটবর্তী।

চতুর্থ আব্বাসি খলিফা হাদির শাসনামলে হুসাইন বিন আলি বিন হাসান (৩য়) বিন হাসান (২য়) বিন হাসান (১ম) বিন আলি বিন আবু তালিবের নেতৃত্বে আলাবিদের বিদ্রোহ প্রচেষ্টা সংঘটিত হয়। কিন্তু তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ

হয় এবং মক্কার নিকটবর্তী ফাখ নামক স্থানে সংঘটিত এক যুদ্ধে তিনি তার অধিকাংশ অনুচরসহ নিহত হন। কেবল নিহত হুসাইনের দুই চাচাতো ভাই ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ বিন হাসান (২য়) বিন হাসান (১ম) বিন আলি বিন আবু তালিব এবং ইদরিস বিন আবদুল্লাহ বিন হাসান (২য়) বিন হাসান (১ম) বিন আলি বিন আবু তালিব পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন।

ইদরিস পালিয়ে প্রথমে মিশরে, তারপর সেখান থেকে মাগরিবে চলে যান। সেখানে তিনি বার্বার (আমাজিঘ) গোত্র আওর্‌বা-এর সর্দারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আওর্‌বা গোত্রের অধিকাংশ লোক মুতাজিলা মতাদর্শের অনুসারী ছিল। তাদের সর্দারের নাম ছিল ইসহাক বিন মাহমুদ বিন আবদুল হামিদ। মতাদর্শের ভিন্নতা ও মুতাজিলাদের আধিক্য সত্ত্বেও ইসহাক স্বেচ্ছায় যায়দিয়া মতাদর্শী ও আলি-বংশধর ইদরিসের নেতৃত্বে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে সম্মত হন এবং ১৭২ হিজরি সনে (৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে) ইদরিসের হাতে বায়আত গ্রহণ করেন।

ইদরিস বিভিন্ন মতাদর্শের জনগণকে তার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হন এবং তার নবগঠিত রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে ফেজ নগরীর পত্তন করেন। তিনি তার অধিকাংশ উজির নির্বাচন করেন আওর্‌বা গোত্র হতে। তিনি যানাতা, আওর্‌বা, সানহাজা, হাওয়ারা ও অন্যান্য বার্বার গোত্রের লোকদের সমন্বয়ে এক বিশাল সেনাবাহিনী গঠনে সক্ষম হন এবং ধীরে ধীরে তার রাষ্ট্রসীমা বিস্তৃত করেন। একপর্যায়ে ইদরিস তিলিমসান নগরীও জয় করতে সক্ষম হন এবং মাগরিব অঞ্চলে একটি সুদৃঢ় রাষ্ট্র গড়ে তোলেন।

আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদের প্রেরিত গুপ্তঘাতক শিমাখের হাতে ইদরিস নিহত হন। তখন ইদরিসের স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। কিছুদিন পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার নামও ইদরিস রাখা হয়। ২য় ইদরিস ছোট হওয়ায় তার পক্ষে ১ম ইদরিসের মুক্ত ক্রীতদাস রাশিদ রাষ্ট্রশাসন করতে থাকেন। কয়েক বছর পর তিনিও গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন।

রাশিদের মৃত্যুর পর দশ বছর বয়সী ২য় ইদরিস রাষ্ট্রের শাসনভার নিজের কাঁধে তুলে নেন। পরিণত বয়সে তিনি রাজধানী ফেজ নগরীকে আভিজাত্য ও সমৃদ্ধির শীর্ষ চূড়ায় উন্নীত করতে সক্ষম হন। ফেজ নগরী

প্রাচ্য, প্রতীচ্য ও আন্দালুসসহ পুরো ইসলামি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও আকাঙ্ক্ষিত নগরীতে পরিণত হয়।

২৩৪ হিজরি সনে (৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে) ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদ বিন ২য় ইদরিসের শাসনামলে ইদরিসিয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময় ইয়াহইয়া অধিক হারে আরব জনগোষ্ঠীর ওপর নির্ভর করায় রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি বার্বার গোত্রসমূহ তার বিরুদ্ধে চলে যায়।

এরপর ইদরিসিয়া রাষ্ট্রে শুরু হয় বিদ্রোহ ও রাষ্ট্রবিভক্তি। একপর্যায়ে ইদরিসি পরিবারের সদস্যরা বিবাদে জড়িয়ে পড়ে এবং ৩৭৫ হিজরি সনে (৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে) উবায়দি রাষ্ট্রের হাতে ইদরিসিয়া রাষ্ট্রের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

ইদরিসি রাজপরিবারের বিভিন্ন বংশধর এখনো মরক্কোয় বিদ্যমান আছে। সেখানে তারা সচ্ছল জীবনযাপন করে থাকে।

ইদরিসিয়া রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য কীর্তি-অবদান

- মাগরিব অঞ্চলকে আরবিকরণ ও পুরো অঞ্চলজুড়ে আরবি ভাষার বিস্তারে ইদরিসিয়া রাষ্ট্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ২য় ইদরিস তার শাসনামলে আন্দালুস, ইসলামি প্রাচ্য ও আফ্রিকা থেকে প্রায় পাঁচশ আরব পরিবারকে মাগরিব অঞ্চলে নিয়ে এসেছিলেন।
- ইদরিসি শাসকগণ মাগরিব অঞ্চলে খারিজি মতাদর্শের বিস্তার রোধে খারিজিদের বিরুদ্ধে অব্যাহত লড়াই করেছেন।
- ইদরিসি শাসনামলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি 'জামে কারাউইয়িন'। 'উম্মুল বানিন' নামে খ্যাত ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ আল-ফিহরি[৫] ২৪৫ হিজরি সনে (৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে) মাগরিব

---

৫. উম্মুল বানিন ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ ইসলামি ইতিহাসের এক অনন্যসাধারণ মহীয়সী নারী। জন্ম ১৮৪ হিজরি সনে (৮০০ খ্রিষ্টাব্দে) কায়রোয়ানে। পরবর্তী সময়ে তিনি হিজরত করে ফেজে চলে যান। তিনি ছিলেন আফ্রিকা অঞ্চলের মহান বিজেতা সেনাপতি উকবা বিন নাফে-এর বংশধর। পিতা ও স্বামীর ইন্তেকালের পর তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর অর্থের অধিকারী হন। তিনি ও তার বোন উম্মুল কাসিম মরিয়ম বিনতে মুহাম্মাদ নিজেদের সমস্ত অর্থ ব্যয়ে ফেজ নগরীতে সুবিখ্যাত মসজিদটি নির্মাণ করেন এবং নিজেদের জন্মভূমি কায়রোয়ানের নামে মসজিদটির নামকরণ করেন। ২৪৫ হিজরি সনের ১ রমজান (৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ নভেম্বর) মসজিদটির নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং ২৬৩ হিজরি সনে (৮৭৬=

অঞ্চলের সর্ববৃহৎ এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই মসজিদটি ইলম ও জ্ঞানচর্চার এক অনন্য মিনাররূপে দণ্ডায়মান আছে। জামে কারাউইয়িনে মানে ও পরিমাণে সমৃদ্ধ এক সুবিশাল গ্রন্থাগার ছিল। কথিত আছে—জামে কারাউইয়িনকেন্দ্রিক শিক্ষাঙ্গনই[৬] পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন জামিয়া ও বিশ্ববিদ্যালয়।

- ইদরিসি শাসনামলেই ফেজ নগরী জ্ঞান ও সভ্যতা বিকাশের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

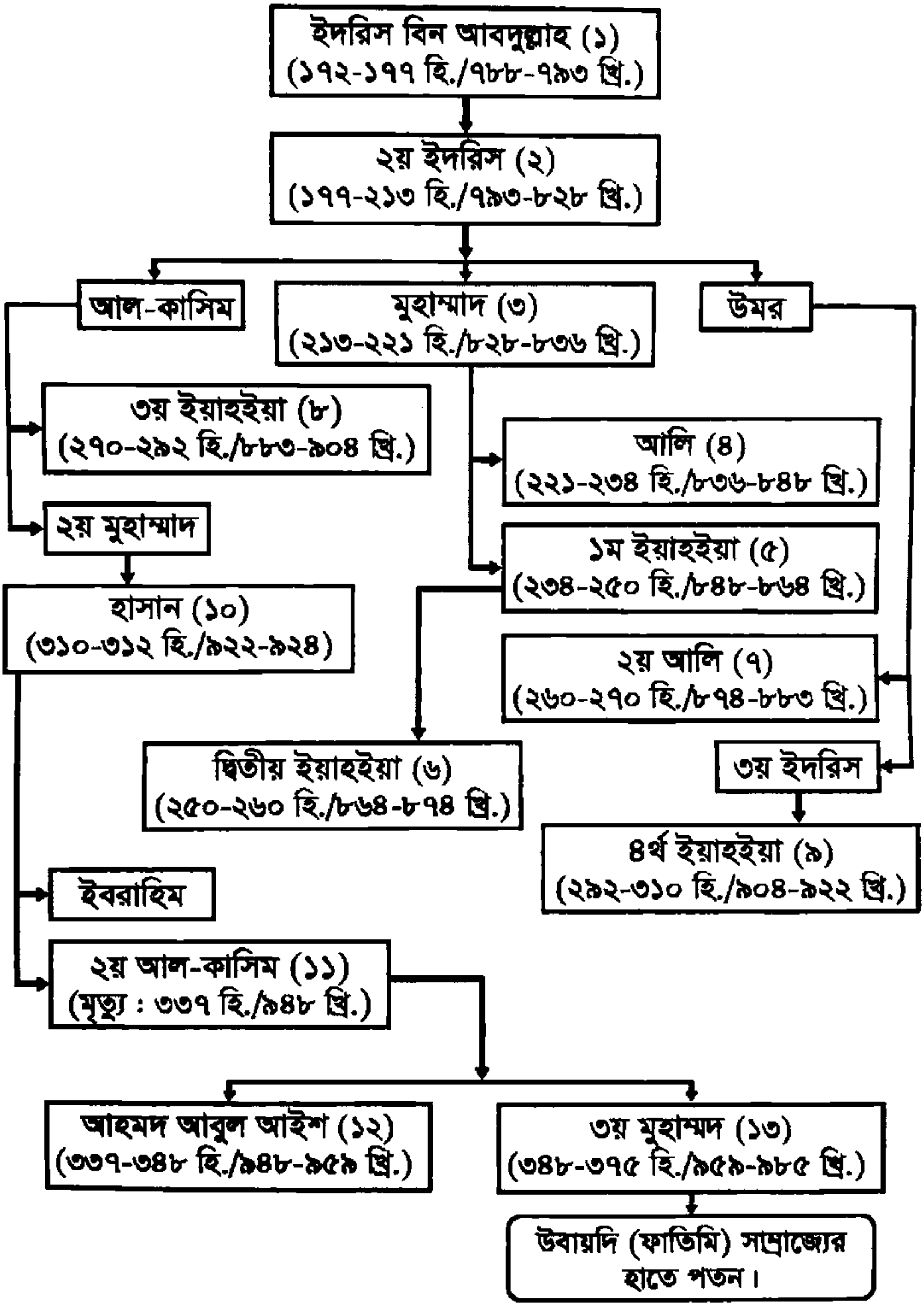
=খ্রিষ্টাব্দে) সমাপ্ত হয়। ফাতিমা আল-ফিহরি নির্মাণকাজ শুরু হওয়ার পরই মান্নত করেছিলেন যে, মসজিদটির নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি রোজা রেখে যাবেন। এরপর তিনি একটানা সুদীর্ঘ আঠারো বছর রোজা রাখেন। যেহেতু পরবর্তীকালে জামে কারাউইয়িন বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় মানের শিক্ষাঙ্গনে পরিণত হয়, তাই ফাতিমা আল-ফিহরিকে বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাও গণ্য করা হয়। এই মহীয়সী নারী ২৬৬ হিজরি সনে (৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে) ফেজ নগরীতে ইন্তেকাল করেন।

৬. জামে কারাউইয়িনের নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পরই তৎকালীন রীতি অনুযায়ী আলিমগণ মসজিদের আঙিনায় দ্বীনি শিক্ষার হালকা ও পাঠচক্র শুরু করেন। কালের পরিক্রমায় এই শিক্ষাঙ্গনই বিভিন্ন অনুষদে সমৃদ্ধ এক বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ ধারণ করে। ইউনেস্কো ও গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এর তথ্যানুসারে এটিই বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়, যা কালগত কোনো বিচ্ছিন্নতা ব্যতিরেকে আজ অবধি বিদ্যমান আছে। ইবনুল বান্না মার্‌রাকিশি, ইবনুল আরাবি, ইবনে রুশদ, ইবনে খালদুন ও কাজি ইয়াজের ন্যায় জগদ্বিখ্যাত বোদ্ধাগণ এখানে পাঠদান করেছেন। খ্রিষ্টান সমাজের প্রধান ধর্মীয় নেতা পোপ ২য় সিলভেস্টার (Sylvester II) (মেয়াদকাল : ৯৯৯-১০০৩ খ্রিষ্টাব্দ) এখানে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন।

প্রতিষ্ঠাতা ফাতিমা আল-ফিহরি এখানে একটি গ্রন্থাগারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা ছিল তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। অতি সম্প্রতি ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে গ্রন্থাগারটি নতুন করে বিন্যস্ত করার পর উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে গ্রন্থাগারটিতে চার হাজারের অধিক অতি দুর্লভ গ্রন্থের হস্তলিখিত মূল পাণ্ডুলিপি রয়েছে। পবিত্র কুরআনের খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীর হস্তলিখিত কপি এবং বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থের প্রাচীন কপি এখানে সংরক্ষিত আছে। বর্তমানেও কায়রোয়ান বিশ্ববিদ্যালয় মরক্কোর বিখ্যাত একটি শিক্ষাঙ্গন।

ইদরিসিয়া রাষ্ট্রের শাসকগণের বংশলতিকা

[নামের পাশে বন্ধনীতে উল্লেখিত সংখ্যা দ্বারা শাসকদের ক্রমধারা বোঝানো হয়েছে]



৩. আগলাবিয়া রাষ্ট্র

[১৮৪-২৯৬ হিজরি—৮০০-৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ]

প্রতিষ্ঠাতা ইবরাহিম বিন আগলাবের প্রতি সম্বন্ধ করে রাষ্ট্রের নামকরণ করা হয় 'আগলাবিয়া রাষ্ট্র'। ১৪৮ হিজরি সন থেকে ১৮৪ হিজরি সন পর্যন্ত আফ্রিকা অঞ্চলে ব্যাপক অস্থিরতা ও নৈরাজ্য বিরাজমান ছিল। তখন আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদ ইবরাহিম বিন আগলাবকে সেখানকার প্রশাসক নিয়োজিত করেন। ইবরাহিম ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই নিজের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করতে থাকেন। খলিফা হারুনুর রশিদ ইবরাহিমের সংকল্প এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। কিন্তু যেহেতু ইবরাহিম আব্বাসি খিলাফতের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন এবং আব্বাসি খলিফার নামেই শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন, তাই হারুনুর রশিদ তাকে গভর্নর পদে বহাল রাখেন। খলিফা হারুনুর রশিদ ইবরাহিম বিন আগলাবকে আব্বাসি খিলাফত ও মাগরিবের ইদরিসিয়া রাষ্ট্রের মাঝে প্রতিবন্ধক হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

ধীরে ধীরে ইবরাহিম আপন এলাকায় একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হন এবং স্বাধীন রাষ্ট্রপ্রধানের ন্যায় শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। অবশ্য তিনি আব্বাসি খলিফার নামেই খুতবা প্রদান করতেন।

আগলাবিয়া রাষ্ট্র বিভিন্ন সময় বিদ্রোহ প্রচেষ্টার সম্মুখীন হয় এবং সফলতার সঙ্গে সকল বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়। আগলাবি শাসকদের অনেকে প্রজাদের মাঝে ন্যায়-ইনসাফ ও অনুগ্রহপূর্ণ শাসন প্রতিষ্ঠায়ও সক্ষম হন। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে ২য় ইবরাহিম (২৬১-২৮৯ হিজরি)-এর কথা। তিনি প্রতি বৃহস্পতি এবং সোমবার কায়রোয়ান মসজিদে বসতেন এবং ধৈর্যের সঙ্গে অভিযোগকারীদের অভিযোগ শ্রবণ করে ন্যায়বিচার করতেন। বর্ণিত আছে, তিনি তার সকল অর্থসম্পদ দান করে দিয়েছিলেন এবং সকল ভূসম্পত্তি ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন।

আগলাবি শাসকগণ জিহাদ ও বিজয়াভিযানের ময়দানেও অবদান রেখেছেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আগলাবিয়া রাষ্ট্র সিসিলি দ্বীপ জয়ের চেষ্টা চালায়। সিসিলির উদ্দেশে প্রেরিত অভিযানসমূহের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন ইমাম মালিক রহ.-এর শিষ্য ও কায়রোয়ানের কাজি বিশিষ্ট ফকিহ

মুজাহিদ আসাদ ইবনুল ফুরাত রহ.। অব্যাহত প্রচেষ্টার পর ২৬৪ হিজরি সনে সিসিলি দ্বীপে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

আগলাবিয়া রাষ্ট্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ইতালিয়ানদের হামলার জবাব দিতে ২৩২ হিজরি সনে আগলাবি শাসক আহমাদ দক্ষিণ ইতালিতে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি সসা (Soussa) নৌবন্দর থেকে বিরাট এক বাহিনী নিয়ে রওনা হন এবং রোম নগরীর উপকণ্ঠে অবতরণ করেন। মুসলিম বাহিনী রোমের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে নিকটবর্তী সকল দুর্গ অধিকার করে নেয়। পরবর্তী প্রায় দুই মাস রোম নগরী আগলাবি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। এরপর খ্রিষ্টানবিশ্ব থেকে রোমের নিরাপত্তায় ব্যাপক সামরিক সাহায্য পৌঁছলে বাধ্য হয়ে আগলাবি বাহিনী সেখান থেকে সরে আসে। আগলাবি বাহিনী এই অভিযানে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করে। এটি ছিল মুসলমানদের রোম নগরী বিজয়ের প্রথম প্রচেষ্টা।

আগলাবি শাসনামলেই বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মসজিদ জামে জায়তুনা নির্মিত হয়, জামে উকবা বিন নাফে পুনর্নির্মাণ করা হয় এবং রাক্কাদা নগরী প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাক্কাদা ছিল প্রাসাদে পরিপূর্ণ এক সুবিশাল নগরী।

আগলাবি শাসক ২য় ইবরাহিমের আমলে রাষ্ট্রের উপকূলীয় অঞ্চলে অনেকগুলো পর্যবেক্ষণ-চৌকি স্থাপন করা হয়। এসব চৌকির মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চল বিজায়া (Béjaïa) থেকে ত্রিপোলিতে (Tripoli) এক রাতেরও কম সময়ে বার্তা পৌঁছানো হতো। রাতে বার্তা ও সংকেত পৌঁছানোর জন্য আগুন জ্বালানো হতো আর দিনে ধোঁয়া ব্যবহার করা হতো।

২৯৬ হিজরি সনে উবায়দিদের হাতে আগলাবিয়া রাষ্ট্রের পতন ঘটে।

আগলাবিয়া রাষ্ট্রের শাসকগণের তালিকা

১.	ইবরাহিম বিন আগলাব তামিমি	:	১৮৪-১৯৬ হি. (৮০০-৮১২ খ্রি.)
২.	আবদুল্লাহ বিন ইবরাহিম	:	১৯৬-২০১ হি. (৮১২-৮১৭ খ্রি.)
৩.	যিয়াদাতুল্লাহ বিন ইবরাহিম	:	২০১-২২৩ হি. (৮১৭-৮৩৮ খ্রি.)
৪.	আগলাব আবুল আককাল বিন ইবরাহিম	:	২২৩-২২৬ হি. (৮৩৮-৮৪১ খ্রি.)
৫.	মুহাম্মদ বিন আগলাব	:	২২৬-২৪২ হি. (৮৪১-৮৫৬ খ্রি.)
৬.	আহমাদ বিন মুহাম্মাদ	:	২৪২-২৪৯ হি. (৮৫৬-৮৬৩ খ্রি.)
৭.	(২য়) যিয়াদাতুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ	:	২৪৯-২৫০ হি. (৮৬৩-৮৬৪ খ্রি.)
৮.	(২য়) মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আবুল গারানিক	:	২৫০-২৬১ হি. (৮৬৪-৮৭৫ খ্রি.)
৯.	(২য়) ইবরাহিম বিন আহমাদ	:	২৬১-২৮৯ হি. (৮৭৫-৯০২ খ্রি.)
১০.	(২য়) আবদুল্লাহ বিন (২য়) ইবরাহিম	:	২৮৯-২৯০ হি. (৯০২-৯০৩ খ্রি.)
১১.	(৩য়) যিয়াদাতুল্লাহ বিন (২য়) আবদুল্লাহ	:	২৯০-২৯৬ হি. (৯০৩-৯০৯ খ্রি.)

৪. মরক্কোর বনু যিরি রাষ্ট্র

[৩৬২-৫৪৩ হিজরি—৯৭৩-১১৪৮ খ্রিষ্টাব্দ]

প্রসিদ্ধ বার্বার গোত্র সানহাজা-এর সর্দার যিরি বিন মানাদ সানহাজির প্রতি সম্বন্ধ করে রাষ্ট্রের নামকরণ করা হয় 'বনু যিরি রাষ্ট্র'। সানহাজা ছিল বৃহত্তম বার্বার গোত্র। বার্বার সমাজের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিল সানহাজা গোত্রভুক্ত। উবায়দি শাসনামলে[৭] উবায়দিদের পৃষ্ঠপোষকতায় উচ্চতর মাগরিব[৮] অঞ্চলে বনু যিরি একটি শক্তিশালী পরিবার হিসেবে আবির্ভূত হয়। ৩৬২ হিজরি সনে (৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) উবায়দিরা মিশর জয় করার পর উবায়দি সাম্রাজ্যের রাজধানী মিশরে স্থানান্তর করে। এ সময় তারা মরক্কোতে যিরি বিন মানাদের পুত্র বালকিন ইউসুফ আবুল ফুতুহকে গভর্নর নিযুক্ত করে যায়। বালকিনের আমলেই মরক্কোর অধিবাসীরা উবায়দিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আন্দালুসের শাসকপরিবার বনু উমাইয়ার নামে খুতবা চালু করে। এ সময় বালকিন ইউসুফ অভিযান পরিচালনা করে তাদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম হন।

৩৭৩ হিজরি সনে (৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে) বালকিন ইউসুফ মৃত্যুবরণ করলে তার পুত্র মানসুর তার স্থলাভিষিক্ত হন। তার গভর্নর আমলে মরক্কোতে

---

৭. কাল বিবেচনায় যিরি রাষ্ট্রের পূর্বেই উবায়দি সাম্রাজ্য আলোচনার দাবি রাখে। কিন্তু উবায়দি সাম্রাজ্য যেহেতু কাল ও পরিধি উভয় বিবেচনায় স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার, তাই তার আলোচনা সামনে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে করা হয়েছে।

৮. **মাগরিবুল আদনা, মাগরিবুল আওসাত ও মাগরিবুল আকছা :** মাগরিব অঞ্চলের পরিচিতি ইতিপূর্বে দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে। হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দী হতে আরবগণের ভাষা-ব্যবহারে মাগরিব অঞ্চলকে তিন ভাগে বিভক্তিকরণ পাওয়া যায়—১. (মাগরিবুল আদনা) নিকট-মাগরিব অঞ্চল ২. (মাগরিবুল আওসাত) মধ্য-মাগরিব অঞ্চল ও ৩. (মাগরিবুল আকছা) দূর-মাগরিব অঞ্চল।

মাগরিবুল আদনার বিস্তৃতি ছিল পূর্বে ত্রিপোলি হতে পশ্চিমে বিজায়া নগরী পর্যন্ত; আধুনিক রাষ্ট্রসীমায় যার অবস্থান লিবিয়া, তিউনিসিয়া ও পূর্ব আলজেরিয়াজুড়ে। মাগরিবুল আওসাতের বিস্তৃতি ছিল পূর্বে তিয়ারিত নগরী হতে পশ্চিমে মাওলাওয়া নদী (The Moulouya River) ও তাজা (Taza) পর্বতমালা পর্যন্ত; আধুনিক রাষ্ট্রসীমায় যার অবস্থান আলজেরিয়ার বাকি অংশ ও মরক্কোর কিছু অংশজুড়ে। আর মাগরিবুল আকছার বিস্তৃতি ছিল পূর্বে মাওলাওয়া নদী হতে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত; আধুনিক রাষ্ট্রসীমায় যার অবস্থান মরক্কো রাষ্ট্রজুড়ে।

যানাতা গোত্র বিদ্রোহ করলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে তাদেরকে পরাজিত করেন।

মূলত উবায়দি শাসকদের সহায়তায়ই যিরি পরিবারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বালকিন ইউসুফের হাতেই মরক্কো অঞ্চলে বনু যিরির স্বাধীন শাসন শুরু হয়। বনু যিরির রাষ্ট্রকেই ইসলাম গ্রহণ-পরবর্তী বার্বারদের প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র গণ্য করা হয়।

পরবর্তী সময়ে যিরি রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্যে সংঘাত ও বিভেদ সৃষ্টি হয়। বালকিনের পৌত্র বাদিস তার চাচা হাম্মাদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। একে কেন্দ্র করে ৪০৬ হিজরি সনে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। চাচার সঙ্গে লড়াই চলাকালেই বাদিস মৃত্যুবরণ করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তার পুত্র মানসুরকে পরবর্তী শাসক নির্বাচন করে যান। বাদিসের মৃত্যুর পর তার বাহিনীর সদস্যগণ মানসুরের হাতে বায়আত গ্রহণ করে। মানসুর হাম্মাদের সঙ্গে লড়াই করে তাকে পরাজিত করেন। এরপর তিনি রাজধানী মানসুরিয়াতে ফিরে এসে দেখতে পান যে, জনগণ ইতিমধ্যে বাদিসের আরেক পুত্র মুইযের হাতে বায়আত গ্রহণ করেছে। মুইয তখন সাত-আট বছরের বালকমাত্র। মানসুর এর বিরোধিতা না করে ভাইয়ের বায়আত গ্রহণ করে নেন। মিশর থেকে উবায়দি রাজপরিবারও মুইযকে স্বীকৃতি দান করে এবং তাকে শারফুদ্দৌলা উপাধি প্রদান করে। এরপর রাষ্ট্র বিভক্তির মাধ্যমে চাচা হাম্মাদের সঙ্গে মুইযের বিরোধেরও সমাপ্তি ঘটে। হাম্মাদকে[১] প্রদান করা হয় আলজেরিয়ার দায়িত্ব আর বনু যিরির হাতে থাকে লিবিয়া এবং তিউনিসিয়া অঞ্চলের শাসনক্ষমতা।

মুইয শারফুদ্দৌলা পরবর্তীকালে তার রাষ্ট্র থেকে শিয়া মতবাদ বিলুপ্ত করেন এবং উবায়দি সাম্রাজ্যের আনুগত্য থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করেন। তিনি মিম্বরে আব্বাসি খলিফাদের নামে দোয়া চালু করেন এবং তার জ্ঞাতিভাই হাম্মাদ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন করেন। তার শাসনামলে কায়রোয়ান নগরী জ্ঞানী-গুণী, আলিম-ফকিহ ও কবি-সাহিত্যিকগণের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়।

---

১. হাম্মাদের হাতে প্রতিষ্ঠিত হাম্মাদিয়া রাষ্ট্র তখন থেকে ৫৪৭ হিজরি সন (১১৫২ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত টিকে ছিল। ৫৪৭ হিজরি সনে হাম্মাদিয়া রাষ্ট্র মুওয়াহহিদি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

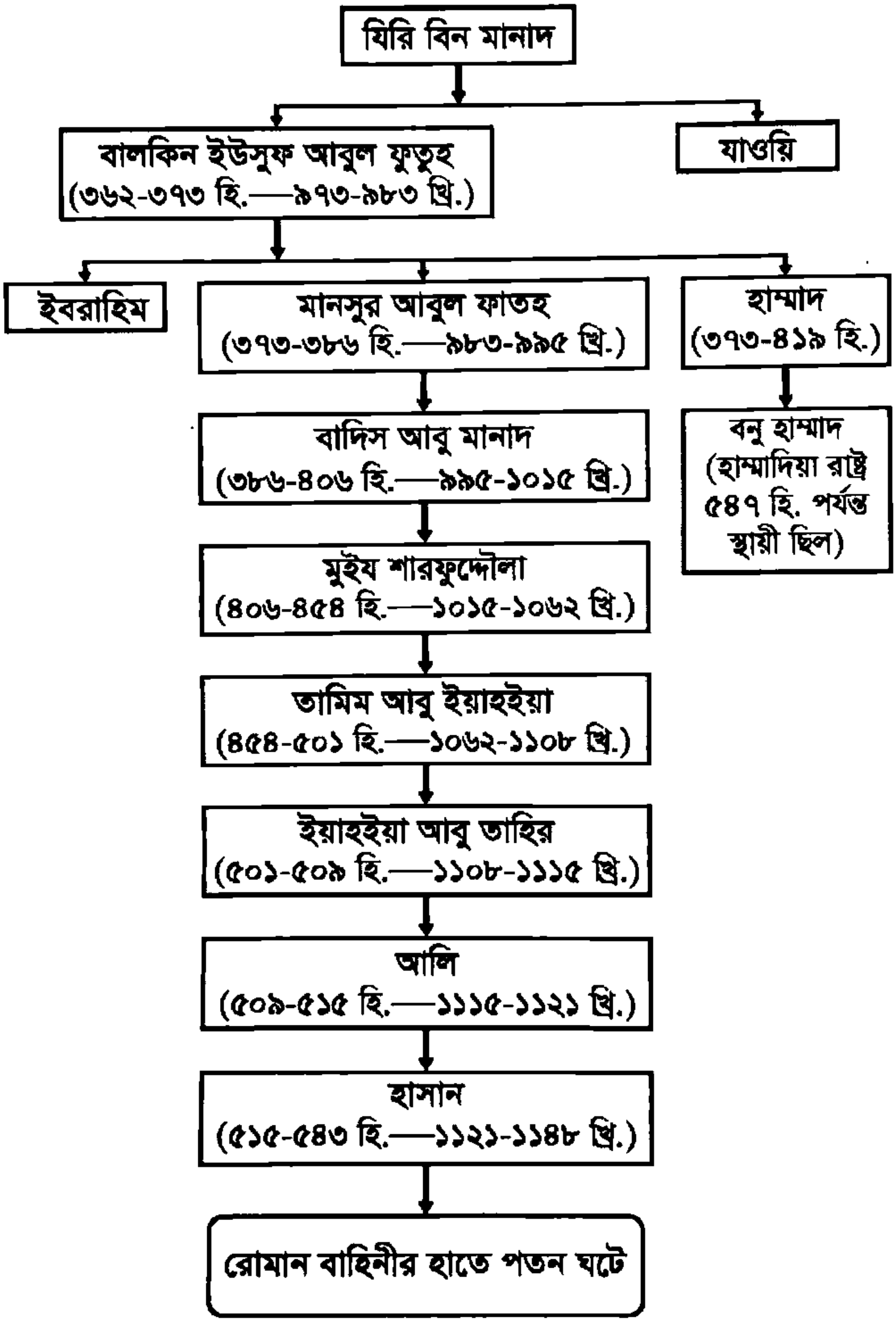
৪৫৪ হিজরি সনে (১০৬২ খ্রিষ্টাব্দে) মুইয শারফুদ্দৌলার ইন্তেকালের পর তার পুত্র তামিম শাসনভার গ্রহণ করেন। তার শাসনামলেই মুসলমানরা দুইশ সত্তর বছর পর সিসিলি দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তার আমলে তিলিয়ানি নৌবহর যিরি রাষ্ট্রে আক্রমণ করলে তামিম তাদেরকে পরাজিত করেন। প্রতিপক্ষের বহু সৈন্য এ যুদ্ধে নিহত হয়।

৫৪৩ হিজরি সনে (১১৪৮ খ্রিষ্টাব্দে) রোমানরা বনু যিরি রাষ্ট্রের রাজধানী মাহদিয়ায়[১০] প্রবেশ করলে তৎকালীন শাসক হাসান বিন আলি সানহাজি পালিয়ে তার চাচাতো ভাইদের কাছে চলে যান এবং এর ফলে বনু যিরি রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ঘটে। বনু যিরি রাষ্ট্র দুইশ নয় বছর স্থায়িত্ব লাভ করেছিল।

---

১০. **মাহদিয়া :** তিউনিসিয়ার রাজধানী তিউনিস থেকে ২০৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত একটি উপকূলীয় নগরী। প্রথম উবায়দি শাসক উবায়দুল্লাহ আল-মাহদি নগরীটির পত্তন করেন এবং একে উবায়দি সাম্রাজ্যের রাজধানী নির্ধারণ করেন।

যিরি রাজপরিবারের বংশলতিকা



৫. তুলুনিয়া রাষ্ট্র

[২৫৪-২৯২ হিজরি—৮৬৮-৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ]

তুলুনিয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতার নাম আহমাদ বিন তুলুন। বুখারার গভর্নর নুহ বিন আসাদ সামানি ২০০ হিজরি সনে (৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে) আব্বাসি খলিফা মামুনের কাছে যেসব তুর্কি ক্রীতদাস উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন, আহমাদের পিতা তুলুন ছিলেন তাদের একজন।

আহমাদ শৈশবকাল থেকে চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, সহনশীলতা ও নেতৃত্বের দীক্ষা নিয়ে গড়ে ওঠেন। তিনি শৈশবেই কুরআনের ইলম অর্জন করেন। আহমাদ বিন তুলুন সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি তুর্কি মামলুকদের যথেচ্ছ চলাফেরা ও সীমাতিরিক্ত অন্যায় আচরণের নিন্দা করতেন।

আহমাদ বিন তুলুন ২৫৪ হিজরি সনের রমজান মাসে ত্রয়োদশ আব্বাসি খলিফা মুতায বিল্লাহর পক্ষ থেকে মিশরের গভর্নর নিযুক্ত হন। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি সেখানকার অধিবাসীদের প্রতি সদাচরণ করেন এবং বাইতুল মালের সম্পদ জনকল্যাণে ব্যয় করেন। তিনি মিশরে দীর্ঘ তিন বছরের প্রচেষ্টায় জামে ইবনে তুলুন নির্মাণ করেন। অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য তিনি একটি হাসপাতালও প্রতিষ্ঠা করেন। আহমাদ বিন তুলুন প্রতি মাসে নিজস্ব সম্পদ থেকে এক হাজার দিনার দান করতেন।

২৬২ হিজরি সনে (৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে) পঞ্চদশ আব্বাসি খলিফা মুতামিদের আমলে আহমাদ বিন তুলুন ও তৎকালীন আব্বাসি খিলাফতের সর্বেসর্বা আবু আহমাদ তালহা (মুওয়াফফাক বিল্লাহ)-এর মাঝে বিরোধ ও মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়।

২৬৪ হিজরিতে শাম ও পার্শ্ববর্তী সীমান্ত অঞ্চলের প্রশাসক আমাজুরের মৃত্যুর পর পুরো অঞ্চল আহমাদের দখলে চলে আসে। তিনি এ অঞ্চলের জনগণের সঙ্গেও সদাচরণ করেন। এর ফলে আহমাদ বিন তুলুনের রাষ্ট্রসীমা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে এবং ফুরাত নদী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তার আমলে মিশর অঞ্চলের বার্ষিক রাজস্ব ছিল তেতাল্লিশ লক্ষ দিনার।

দিনে দিনে মুওয়াফফাক বিল্লাহর সঙ্গে মনোমালিন্য বৃদ্ধি পেতে থাকলে একপর্যায়ে ইবনে তুলুন খুতবায় মুওয়াফফাকের নাম পাঠ বন্ধ করে দেন।

এর পূর্বে তিনি খুতবায় খলিফার নামের পর মুওয়াফফাকের নামও পাঠ করতেন।

আহমাদ বিন তুলুন ২৭০ হিজরি সনে (৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর সময় তুলুনিয়া রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ছিল আব্বাসি সাম্রাজ্যের চেয়েও বড়। তার অবর্তমানে তার পুত্র খুমারুইয়া তুলুনিয়া রাষ্ট্রের হাল ধরেন।

প্রজাদের সঙ্গে সদাচরণের ক্ষেত্রে খুমারুইয়া তার পিতার অনুসৃত নীতি অনুসরণ করেন। অবশ্য তিনি প্রাসাদ নির্মাণ ও অন্যান্য বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।

কিছুদিন পর মসুল, আনবার ও দামেশকের গভর্নরগণ মুওয়াফফাক বিল্লাহর সঙ্গে এ মর্মে একমত হয় যে, তারা যেকোনো মূল্যে খুমারুইয়ার হাত থেকে শাম অঞ্চল উদ্ধার করে খলিফার কাছে ফিরিয়ে দেবে। একে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশেষে ২৭১ হিজরি সনে দামেশকে সংঘটিত এক নিষ্পত্তিমূলক যুদ্ধে খুমারুইয়ার বিজয়ের মধ্য দিয়ে এই সংঘাতের সমাপ্তি ঘটে। এ সময় খুমারুইয়া মুওয়াফফাক বিল্লাহর সঙ্গে সন্ধি করেন। সমকালীন আব্বাসি খলিফা মুতামিদ তাকে ত্রিশ বছরের জন্য মিশর, শাম ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের আশপাশের অঞ্চলসমূহে শাসনকার্যের স্বীকৃতি প্রদান করেন।

২৭৮ হিজরি সনে মুওয়াফফাক বিল্লাহ এবং ২৭৯ হিজরি সনে (৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফা মুতামিদ মৃত্যুবরণ করার পর পরবর্তী খলিফা মুতাযিদ বিল্লাহর সঙ্গে খুমারুইয়ার সুসম্পর্ক তৈরি হয়। খলিফা মুতাযিদ খুমারুইয়ার কন্যা কতরুন-নাদার পাণিগ্রহণ করেন। খুমারুইয়া এ বিয়েতে যে উপঢৌকন প্রদান করেন, তা আজও উপমা হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। উপহারসামগ্রীর মধ্যে অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে ছিল হীরা-জহরতে পূর্ণ দশটি সিন্দুক। কতরুন-নাদা যেন পথে এক মনজিল পরপরই বিশ্রাম নিতে পারেন এবং বিশ্রামের সময় যেন অনুভব করেন যে, তিনি কায়রোর রাজপ্রাসাদেই আছেন—এ উদ্দেশ্যে খুমারুইয়ার নির্দেশে কায়রো থেকে বাগদাদ গমনের পথের প্রতিটি মনজিলে একটি করে প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়।

এই মাত্রাতিরিক্ত অপব্যয়ের ফলে তুলুনিয়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এর কিছুদিন পরই ২৮২ হিজরি সনের জিলকদ মাসে (৮৯৬

খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে) খুমারুইয়া দামেশকে তার জনৈক ভৃত্যের হাতে নিহত হন এবং তাকে মিশরে সমাহিত করা হয়।

খুমারুইয়ার মৃত্যুর পর তুলুনিয়া রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে। অপ্রাপ্তবয়স্ক শাসকের শাসনদুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শিয়া কারামাতিয়া গোষ্ঠী এ সময় শামে আক্রমণ করে এবং দামেশক অবরোধ করে রাখে। অবশেষে আব্বাসি খলিফার হস্তক্ষেপে কারামাতিয়ারা পরাজিত হয়। তুলুনিয়া রাষ্ট্রের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে খলিফা মুকতাফি বিল্লাহ ২৯২ হিজরি সনে (৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে) সেখানে আব্বাসি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং মিশর ও শাম অঞ্চল পুনরুদ্ধার করে পুনরায় আব্বাসি খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত করেন। এর মাধ্যমে সাঁইত্রিশ বছর ব্যাপ্ত তুলুনিয়া রাষ্ট্রের পতন ঘটে।

তুলুনিয়া রাষ্ট্রের শাসকগণের তালিকা

১.	আহমাদ বিন তুলুন আবুল আব্বাস	:	২৫৪-২৭০ হি. (৮৬৮-৮৮৪ খ্রি.)
২.	খুমারুইয়া বিন আহমাদ আবুল জাইশ (নিহত)	:	২৭০-২৮২ হি. (৮৮৪-৮৯৫ খ্রি.)
৩.	জাইশ বিন খুমারুইয়া আবুল আসাকির (বিষপ্রয়োগে মৃত্যু)	:	২৮২-২৮৩ হি. (৮৯৫-৮৯৬ খ্রি.)
৪.	হারুন বিন খুমারুইয়া আবু মুসা (নিহত)	:	২৮৩-২৯২ হি. (৮৯৬-৯০৪ খ্রি.)
৫.	শায়বান বিন আহমাদ বিন তুলুন আবুল মানাকিব	:	২৯২-২৯২ হি. (৯০৪-৯০৫ খ্রি.)

৬. ইখশিদিয়া রাষ্ট্র

[৩২৪-৩৫৮ হিজরি—৯৩৬-৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ]

একটু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২৯২ হিজরি সনে মিশর ও শামে তুলুনিয়া রাষ্ট্রের পতন ঘটে এবং পুনরায় অঞ্চলদুটি আব্বাসি খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর তিন দশক পর মিশরে প্রতিষ্ঠিত হয় আরেকটি স্বাধীন রাষ্ট্র ইখশিদিয়া। পরবর্তী সময়ে শাম ও হিজায অঞ্চলও ইখশিদিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইখশিদিয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুহাম্মাদ বিন তুগজ। তার উপাধি ছিল 'ইখশিদ'[১১]। মুহাম্মাদের পিতা তুগজ ছিলেন তুলুনিয়া রাজপরিবারের ক্রীতদাস।

৩২৪ হিজরি সনে (৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে) মাগরিবের উবায়দি শাসকগোষ্ঠী মিশর দখলের চেষ্টা চালালে মুহাম্মাদ বিন তুগজ তাদেরকে প্রতিহত করেন। এতে তৎকালীন আব্বাসি খলিফা রাযি বিল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাকে মিশরের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। আব্বাসি খিলাফতের সঙ্গে ইখশিদিয়া রাষ্ট্রের মিত্রতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। এমনকি মুহাম্মাদ বিন তুগজ একবার আব্বাসি খলিফা মুত্তাকি লিল্লাহকে বাগদাদ ছেড়ে মিশরে চলে আসার এবং মিশরকেই আব্বাসি খিলাফতের রাজধানী নির্ধারণ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। খলিফা অবশ্য তার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন।

যেহেতু একইসময় শিয়া মতাদর্শী হামদানি পরিবার শামে কর্তৃত্ব বিস্তারে সচেষ্ট ছিল, তাই হামদানি পরিবারের সঙ্গে ইখশিদি শাসক পরিবারের দীর্ঘদিন ধরে সংঘাত চলতে থাকে। হামদানি পরিবার শামের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী ইখশিদি শাসকগণ তাদেরকে জিজিয়া প্রদান করতে বাধ্য হয়।

সামগ্রিকভাবে ইখশিদি শাসকগণ ধর্মপরায়ণ ছিলেন। ইখশিদিয়া রাজপ্রাসাদ সবসময় আলিম-উলামা ও কবি-সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে মুখরিত থাকত। মুহাম্মাদ বিন তুগজ প্রতি রমজানে কুরআন খতমে

---

১১. 'ইখশিদ' শব্দের অর্থ রাজাধিরাজ। মাওয়ারাউন নাহারের ফারগানা অঞ্চলের শাসকদেরকে ইখশিদ উপাধি প্রদান করা হতো। যেহেতু মুহাম্মাদ বিন তুগজ বংশগত দিক থেকে ফারগানার অধিবাসী ছিলেন, তাই তার অনুরোধে খলিফা রাযি বিল্লাহ তাকে এই প্রাচীন ফার্সি উপাধি প্রদান করেন।

উপস্থিত হতেন এবং তেলাওয়াত শ্রবণের সময় ক্রন্দন করতেন। একবার তার এক দাসী তাকে মসজিদে কুরআন খতমে উপস্থিত হতে নিরুৎসাহিত করলে তিনি তাকে বলেন, 'ধিক তোমাকে! হতে পারে আজ কুরআন খতমের মজলিসে এমন কোনো ব্যক্তি উপস্থিত থাকবেন, আল্লাহ তাআলার দরবারে যার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। তিনি যখন দোয়ায় বলবেন—হে আল্লাহ, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন, তখন হয়তো আমিও ক্ষমাপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।' এরপর তিনি মসজিদে উপস্থিত হয়ে নামাজ ও কুরআন খতমে শরিক হন।

মুহাম্মাদ বিন তুগজের শাসনামলে মিশরের বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ বিশ লক্ষ দিনারে পৌঁছেছিল। পরবর্তী সময়ে কাফুরের আমলে রাজস্ব আরও বৃদ্ধি পেয়ে বত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার দিনারে উন্নীত হয়।

৩৩৪ হিজরি সনে (৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে) মুহাম্মাদ বিন তুগজ মৃত্যুবরণ করলে তার পুত্র আবুল কাসিম আনুজুর তার স্থলাভিষিক্ত হন। যেহেতু আনুজুরের বয়স তখনও চৌদ্দ পেরোয়নি, তাই তার পিতার ক্রীতদাস কাফুরই আনুজুরের পক্ষে রাষ্ট্রের যাবতীয় বিষয় দেখভাল করতেন। এ সময় হামদানি শাসক সাইফুদ্দৌলা দামেশক দখল করে নিলে কাফুর তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাকে দামেশক থেকে বিতাড়িত করেন। কাফুর সাইফুদ্দৌলার পশ্চাদ্ধাবন করে আলেপ্পোর মারযে-আযরা পর্যন্ত পৌঁছে তাকে পরাজিত করেন। এরপর কাফুর মিশরে ফিরে গেলে সাইফুদ্দৌলা পুনরায় আলেপ্পোতে ফিরে আসেন। পরে উভয় পক্ষের মাঝে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়।

কাফুর আব্বাসি খলিফার কাছ থেকে ইখশিদিয়া রাষ্ট্রের নবীন শাসক আবুল কাসিমের জন্য মিশর, শাম, মক্কা, মদিনা এবং পরবর্তী সময়ে আলেপ্পো ও তারতুস নগরীর প্রশাসন দায়িত্বের স্বীকৃতি আদায়ে সক্ষম হন। এর ফলে ইখশিদিয়া রাষ্ট্রে কাফুরের প্রভাব-প্রতিপত্তি সুদৃঢ় হয়। মূলত আবুল কাসিম, তার ভাই আবুল হাসান আলি এবং আবুল হাসানের পুত্র আহমাদের শাসনামলে ইখশিদিয়া রাষ্ট্রের মূল হর্তাকর্তা কাফুরই ছিলেন। আহমাদের আমলেই কাফুর আব্বাসি খলিফার কাছ থেকে মিশরের প্রশাসক নিযুক্তির বার্তা অর্জন করেন। ৩৫৭ হিজরিতে (৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে) কাফুরের মৃত্যু হয়।

কাফুরের প্রশাসক নিযুক্ত হওয়ার পরবর্তী দু-বছরের অধিক সময় (৩৫৫-৩৫৭ হিজরি) মিশর ও শাম একইসঙ্গে ত্রিমুখী হামলার সম্মুখীন হয়। পূর্ব দিক থেকে কারামাতিয়া বাহিনী, পশ্চিম দিক থেকে উবায়দি বাহিনী এবং দক্ষিণ দিক থেকে (বর্তমান সুদানের অন্তর্ভুক্ত) নুবিয়া রাষ্ট্রের বাহিনী মিশরের ওপর হামলা চালায়।

কাফুরের মৃত্যুর পর সেনাবাহিনীর নেতৃবৃন্দ আহমাদ বিন আলিকে ইখশিদিয়া রাষ্ট্রের শাসক নির্বাচিত করে। যেহেতু আহমাদ তখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন, তাই তার চাচা ও শামের গভর্নর হাসান বিন উবায়দুল্লাহ বিন তুগজকে তার তত্ত্বাবধায়ক মনোনীত করা হয়। হাসান প্রথমে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করলেও পরে ব্যর্থ হয়ে শামে ফিরে যান। এরইমাঝে উবায়দিরা প্রথমে মিশর ও তারপর শামে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। উবায়দিরা হাসান বিন উবায়দুল্লাহকে বন্দি করে মাগরিবে পাঠিয়ে দেয়। তিনি ৩৭১ হিজরি সনে মাগরিবেই মৃত্যুবরণ করেন।

৩৫৮ হিজরি সনে (৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) মিশরে উবায়দিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পতন ঘটে চৌত্রিশ বছর ব্যাপ্ত ইখশিদিয়া রাষ্ট্রের।

ইখশিদিয়া রাষ্ট্রের শাসকগণের তালিকা

১.	মুহাম্মদ বিন তুগজ আবু বকর ইখশিদ	:	৩২৪-৩৩৪ হি. (৯৩৫-৯৪৬ খ্রি.)
২.	আনুজুর বিন মুহাম্মাদ আবুল কাসিম	:	৩৩৪-৩৪৯ হি. (৯৪৬-৯৬০ খ্রি.)
৩.	আলি বিন মুহাম্মাদ আবুল হাসান	:	৩৪৯-৩৫৫ হি. (৯৬০-৯৬৬ খ্রি.)
৪.	কাফুর আল-লাইছি আবুল মিসক[১২]	:	৩৫৫-৩৫৭ হি. (৯৬৬-৯৬৮ খ্রি.)
৫.	আহমাদ বিন আলি বিন মুহাম্মাদ আবুল ফাওয়ারিস	:	৩৫৭-৩৫৮ হি. (৯৬৮-৯৬৯ খ্রি.)

[১২]. মুহাম্মাদ বিন তুগজের ক্রীতদাস কাফুর কাগজে-কলমে ৩৫৫ হিজরি সনে ক্ষমতা লাভ করলেও প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মাদ বিন তুগজের মৃত্যুর (৩৩৪ হিজরি) পর থেকেই তার একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল।

৭. বনু হামদান রাষ্ট্র

[২৯৩-৩৯২ হিজরি—৯০৬-১০০২ খ্রিষ্টাব্দ]

তাগলিব গোত্রের হামদান বিন হামদুন ইবনুল হারিসের দিকে সম্বন্ধ করে এই রাষ্ট্রের নামকরণ করা হয়। রোমান সীমান্তে জাযিরা বা মেসোপটেমিয়া উচ্চভূমি (Upper Mesopotamia) অঞ্চলের মসুল (দিয়ারে রাবিআ), আলেপ্পো ও হিমস এলাকাজুড়ে ছিল বনু হামদান রাষ্ট্রের বিস্তৃতি।

হামদান বিন হামদুনের পুত্র হুসাইন বিন হামদান আব্বাসি খিলাফতের সমর্থক নিষ্ঠাবান সেনাপতি ছিলেন। খলিফার নির্দেশে তিনি ২৮৩ হিজরি সনে (৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে) খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আব্বাসি খলিফাকে সহযোগিতা করেন। এরপর ২৯১ হিজরি সনে (৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে) কারামাতিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এবং ২৯২ হিজরি সনে (৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে) তুলুনিয়া রাষ্ট্রের হাত থেকে মিশর পুনরুদ্ধারের যুদ্ধেও তিনি আব্বাসি বাহিনীকে সহায়তা করেন এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। ২৯৮ হিজরি সনে (৯১১ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফা মুকতাদির বিল্লাহ তাকে দিয়ারে রাবিআ অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করেন। কিন্তু পরে বিভিন্ন কারণে খলিফা মুকতাদির বিল্লাহর সঙ্গে তার বিরোধ সৃষ্টি হয়। এরই প্রেক্ষিতে হুসাইনকে বন্দি করা হয় এবং ৩০৬ হিজরি সনে (৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে) বন্দি অবস্থায় খলিফার নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়। তার মৃত্যুর পর দিয়ারে রাবিআ অঞ্চলে তার ভাই ইবরাহিম বিন হামদান তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং ৩০৮ হিজরিতে তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। এরপর দিয়ারে রাবিআর দায়িত্ব লাভ করেন হুসাইনের আরেক ভাই দাউদ বিন হামদান। তিনি আব্বাসি খলিফা মুকতাদির বিল্লাহর পূর্ণ অনুগত ছিলেন। খলিফার সঙ্গে সেনাপতি মুনিস আল-খাদিমের সংঘাতের সময় তিনি খলিফার পক্ষে যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধ চলাকালেই তিনি তিরবিদ্ধ হন এবং ৩২০ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন।

অপরদিকে মসুল ও নিহাবন্দ অঞ্চলের দায়িত্ব ছিল হুসাইনের আরেক ভাই আবুল আলা সাইদ বিন হামদানের কাছে। পরে ২৯৩ হিজরি সনে মসুল ও নিহাবন্দের দায়িত্ব লাভ করেন হুসাইনের আরেক ভাই আবুল হাইজা আবদুল্লাহ বিন হামদান। আবুল হাইজাকেই হামদানিয়া রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা গণ্য করা হয়। ৩১৭ হিজরিতে (৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফা মুকতাদির বিল্লাহর বিরুদ্ধে তার ভাই কাহির বিল্লাহর এক বিদ্রোহ

প্রচেষ্টায় আবুল হাইজা কাহির বিল্লাহর পক্ষ নেন। কিন্তু মুকতাদির বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন এবং ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন। এ সময় আবুল হাইজাকে হত্যা করা হয়। বিদ্রোহে শরিক তাদের আরেক ভাই আবুস সারায়া নাসর বিন হামদান পালিয়ে মসুলে চলে যান। ৩২২ হিজরি সনে নতুন আব্বাসি খলিফা কাহির বিল্লাহ তাকে হত্যা করেন। এভাবে ৩২২ হিজরির আগেই হামদান বিন হামদুনের সকল সন্তান মৃত্যুবরণ করেন। অবশ্য মৃত্যুর আগেই আবুল হাইজা তার পুত্র হাসান নাসিরুদ্দৌলাকে মসুলে তার স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন। তিনি ৩১৭ হিজরি সনে (৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে) মসুলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ৩৫৮ হিজরি সনে (৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত মসুলে আপন কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হন। অবশ্য মাঝে ৩১৭ হিজরি হতে ৩১৯ হিজরি পর্যন্ত সময়ে তার দুই চাচা আবুল আলা সাইদ বিন হামদান ও আবুস সারায়া নাসর বিন হামদান খলিফা মুকতাদির বিল্লাহর নির্দেশে মসুলে কর্তৃত্ব বিস্তার করেছিলেন।

হামদানি পরিবারের শাসকগণ শিয়া মতাদর্শী ছিলেন। অবশ্য তাদের শাসনভুক্ত এলাকার জনগণ ছিল সুন্নি ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর অন্তর্ভুক্ত।

সাইফুদ্দৌলা হামদানির মাধ্যমে হামদানিয়া রাষ্ট্র সুখ্যাতি লাভ করে। তিনি ৩৩৩ হিজরি সনে (৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে) আলেপ্পোতে হামদানিদের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং মসুলের অধিপতি তার ভাই নাসিরুদ্দৌলার মিত্ররূপে কাজ করেন। সাইফুদ্দৌলা ছিলেন সমকালীন বিশ্বের খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক। বিখ্যাত সাহিত্যিক আবুত তাইয়িব মুতানাব্বি, বিখ্যাত নাহুবিদ ইবনে খালাওয়াইহ, *কিতাবুল আগানির* রচয়িতা আবুল ফারজ ইস্পাহানি, প্রখ্যাত দার্শনিক আবু নাসর ফারাবিসহ বড় বড় কবি-সাহিত্যিক তার দরবারে সমবেত হতেন। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তার অব্যাহত লড়াই ও অভিযান ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ স্থান অধিকার করে আছে। সাইফুদ্দৌলাই প্রথম বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদ ও প্রতিরোধ যুদ্ধ চেতনার উন্মেষ ঘটান। তার শাসনামলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের মালাতিয়া (Malatya), হাদাস, মারআশ (Kahramanmaraş), হারুনিয়া, কানিসা, আইনে যারবা (Anazarbus), মপসুয়েসটিয়া (Mopsuestia), আদানা (Adana), তারসুস

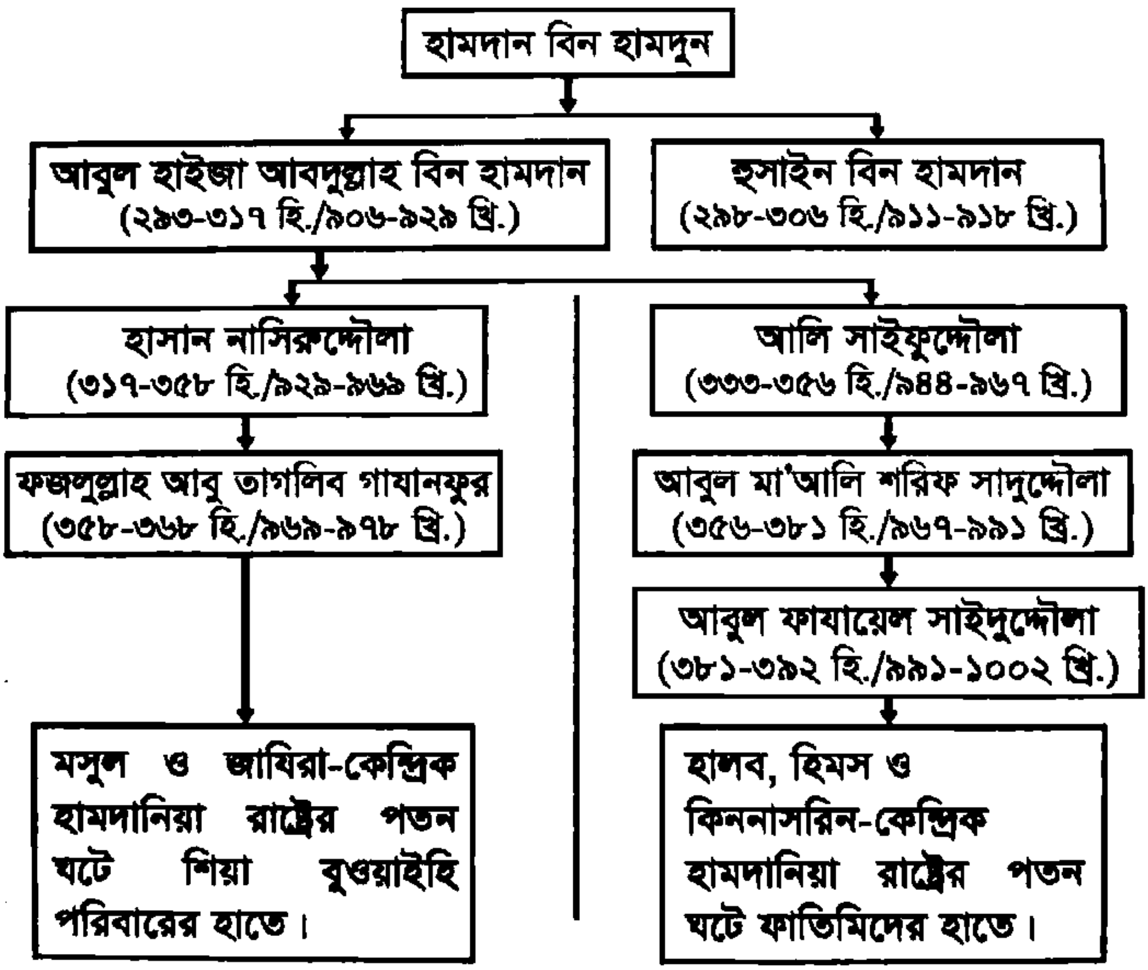
(Tarsus) প্রভৃতি সীমান্ত অঞ্চল[১৩] ছিল প্রবল প্রতিরোধযুদ্ধের ব্যস্ত রণক্ষেত্র। সাইফুদ্দৌলা এসব যুদ্ধক্ষেত্রে বাইজান্টাইন বাহিনীর অব্যাহত হামলা প্রতিরোধ করে ইসলামি ভূখণ্ডের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন।

প্রখ্যাত ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক ও বাইজান্টাইন ইতিহাস বিশেষজ্ঞ মার্ক হুইটো (Mark Whittow) (১৯৫৭-২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ) বলেন, 'সাইফুদ্দৌলার প্রতিরোধ যুদ্ধসমূহ ছিল ক্রুসেড যুদ্ধ ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়।'

আব্বাসি খিলাফতের সঙ্গে হামদানিয়া রাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিল আনুগত্য ও বিদ্রোহ, মিত্রতা ও শত্রুতার মাঝে দোদুল্যমান। আর পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, হামদানি পরিবার শিয়া অনুরাগী ছিল।

মসুল ও জাযিরা-কেন্দ্রিক হামদানিয়া রাষ্ট্রের পতন ঘটে বুওয়াইহি পরিবারের হাতে আর আলেপ্পো, হিমস ও কিননাসরিন-কেন্দ্রিক হামদানিয়া রাষ্ট্রের পতন ঘটে উবায়দি বাহিনীর হাতে।

বনু হামদানের বংশলতিকা



---

১৩. এই সবগুলো অঞ্চল বর্তমানে আধুনিক তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত।

৮. সামানিয়া রাষ্ট্র

[২৬১-৩৮৯ হিজরি—৮৭৪-৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ]

মাওয়ারাউন নাহার অঞ্চলে এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে ভারতবর্ষ, আফগানিস্তান ও খোরাসানের কিছু অঞ্চলও সামানিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। সামানি রাজপরিবারের আদি নিবাস সামান[১৪] এলাকার প্রতি সম্বন্ধ করে রাষ্ট্রের নামকরণ করা হয় সামানিয়া রাষ্ট্র।

সামানি পরিবার বনু উমাইয়ার খিলাফতকালে প্রথমবারের মতো ইসলামের সংস্পর্শে আসে। আব্বাসি খলিফা মামুন তার শাসনামলের শুরুর দিকে যখন মার্ভে অবস্থান করছিলেন, তখন আসাদ সামানি নামক সামানি পরিবারের জনৈক মুসলিম সদস্য মামুনের দরবারে আগমন করলে খলিফা তাকে যথেষ্ট মূল্যায়ন করেন। পরবর্তী সময়ে ২০৪ হিজরি সনে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করার পর মামুন আসাদ সামানির চার পুত্রকে মাওয়ারাউন নাহারের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। এ সময় নুহ বিন আসাদকে সমরকন্দ, ইয়াহইয়া বিন আসাদকে শাশ ও উশরুসানা (Osrushana), আহমাদ বিন আসাদকে ফারগানা এবং ইলয়াস বিন আসাদকে হেরাত অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়।

এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন আহমাদ বিন আসাদ। তিনি ও তার সাত পুত্র মাওয়ারাউন নাহার অঞ্চলের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। আহমাদ বিন আসাদের পুত্রদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিলেন নাসর বিন আহমাদ।

আব্বাসি খলিফাদের কাছে সামানি পরিবারের যথেষ্ট মর্যাদা ও নৈকট্য ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ২৬১ হিজরি সনে (৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে) তৎকালীন আব্বাসি খলিফা মুতামিদ আলাল্লাহ নাসর বিন আহমাদের হাতে সমগ্র মাওয়ারাউন নাহার অঞ্চলের শাসনভার তুলে দেন। দায়িত্ব পেয়েই নাসর বিন আহমাদ মাওয়ারাউন নাহার অঞ্চলের প্রতিটি অংশে তার ভাইদের প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। মূলত এখান থেকেই সামানি রাজপরিবারের গৌরব ও মর্যাদার নব-অধ্যায়ের সূচনা হয়।

---

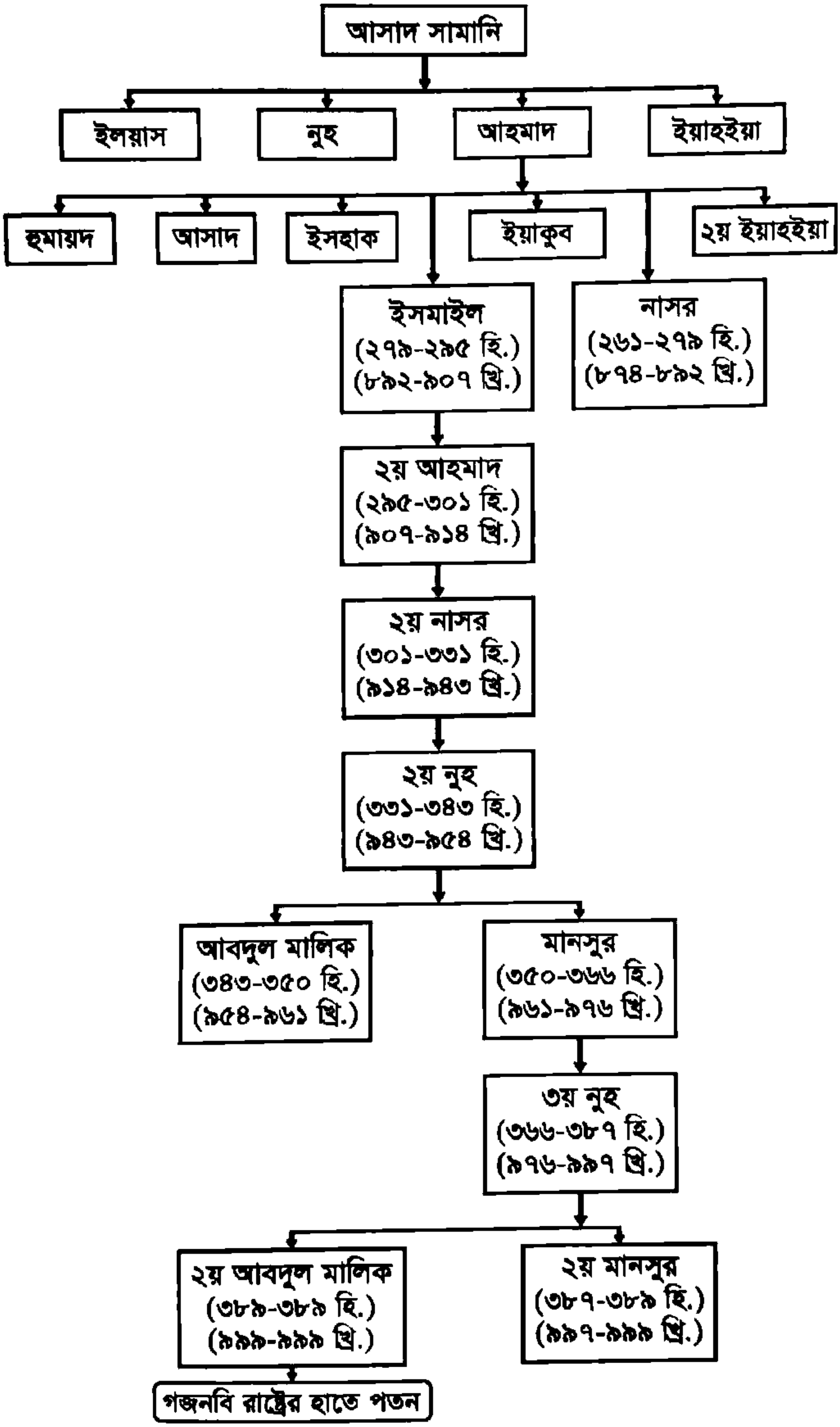
[১৪]. সামান : সমরকন্দের নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম।

আব্বাসি খিলাফতের সঙ্গে সামানিয়া রাষ্ট্রের পূর্ণ মিত্রতা ও আনুগত্যের সম্পর্ক ছিল। সামানি রাজপরিবার ছিল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর অনুসারী। তাদের শাসনামলে মাওয়ারাউন নাহার অঞ্চল জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ও জীবনযাত্রার মানের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির শীর্ষ চূড়ায় উন্নীত হয়। এখান থেকেই পৃথিবী লাভ করে ইবনে সিনা ও রাযির ন্যায় জগদ্বিখ্যাত মনীষীদেরকে। সামানিয়া রাষ্ট্রে আলিম-উলামা ও জ্ঞানী-গুণীদের সর্বোচ্চ মর্যাদা ও মূল্যায়ন ছিল।

আব্বাসি খিলাফতের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তারকারী বুওয়াইহি পরিবারের সঙ্গে সামানি পরিবারের অনেকগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে নুহ বিন মানসুরের শাসনামলে (৩৬৬-৯৮৭ হিজরি) সামানিয়া রাষ্ট্র ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ প্রচেষ্টার সম্মুখীন হয়। নুহ বিন মানসুর অল্পবয়স্ক হওয়ায় একদিকে তার মা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন, অপরদিকে উজিররাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার করত। সামানিয়া রাষ্ট্রের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বুওয়াইহি পরিবার ও তুর্কিরা এ সময় এ অঞ্চলে কর্তৃত্ব বিস্তারের চেষ্টা চালায়।

অবশেষে সুলতান মাহমুদ গজনবি ৩৮৯ হিজরি সনে (৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে) বুখারা ও নিশাপুর দখল করে সামানি পরিবারের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত করেন এবং এ অঞ্চলে আব্বাসি খলিফা কাদির বিল্লাহর নামে খুতবা চালু করেন।

সামানিয়া রাজপরিবারের বংশলতিকা



৯. গজনবি (সুবুক্তগিন) রাষ্ট্র

[৩৬৬-৫৮২ হিজরি—৯৭৭-১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দ]

বর্তমান আফগানিস্তানে অবস্থিত গজনি নগরীর প্রতি সম্বন্ধ করে এ সাম্রাজ্যের নামকরণ করা হয় গজনবি রাষ্ট্র। অপরদিকে প্রতিষ্ঠাতা সুবুক্তগিনের প্রতি সম্বন্ধ করে একে সুবুক্তগিন রাষ্ট্রও বলা হয়।

সামানি রাজপরিবারের জনৈক তুর্কি ক্রীতদাসের নাম ছিল আলপতেগিন (Alp-Tegin)। আলপতেগিন আপন কর্মদক্ষতা ও উচ্চাভিলাষের মাধ্যমে সামানি রাজপরিবারে বিশেষ অবস্থান তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ৩৪৯ হিজরি সনে (৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে) সামানি শাসক আবদুল মালিক বিন নুহ তাকে খোরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। পরবর্তী শাসক মানসুর বিন নুহ দায়িত্ব গ্রহণের পর তাকে বরখাস্ত করলে তিনি বলখে চলে যান এবং কিছুদিন পর মানসুরের বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। ৩৫১ হিজরি সনে (৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে) আলপতেগিন গজনি নগরীর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাকি জীবন গজনিতেই কাটিয়ে দেন।

৩৫২ হিজরি সনে (৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে) আলপতেগিন ইন্তেকাল করলে তার পুত্র ইসহাক গজনির নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি সামানি রাজপরিবারের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেন এবং তাদেরকে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ৩৫৫ হিজরি সনে (৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে) নিঃসন্তান ইসহাক ইন্তেকাল করলে পরবর্তী এগারো বছর দুজন উজির পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করে। অবশেষে ৩৬৬ হিজরি সনে (৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে) গজনির শাসনভার গ্রহণ করেন সুবুক্তগিন। আলপতেগিনের মালিকানাধীন তুর্কি ক্রীতদাস সুবুক্তগিন ইতিপূর্বে আলপতেগিনের আমলে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছিলেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর সুবুক্তগিন ভারতবর্ষের দিকে রাজত্ব সম্প্রসারিত করেন।

অবশ্য সুবুক্তগিন স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সামানিয়া রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করতেন। এ কারণেই সামানি শাসক নুহ বিন মানসুরের বিরুদ্ধে বুখারায় বিদ্রোহ প্রচেষ্টা সংঘটিত হলে সুবুক্তগিন তা দমনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। বিদ্রোহ দমনে সুবুক্তগিনের সাফল্যে খুশি হয়ে নুহ বিন মানসুর তাকে নাসিরুদ্দৌলা উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তার পুত্র মাহমুদকে সাইফুদ্দৌলা উপাধি প্রদান করে খোরাসানের বাহিনীর

সেনাপতি নিযুক্ত করেন। সুবুক্তগিনকেই গজনবি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা গণ্য করা হয়।

ভারতবর্ষের সুবিস্তৃত অঞ্চলে ইসলামি অভিযান পরিচালনা ও বিজিতকরণে গজনবি পরিবারের, বিশেষ করে মাহমুদ বিন সুবুক্তগিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুলতান মাহমুদ বিন সুবুক্তগিন ৩৯১ হিজরি সন থেকে ৪১৮ হিজরি সন (১০০১-১০২৭ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত সময়ে ভারতবর্ষে সতেরোবার অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্রত্যেকবারই বিভিন্ন অঞ্চল জয় করেন। এ ছাড়াও মাহমুদ গজনবি জাবাল ও রায় অঞ্চলে বুওয়াইহি শাসনের পতন ঘটান, কাজবিন নগরীতে অভিযান চালিয়ে শিয়া বাতিনি ফিরকার প্রচুর লোককে হত্যা করেন এবং মুতাজিলা মতাদর্শীদেরকে খোরাসানে নির্বাসিত করেন। এ সময় সুলতান মাহমুদ দর্শন, মুতাজিলা মতবাদ ও জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থাদি জ্বালিয়ে দেন। তিনি (৪১৯ হিজরি সনে) ১০২৮ খ্রিষ্টাব্দে উগুজ তুর্কিদের (Oghuz Turks) বিরুদ্ধে লড়াই করে খোরাসানে কর্তৃত্ব স্থাপন করেন এবং খোরাসানে সামানি কর্তৃত্বের পতন ঘটান।

সুলতান মাহমুদ গজনবির শাসনামলে গজনবি রাষ্ট্র বুখারা-সমরকন্দ হতে গুজরাট ও কনৌজ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। আফগানিস্তান, মাওয়ারাউন নাহার, সাজিস্তান, খোরাসান, তিবরিস্তান ও কাশ্মীরসহ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বিভিন্ন প্রদেশ তার শাসনামলে গজনবি রাষ্ট্রের অংশ ছিল। সুলতান মাহমুদ ৪২১ হিজরি সনে (১০৩০ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন।

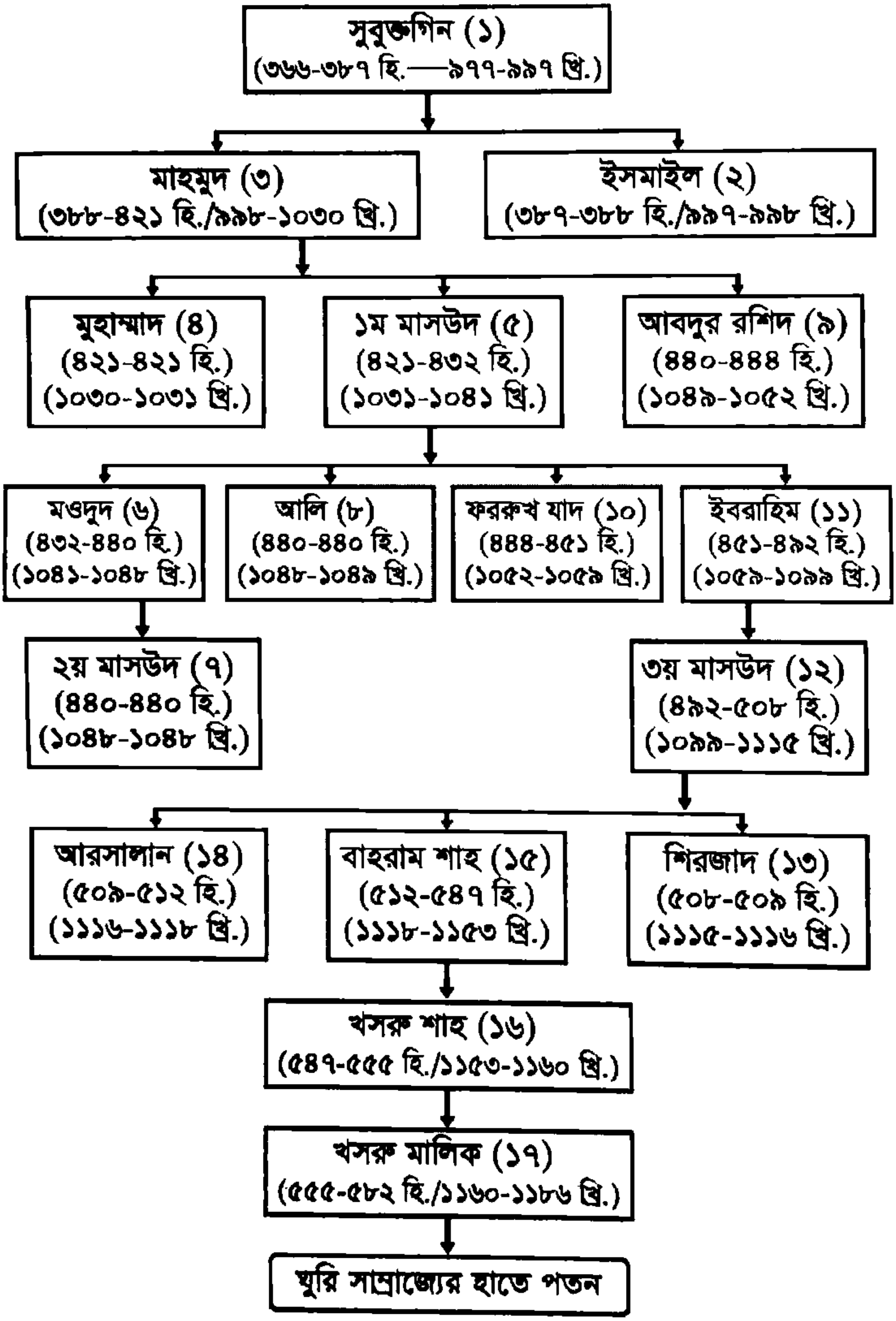
ঐতিহাসিকগণ সুলতান মাহমুদ গজনবি সম্পর্কে বলেন, 'তিনি ছিলেন ইসলামের মহান যোদ্ধা, মুজাহিদ। ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব তিনি আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। ভারতবর্ষে বিজয়াভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি এমন সব অঞ্চলও জয় করেছিলেন, যেখানে ইতিপূর্বে কোনো ইসলামি পতাকা পৌঁছতে পারেনি এবং মহান আল্লাহ তাআলার নাম ও বাণী কখনো উচ্চারিত হয়নি।'

গজনবি রাষ্ট্র আব্বাসি খিলাফতের পূর্ণ অনুগত ছিল। গজনবি শাসকগণ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর অনুসারী ছিলেন। দীর্ঘকাল তারা জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং আলিম-উলামা ও জ্ঞানী-গুণীদের মূল্যায়ন করেছেন। ইবনে সিনা, আল-বিরুনি, ফিরদাউসিসহ

নামকরা আলিম ও সাহিত্যিকগণ সুলতান মাহমুদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন।

সুলতান মাহমুদের ইন্তেকালের পর ধীরে ধীরে গজনবি রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে। ৪৪৫ হিজরি সনে (১০৫৩ খ্রিষ্টাব্দে) তৎকালীন সেলজুক সুলতান তুগরুল বেগের সহকারী ও ভ্রাতুষ্পুত্র আলপ আরসালান গজনবি রাষ্ট্রে হামলা চালিয়ে বিরাট এলাকা দখল করে নেন। এরপর ৫৪৬ হিজরি সনে (১১৫১ খ্রিষ্টাব্দে) ঘুরি রাষ্ট্রের শাসক মুহাম্মাদ ঘুরি হামলা চালিয়ে গজনবি রাষ্ট্রের রাজধানী গজনি দখল করেন। এর ফলে গজনবি রাষ্ট্রের পরিধি ভারতবর্ষের লাহোর, পাঞ্জাবসহ সীমিত কিছু অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ৫৮২ হিজরি সনে (১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দে) ঘুরি বাহিনী তৎকালীন গজনবি শাসক খসরু মালিককে তার পরিবারসহ বন্দি করলে গজনবি রাষ্ট্রের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

সুবুক্তগিন রাজপরিবারের শাসকগণের বংশলতিকা



১০. খোরাসান ও মাওয়ারাউন নাহার-কেন্দ্রিক খোয়ারিজম রাষ্ট্র

[৪৭০-৬২৮ হিজরি—১০৭৭-১২৩১ খ্রিষ্টাব্দ]

সেলজুক সুলতান জালালুদ্দৌলা আবুল ফাত্তাহ মালিক শাহর জনৈক ক্রীতদাসের নাম ছিল আনুশতেগিন। আনুশতেগিন আপন প্রতিভা, কর্মদক্ষতা ও উন্নত চরিত্রের মাধ্যমে মালিক শাহর নৈকট্য অর্জনে সক্ষম হন এবং মালিক শাহ তাকে ৪৭০ হিজরি সনে (১০৭৭ খ্রিষ্টাব্দে) খোয়ারিজম অঞ্চলের গভর্নর পদ প্রদান করেন।

৪৯০ হিজরি সনে (১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দে) আনুশতেগিনের ইন্তেকাল হলে তৎকালীন সেলজুক সুলতান বারকিয়ারুক বিন মালিক শাহ আনুশতেগিনের পুত্র কুতুবুদ্দিন মুহাম্মাদকে খোয়ারিজমের নতুন প্রশাসক নির্বাচিত করেন। কুতুবুদ্দিন মুহাম্মাদ 'খোয়ারিজম শাহ' (খোয়ারিজমের সুলতান) নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি সচ্চরিত্র ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি আলিম-উলামা ও জ্ঞানী-গুণীদের সাহচর্য গ্রহণ করতেন এবং তাদেরকে কাছে রাখতেন। খোয়ারিজম শাহ ৫২২ হিজরি সনে (১১২৮ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন।

পঞ্চম খোয়ারিজম সুলতান আলাউদ্দিন তিকিশ ৫৯০ হিজরি সনে (১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) সেলজুক সুলতান তৃতীয় তুগরল বিন আরসালান শাহকে হত্যা করেন এবং এর মধ্য দিয়ে ইরাকে সেলজুক সালতানাতের পতন ঘটে। আলাউদ্দিন তিকিশের শাসনামলে খোয়ারিজম রাষ্ট্র বেশ বিস্তৃতি লাভ করে। সেলজুকদের পরাজিত করে রায় নগরী অধিকার করার পর তার রাজত্ব পূর্বে মাওয়ারাউন নাহারের সীমান্ত এলাকা হতে পশ্চিমে রায় নগরী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

ষষ্ঠ খোয়ারিজম শাসক আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ খোয়ারিজম রাষ্ট্রপরিধি বৃদ্ধিতে উদ্যোগী হন এবং পার্শ্ববর্তী ঘুরি সাম্রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। একে কেন্দ্র করে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে এক দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী সংঘাতের সূচনা হয়। অবশেষে ৬১১ হিজরি সনে (১২১৪ খ্রিষ্টাব্দে) ঘুরি রাষ্ট্রের অধিকাংশ অঞ্চল খোয়ারিজমিদের দখলে চলে আসার মাধ্যমে এই সংঘাতের সমাপ্তি ঘটে।

আলাউদ্দিন মুহাম্মাদের স্বপ্ন ছিল আরও বিস্তৃত। তিনি খোয়ারিজম রাষ্ট্রকে ক্ষমতা ও আয়তনে এতটা সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, যাতে আব্বাসি খলিফার ওপরও তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি তৎকালীন আব্বাসি খলিফা নাসির লি দ্বীনিল্লাহকে অনুরোধ জানান—তাকে যেন বাগদাদের সুলতান ঘোষণা করা হয়। আব্বাসি খিলাফত এর অল্প কয়েক বছর পূর্বে সেলজুক সুলতানদের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়েছিল। নতুন করে যেন আব্বাসি খিলাফত শক্তিশালী কোনো শাসক পরিবারের কর্তৃত্বের শিকার না হয়, এ বিষয়ে খলিফা সর্বোচ্চ সচেষ্ট ছিলেন। তাই খলিফা সুস্পষ্ট ভাষায় আলাউদ্দিন মুহাম্মাদের অনুরোধ প্রত্যাখান করেন। এতে আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং ঘোষণা করেন যে, আব্বাসি রাজপরিবারের মুসলমানদের খিলাফতের দায়িত্ব পালনের কোনো অধিকার নেই। আলাউদ্দিন আব্বাসি পরিবারের প্রতি এ অপবাদও আরোপ করেন যে, তারা আলি-পরিবারের কাছ থেকে খিলাফত ছিনিয়ে নিয়েছে। এরপর তিনি আলাউল মুলক তিরমিজি নামক জনৈক আলাবি ব্যক্তিকে মুসলিম উম্মাহর খলিফা ঘোষণা করেন এবং এর বৈধতার স্বপক্ষে কতক উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে ফতোয়াও সংগ্রহ করেন।

এরপর আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ তার বাহিনী নিয়ে বাগদাদ অভিমুখে রওনা হন। পথিমধ্যে বাগদাদের নিরাপত্তায় অগ্রসর হওয়া প্রতিটি বাহিনীকে তিনি পরাজিত করেন। খোয়ারিজম বাহিনী যখন বাগদাদের কাছাকাছি পৌঁছে শিবির স্থাপন করে, তখন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয় এবং বাহিনীর প্রচুর সৈন্য মারা যায়। মারা পড়ে যোদ্ধাদের বাহন জন্তুগুলোও। বাধ্য হয়ে আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ অভিযান স্থগিত করে খোয়ারিজমে প্রত্যাবর্তন করেন।

এর কদিন পরই ইসলামি বিশ্বের ওপর নেমে আসে 'তাতার' নামের এক প্রলয়ংকরী ঝড়, যার প্রথম শিকার হয় খোয়ারিজম রাষ্ট্র। তাতারদের আগ্রাসনে খোয়ারিজম রাষ্ট্র ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় আর শাসক আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ পালিয়ে নির্বাসিত অবস্থায় কাস্পিয়ান সাগরের এক অখ্যাত দ্বীপে মৃত্যুবরণ করেন। ৬১৬-৬১৭ হিজরি সনে তাতারদের এই আগ্রাসনেই মূলত খোয়ারিজম রাষ্ট্রের পতন ঘটে। অবশ্য পরে আলাউদ্দিন মুহাম্মাদের পুত্র ও শেষ খোয়ারিজম শাসক জালালুদ্দিন শাহ তাতার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদেরকে দমন করার এবং নতুন করে খোয়ারিজম রাষ্ট্র গড়ে

তোলার চেষ্টা করেন। ৬২৮ হিজরি সনে (১২৩১ খ্রিষ্টাব্দে) তার নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে সেই প্রচেষ্টারও সমাপ্তি ঘটে এবং খোয়ারিজম রাষ্ট্রের চূড়ান্ত পতন ঘটে। খোয়ারিজ

খোয়ারিজম শাসকগণের তালিকা

১.	আনুশতেগিন	:	৪৭০-৪৯০ হি. (১০৭৭-১০৯৭ খ্রি.)
২.	কুতুবুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আনুশতেগিন খোয়ারিজম শাহ	:	৪৯০-৫২২ হি. (১০৯৭-১১২৮ খ্রি.)
৩.	আতসিজ বিন কুতুবুদ্দিন মুহাম্মাদ	:	৫২২-৫৫১ হি. (১১২৮-১১৫৬ খ্রি.)
৪.	আরসালান বিন আতসিজ	:	৫৫১-৫৬৭ হি. (১১৫৬-১১৭২ খ্রি.)
৫.	আলাউদ্দিন তিকিশ বিন আরসালান	:	৫৬৭-৫৯৬ হি. (১১৭২-১২০০ খ্রি.)
৬.	আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আলাউদ্দিন তিকিশ	:	৫৯৬-৬১৭ হি. (১২০০-১২২০ খ্রি.)
৭.	জালালুদ্দিন শাহ বিন আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ	:	৬১৭-৬২৮ হি. (১২২০-১২৩১ খ্রি.)

১১. ঘুরি রাষ্ট্র

তাজিক বংশোদ্ভূত একটি পরিবারের নাম শানিসবানি। শানিসবানি পরিবার (বর্তমান আফগানিস্তানের অন্তর্গত) গজনি ও হেরাতের মধ্যবর্তী ঘুর নামক এলাকায় বসবাস করত বলে তাদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র 'ঘুরি রাষ্ট্র' নামে পরিচিত হয়। পাহাড়ি উপত্যকাবেষ্টিত ঘুর অত্যন্ত শীতল ও নির্জন একটি অঞ্চল।

ঘুরি (শানিসবানি) পরিবার ছিল গজনবি রাজপরিবারের অনুগত ও আস্থাভাজন একটি পরিবার। এরই প্রেক্ষিতে গজনবি রাজপরিবার ঘুরি পরিবারকে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদান করে। পরবর্তী সময়ে ঘুরি প্রশাসকগণ নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। ততদিনে গজনবি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ায় তৎকালীন ঘুরি প্রশাসক মুহাম্মাদ ঘুরি গজনবি রাষ্ট্রে হামলা চালিয়ে গজনি নগরী

দখল করে নেন। এরপর থেকে গজনবি-ঘুরি সংঘাত চলতে থাকে এবং ৫৮২ হিজরি সনের (১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দের) মধ্যে ঘুরি পরিবার পুরো গজনবি রাষ্ট্র নিজেদের কর্তৃত্বে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

ভারতবর্ষে জিহাদ পরিচালনা ও ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে ঘুরি রাজপরিবার ছিল গজনবি রাজপরিবারের স্বার্থক উত্তরসূরি। গজনবি পরিবারের পর ঘুরি পরিবার ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করলে ভারতবর্ষের প্রশাসকগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা চালায়। একে কেন্দ্র করে ঘুরি বাহিনীর সঙ্গে ভারতবর্ষের হিন্দুদের বেশ কয়েকবার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৫৯৬ হিজরি সনে (১২০০ খ্রিষ্টাব্দে) হিন্দুরা মুসলমানদের পরাজিত করতে সক্ষম হয় এবং মুসলিম বাহিনীকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূর পর্যন্ত তাড়া করে।

পরের বছরই সুলতান মুহাম্মাদ ঘুরি ভারতবর্ষে চলমান বিদ্রোহের চূড়ান্ত দমনের মনস্থ করে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য রওনা হন। ঘুরি বাহিনীর মোকাবিলায় ভারতবর্ষের হিন্দু রাজাগণ তিন লক্ষ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী সমবেত করে। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠতেই মুসলিম বাহিনী প্রবল বিক্রমে প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং হাজার হাজার হিন্দু সৈন্যকে হত্যা করে। যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী নিরঙ্কুশ জয়লাভ করে।

পরবর্তী সময়ে সুলতান মুহাম্মাদ ঘুরি ভারতবর্ষের প্রশাসনদায়িত্ব তার ক্রীতদাস কুতুবুদ্দিন আইবেকের হাতে সোপর্দ করেন। দক্ষ ও প্রাজ্ঞ শাসক কুতুবুদ্দিন আইবেক ভারতবর্ষে ঘুরি রাষ্ট্রের ভীত দৃঢ়করণে কাজ করেন। তিনি দিল্লীকে ভারতবর্ষের রাজধানী নির্বাচিত করেন এবং সেখানে বিখ্যাত কুতুব মিনার মসজিদ নির্মাণ করেন। কুতুবুদ্দিন আইবেকের দক্ষ নেতৃত্বে ভারতবর্ষে ঘুরি পরিবারের বিজয়াভিযান অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলতে থাকে এবং একপর্যায়ে পুরো ভারতবর্ষ ঘুরি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

যদিও ভারতবর্ষে হিন্দু রাজাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি চূর্ণীকরণ এবং অধিকাংশ অঞ্চল জয়ের কৃতিত্ব গজনবি রাজপরিবারের ছিল; কিন্তু গজনবি শাসকগণ এ অঞ্চলে অবস্থান করতেন না; বরং অভিযান শেষেই গজনিতে ফিরে যেতেন। বিপরীতে ভারতবর্ষে ইসলামি শাসন সুদৃঢ় ও স্থায়ীকরণের কৃতিত্ব ঘুরি পরিবারের প্রাপ্য। তারা দিল্লীকে রাজধানী নির্বাচন করে স্থায়ীভাবে

ভারতবর্ষে অবস্থান করেন। এ কারণে ঘুরি রাষ্ট্রকেই ভারতবর্ষের প্রথম ইসলামি রাষ্ট্র গণ্য করা হয় এবং তাদের মাধ্যমেই ভারতবর্ষের ইসলামি ইতিহাসের সূচনা হয়।

৬০২ হিজরি সনে (১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে) সুলতান মুহাম্মাদ ঘুরির মৃত্যুর পর তার ক্রীতদাস কুতুবুদ্দিন আইবেক নিজেকে হিন্দুস্তানের স্বাধীন সুলতান ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমে ৬০২ হিজরি সন হতে ভারতবর্ষে মামলুক সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। মামলুক সুলতানগণ রাজ্যবিস্তারের পরিবর্তে আপন কর্তৃত্বাধীন অঞ্চল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। ৬৮৬ হিজরি সনে (১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দে) খিলজি পরিবারের হাতে ভারতবর্ষের মামলুক সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

* * *

এ পর্যন্ত আব্বাসি খিলাফত আমলে প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য কিছু রাষ্ট্রের পরিচিতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো। সামনের পরিচ্ছেদগুলোতে একইসময়ে প্রতিষ্ঠিত আরও কয়েকটি রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের ইতিহাস কিছুটা বিশদ আকারে ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে তুলে ধরা হবে। কারণ, স্থান ও কালের পরিধি বিবেচনায় এবং ইসলামি ইতিহাসের পট পরিবর্তনে এসব রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের ভূমিকা ও অবদান স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে।

* * *

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আন্দালুস রাষ্ট্রের ইতিহাস

তরিফ বিন মালিকের ত্যাগ ও বীরত্ব, তারিক বিন যিয়াদের সুদৃঢ় সংকল্প, মুসা বিন নুসায়রের ঈমানি শক্তি, আবদুর রহমান আল-গাফিকির উচ্চাভিলাষ এবং সামাহ বিন মালিক খাওলানির অদম্য সাহসিকতার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে বিজিত হয় আন্দালুস ভূমি। আর ইউসুফ বিন তাশফিনের অটল বিশ্বাস ও অটুট মনোবলের ওপর ভর করে আন্দালুস ভূমিতে ইসলাম লাভ করে নতুন প্রাণ ও প্রাণশক্তি।

কালের পরিক্রমায় আন্দালুসের মুসলমানগণ ঐশ্বর্য ও বিলাসী জীবনের হাতছানিতে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তারা ভুলে যায় নিজেদের পরিচয় এবং শত্রুর পরিচয়; ভুলে যায় যুগে-যুগে কারা তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে এবং কারা তাদের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে একজোট হয়েছে। আর তাই আন্দালুস ও ইসলামের শত্রুরা যখন তরবারিতে শান দিচ্ছিল এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, আন্দালুসের মুসলমানরা তখন মত্ত ছিল সুর ও সুরার নেশায় এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতায়। ফলাফল যা হওয়ার, তা-ই হয়েছিল।

وَأَيْنَ «غَرْنَاطَة» دَارُ الْجِهَادِ وَكَمْ   أَسَدٍ بِهَا وَهُمْ فِي الْحَرْبِ عُقْبَانٌ؟!
وَأَيْنَ جَامِعُهَا الْمَشْهُوْرُ كَمْ تُلِيَتْ   فِيْ كُلِّ وَقْتٍ بِهِ آيٌ وَفُرْقَانٌ؟!
وَعَالِمٍ كَانَ فِيْهِ لِلْجَهُوْلِ هُدًى   مُدَرِّسٍ وَلَهُ فِي الْعِلْمِ تِبْيَانٌ
وَعَابِدٍ خَاضِعٍ لِلّٰهِ مُبْتَهِلٍ   وَالدَّمْعُ مِنْهُ عَلَى الْخَدَّيْنِ طُوْفَانٌ

কোথায় গ্রানাডা, কোথায় লড়াই, কোথায় সংগ্রামের পুণ্যভূমি? কোথায় হাজারো সিংহপুরুষ, বীর মুজাহিদের হুংকারধ্বনি?!

কোথায় গ্রানাডার বিখ্যাত মসজিদ? হাজারো নামাজির তেলাওয়াত-গুঞ্জরন?!

কত আলিম! কত আলোক-প্রদীপ! কোথায় তাদের জ্ঞান-বিতরণ?

কোথায় হারাল আল্লাহপ্রেমে গণ্ডদেশে অশ্রুতুফান! কত আবিদ! কত আল্লাহ-প্রেমিক! কত রোনাজারি আর কত ক্রন্দন!

—আবুল বাকা রুনদি
(৬০১-৬৮৪ হিজরি)
(১২০৪-১২৮৫ খ্রিষ্টাব্দ)

আন্দালুসে মুসলিম জাতি

[৯২-৮৯৭ হিজরি—৭১১-১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ]

নিঃসন্দেহে আন্দালুস ভূখণ্ডে মুসলমানদের ইতিহাস স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আলোচনার দাবি রাখে। কারণ, আন্দালুসে ইসলামি শাসনব্যবস্থা স্থায়ী হয়েছিল ৯২ হিজরি থেকে ৮৯৭ হিজরি সন পর্যন্ত আট শতাব্দী কাল। আর তাই সন্দেহাতীতভাবেই এটি ইসলামি ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও সুদীর্ঘ একটি অধ্যায়। এ অঞ্চলে মুসলমানদের অবস্থান ও কর্ম-অবদান ইতিহাসের এক মহাকাব্যিক অধ্যায়, যার সমাপ্তি ঘটে প্রথমত মুসলমানদের হাতে, তাদেরই উদাসীনতায়; তারপর ইসলামের শত্রুদের সুদীর্ঘ প্রস্তুতি, অব্যাহত চক্রান্ত ও অধীর ধৈর্য প্রচেষ্টায়। আন্দালুসে মুসলিম জাতি খ্যাতি ও মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির অত্যুচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু সুন্নাতুল্লাহ ও আল্লাহ তাআলার শাশ্বত নীতি তো কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না এবং কাল ও স্থানের ভিন্নতায় পরিবর্তিত হয় না।

ইতিপূর্বে আমরা উমাইয়া শাসনামলে পরিচালিত বিজয়াভিযানের আলোচনায় মুসলমানদের আন্দালুস বিজয়ের সময় হতে ১১৪ হিজরি সনে সংঘটিত বালাতুশ শুহাদা যুদ্ধ পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস আলোচনা করেছি। কাজেই আমাদের সামনের আলোচনা এর পরবর্তী সময়কালের বিবরণের মাধ্যমে শুরু হবে।

আন্দালুসের ইসলামি ইতিহাসকে দশটি স্তরে বিভক্ত করা যায়।

- **প্রথম স্তর : ৯২-১৩৮ হিজরি (৭১১-৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দ)।**

এ স্তরের সূচনা হয় ৯২ হিজরি সনে মুসলমানদের আন্দালুস বিজয়ের মাধ্যমে আর শেষ হয় উমাইয়া খিলাফতের পতন এবং ১৩৮ হিজরি সনে উমাইয়া যুবরাজ আবদুর রহমান আদ-দাখিলের আন্দালুসে প্রবেশের মাধ্যমে। এ সময়ে আন্দালুস উমাইয়া খিলাফতের অনুগত ও অধীনস্থ প্রাদেশিক অঞ্চল ছিল। খিলাফতের নিযুক্ত গভর্নর ও প্রশাসকগণ

আন্দালুসে অবস্থান করে কেন্দ্রীয় খিলাফতের নির্দেশনা মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন।

- **দ্বিতীয় স্তর : ১৩৮-২৩৮ হিজরি (৭৫৫-৮৫২ খ্রিষ্টাব্দ)।**

এ স্তরে আন্দালুস তৎকালীন আব্বাসি খিলাফতের কর্তৃত্বমুক্ত স্বতন্ত্র সাম্রাজ্যে পরিণত হয় এবং উন্নতি ও সমৃদ্ধির প্রথম স্তর অতিক্রম করে। এ সময়কালকে প্রতাপ, গৌরব ও সভ্যতা বিনির্মাণের যুগ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সময় আশেপাশের অঞ্চলের ওপর ইসলামি রাষ্ট্র আন্দালুসের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল।

- **তৃতীয় স্তর : ২৩৮-৩০০ হিজরি (৮৫২-৯১৩ খ্রিষ্টাব্দ)।**

এ স্তরে আন্দালুসের ইসলামি রাষ্ট্র প্রথমবারের মতো ক্ষয় ও বিভক্তির শিকার হয়। এর ব্যাপ্তি আবদুর রহমান আন-নাসিরের শাসনামলের সূচনা পর্যন্ত। এ সময়কালকে দুর্বলতা ও অবসন্নতার যুগ হিসেবে গণ্য করা হয়।

- **চতুর্থ স্তর : ৩০০-৩৬৮ হিজরি (৯১৩-৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ)।**

এ স্তরে আন্দালুসের ইসলামি রাষ্ট্র পুনরায় সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি অর্জন করে। এ আমলেই তৎকালীন আব্বাসি খিলাফতের দুর্বলতা ও ক্ষয়িষ্ণুতা বিবেচনা করে আন্দালুসে স্বতন্ত্র ইসলামি খিলাফত ঘোষণা করা হয় এবং আন্দালুসের শাসকগণ সুলতান বা গভর্নরের পরিবর্তে (উমাইয়া) খলিফা পরিচিতি ধারণ করেন।

- **পঞ্চম স্তর : ৩৬৮-৩৯৯ হিজরি (৯৭৮-১০০৯ খ্রিষ্টাব্দ)।**

এ স্তরে আন্দালুসের উমাইয়া খিলাফত হাজিব বা রাজপ্রহরীর প্রভাব নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। 'খলিফা' সম্মানসূচক পদবিতে পরিণত হয়, সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব চলে যায় হাজিব পদধারী আমিরিয়া পরিবারের হাতে। এ কারণে একে আমিরিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্তরও বলা হয়।

- **ষষ্ঠ স্তর : ৩৯৯-৪২২ হিজরি (১০০৯-১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ)।**

এ স্তরে দ্বিতীয়বারের মতো আন্দালুস সাম্রাজ্য ক্ষয় ও বিভক্তির শিকার হয়। এ স্তরেই আন্দালুসে উমাইয়া শাসনের চূড়ান্ত পতন ঘটে, সমাপ্তি ঘটে আন্দালুসকেন্দ্রিক খিলাফতব্যবস্থারও।

- **সপ্তম স্তর : ৪২২-৪৮৪ হিজরি (১০৩১-১০৯১ খ্রিষ্টাব্দ)।**

এ স্তরে আন্দালুস ভূমি অঞ্চলকেন্দ্রিক খণ্ড খণ্ড বহু রাষ্ট্রে পরিণত হয়। একে তাইফা (বিভক্ত) শাসকদের যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

- **অষ্টম স্তর : ৪৮৪-৫৪১ হিজরি (১০৯১-১১৪৭ খ্রিষ্টাব্দ)।**

এ স্তরে আন্দালুস সাগরের ওপারের মাগরিবকেন্দ্রিক মুরাবিতি সাম্রাজ্যের অধীনে পরিচালিত হয়।

- **নবম স্তর : ৫৪১-৬২০ হিজরি (১১৪৭-১২২৪ খ্রিষ্টাব্দ)।**

এ স্তরে আন্দালুস মাগরিবকেন্দ্রিক মুওয়াহহিদি সাম্রাজ্যের অধীনে পরিচালিত হয়।

- **দশম স্তর : ৬২০-৮৯৭ হিজরি (১২২৪-১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ)।**

বনু আহমার (বনু নাসর) পরিবারের শাসন স্তর। এ স্তরে আন্দালুসের ইসলামি ভূখণ্ড গ্রানাডা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আর এ স্তরেই শুরু হয় আন্দালুসে ইসলামের চূড়ান্ত পতনের প্রথম ধাপ।

উমাইয়া খিলাফতের অনুগত শাসনব্যবস্থার কাল

[৯২-১৩৮ হিজরি—৭১১-৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দ]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ স্তরের ব্যাপ্তি ৯২ হিজরি সনে মুসলমানদের আন্দালুস উপদ্বীপ বিজয়ের সময়কাল হতে ১৩৮ হিজরি সনে স্বতন্ত্র উমাইয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত। এই ছেচল্লিশ বছর আন্দালুস তৎকালীন কেন্দ্রীয় উমাইয়া খিলাফতের অনুগত ও অধীনস্থ প্রাদেশিক অঞ্চল ছিল।

এই সংক্ষিপ্ত সময়কালে আন্দালুসে মোট তেইশজন গভর্নর দায়িত্ব পালন করেন। বরং বলা ভালো, একুশজন গভর্নর দায়িত্ব পালন করেন, যাদের মধ্যে দুজন দুই মেয়াদে কাজ করেন। অর্থাৎ গড়ে একেকজন গভর্নরের শাসনকাল ছিল মাত্র দু-বছর। এ তথ্য দ্বারাই অনুমান করা যায় যে, এই স্তরটি ছিল যথেষ্ট অস্থিরতাপূর্ণ এবং আন্দালুস এ সময় একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছিল। গভর্নরদের কেউ কেউ আল্লাহর দ্বীনের প্রচার-প্রসার করতে গিয়ে দ্বীনের তরে জীবনদান করেছেন, আবার কেউ কেউ বিভিন্ন ধরনের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ-অভ্যুত্থান ইত্যাদির শিকার হয়ে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন বা নিহত হয়েছেন। নিম্নে এ সময়কালের গভর্নরদের নাম ও শাসনকাল উল্লেখ করা হলো—

০১	তারিক বিন যিয়াদ	:	৯২-৯৩ হি. (৭১১-৭১২ খ্রি.)
০২	মুসা বিন নুসায়র[১৫]	:	৯৩-৯৫ হি. (৭১২-৭১৪ খ্রি.)

[১৫]. খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের নির্দেশে তিনি তারিক বিন যিয়াদকে সঙ্গে নিয়ে তৎকালীন উমাইয়া খিলাফতের রাজধানী দামেশকে ফিরে যান।

০৩	আবদুল আজিজ বিন মুসা বিন নুসায়র (নিহত)	:	৯৫-৯৭ হি. (৭১৪-৭১৬ খ্রি.)
০৪	আইয়ুব বিন হাবিব লাখমি	:	৯৭-৯৭ হি. (৭১৬-৭১৬ খ্রি.)
০৫	হুর বিন আবদুর রহমান সাকাফি	:	৯৭-১০০ হি. (৭১৬-৭১৯ খ্রি.)
০৬	সামাহ বিন মালিক খাওলানি[১৬]	:	১০০-১০২ হি. (৭১৯-৭২১ খ্রি.)
০৭ (ক)	আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ আল-গাফিকি	:	১০২-১০৩ হি. (৭২১-৭২১ খ্রি.)
০৮	আমবাসা বিন সুহাইম কালবি	:	১০৩-১০৭ হি. (৭২১-৭২৫ খ্রি.)
০৯	উযরা বিন আবদুল্লাহ ফিহরি	:	১০৭-১০৭ হি. (৭২৫-৭২৬ খ্রি.)
১০	ইয়াহইয়া বিন সালামা কালবি	:	১০৭-১১০ হি. (৭২৬-৭২৮ খ্রি.)
১১	হুযায়ফা ইবনুল আহওয়াস কিসি	:	১১০-১১০ হি. (৭২৮-৭২৮ খ্রি.)
১২	উসমান বিন আবি নাসআ হায়সামি	:	১১০-১১১ হি. (৭২৮-৭২৯ খ্রি.)
১৩	হায়সাম বিন উবায়দ কিলাবি	:	১১১-১১২ হি. (৭২৯-৭৩০ খ্রি.)
১৪	মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আশজায়ি	:	১১২-১১২ হি. (৭৩০-৭৩০ খ্রি.)
০৭ (খ)	আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ আল-গাফিকি[১৭]	:	১১২-১১৪ হি. (৭৩০-৭৩২ খ্রি.)
১৫ (ক)	আবদুল মালিক বিন কাতান ফিহরি	:	১১৪-১১৬ হি. (৭৩২-৭৩৪ খ্রি.)

---

[১৬]. তুলুজ (Toulouse)-এর যুদ্ধক্ষেত্রে শাহাদাত বরণ করেন।

[১৭]. পয়টিয়ার্স (Poitiers)-এ বালাতুশ শুহাদার যুদ্ধে শহিদ হন।

১৬	উকবা ইবনুল হাজ্জাজ সালুলি	:	১১৬-১২৩ হি. (৭৩৪-৭৪১ খ্রি.)
১৫ (খ)	আবদুল মালিক বিন কাতান ফিহরি (নিহত)	:	১২৩-১২৩ হি. (৭৪১-৭৪১ খ্রি.)
১৭	বালজ বিন বিশর কুশায়রি	:	১২৩-১২৪ হি. (৭৪১-৭৪২ খ্রি.)
১৮	ছালাবা বিন সালামা আমিলি	:	১২৪-১২৫ হি. (৭৪২-৭৪৩ খ্রি.)
১৯	আবুল খাত্তার হুসাম বিন যারার কালবি	:	১২৫-১২৭ হি. (৭৪৩-৭৪৫ খ্রি.)
২০	ছাওয়াবা বিন সালামা জুযামি	:	১২৭-১২৯ হি. (৭৪৫-৭৪৬ খ্রি.)
২১	ইউসুফ বিন আবদুর রহমান ফিহরি[১৮]	:	১২৯-১৩৮ হি. (৭৪৬-৭৫৬ খ্রি.)

এই আমলেই বিভিন্ন কারণে প্রথমে আন্দালুস বিজেতা আরব অভিযাত্রী ও মাগরিবি বার্বার (আমাজিঘ) যোদ্ধাদের মাঝে বিরোধ ও বিভেদের প্রাথমিক লক্ষণসমূহ প্রকাশ পেতে থাকে এবং পরবর্তী সময়ে তা আন্দালুসের জনগণের মাঝেও সংক্রমিত হতে থাকে। উল্লেখযোগ্য দুটি কার্যকারণ হলো—

- নেতৃত্ব ও দায়িত্ব প্রদানে আরবদেরকে প্রাধান্যদান।
- বার্বার জনগোষ্ঠীর মাঝে খারিজি মতাদর্শের বিস্তার।

খারিজিরা খিলাফতের প্রাণকেন্দ্র দামেশক ও ইসলামি প্রাচ্য অঞ্চলে তাদের মতাদর্শ প্রচার করতে গিয়ে উমাইয়া খিলাফতের প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হওয়ায় পালিয়ে মাগরিবে আস্তানা গেড়েছিল এবং বার্বার গোত্রসমূহের মাঝে নিজেদের মতাদর্শ প্রচার করছিল। তারা বার্বারদেরকে আরবদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে সাম্প্রদায়িক চেতনা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। খারিজি মতাদর্শ গ্রহণকারী মায়সারা নামক জনৈক বার্বার সর্দার আরবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দেয় এবং একে কেন্দ্র করে ১২২

---

[১৮]. তার প্রশাসন আমল ছিল গোলযোগ ও অস্থিরতায় পূর্ণ।

হিজরি (৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে) তাঞ্জিয়ারে আরব ও বার্বার জনগোষ্ঠীর মাঝে তুমুল লড়াই সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে বহু আরব বীর যোদ্ধা ও অভিজাত ব্যক্তি নিহত হয়েছিল বলে ইতিহাসে তা 'সম্ভ্রান্তদের (পতন) ট্রাজেডি' নামে পরিচিতি লাভ করে।

দামেশকে খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালিকের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বার্বারদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য কুলসুম বিন ইয়ায কুশায়রির নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মাগরিবে প্রেরণ করেন। বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য ছিল শাম অঞ্চলের (কায়স গোত্রীয়) আরব। মিশরের কিছু সৈন্যও বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল।

স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা হয়েছিল যে, এই বিশাল বাহিনীর সহায়তায় মাগরিবের পরাজিত আরবরা এবার অবধারিতভাবেই বার্বারদের পরাজিত করবে। কিন্তু বাস্তবে ঘটে সম্পূর্ণ বিপরীত। এর কারণ ছিল, উত্তর আফ্রিকায় পূর্ব থেকেই অবস্থানকারী আরবগণ ছিল হিজাযের অধিবাসী; আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে মদিনার অধিবাসী। অপরদিকে প্রতিশোধ অভিযানে আগত অধিকাংশ আরব সৈন্য ছিল শাম অঞ্চলের অধিবাসী। আর ৬৩ হিজরি সনে (৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দে) ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়ার আমলে সংঘটিত হাররার যুদ্ধ ও মদিনায় সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই হিজায ও শামের আরবদের মাঝে প্রচণ্ড বিরোধ ও শত্রুতা চলে আসছিল। বার্বারদের বিদ্রোহ মোকাবিলায় যদিও উভয় শ্রেণির আরবগণ বাহ্যিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল; কিন্তু অন্তর্জগতে বিরোধ বিদ্যমান থাকলে বাহ্যিক ঐক্যে কী আসে যায়! আর তাই সেবু (Sebou) উপত্যকায় সংঘটিত যুদ্ধে আরব বাহিনী বার্বারদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। আরব সেনাপতি কুলসুম বিন ইয়ায যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হন। কুলসুমের চাচাতো ভাই বালজ বিন বিশর জীবিত সাত হাজার সৈন্যকে সঙ্গে নিয়ে কোনোমতে আত্মরক্ষা করে সিউটায় আশ্রয় নিলে বার্বাররা তাদেরকে অবরোধ করে রাখে।

দীর্ঘ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর পরিস্থিতি কঠিন হয়ে দাঁড়ালে সেনাপতি বালজ বিন বিশর আন্দালুসের মুসলিম প্রশাসনের কাছে সাহায্যবার্তা প্রেরণ করেন এবং প্রণালি পাড়ি দিয়ে আন্দালুসে আশ্রয় নেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু আন্দালুসের হিজাযি প্রশাসন শামের আরবদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে।

কিছুদিন না যেতেই আন্দালুসেও পট পরিবর্তন ঘটে। আন্দালুসে বসবাসকারী বার্বাররা যখন মাগরিবে স্বজাতির বিজয় সম্পর্কে অবগত হয়, তখন তারা আন্দালুসে আরব নেতৃত্বের পতন ঘটাতে প্রচণ্ড বিদ্রোহ শুরু করে। বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হয়ে আন্দালুসের প্রশাসক আবদুল মালিক বিন কাতান ফিহরি অনুভব করেন যে, এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে হলে মাগরিবে অবরুদ্ধ শামের বাহিনীর শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত কোনো উপায় নেই। আবদুল মালিক বালজ বিন বিশরের কাছে বার্তা পাঠিয়ে তার বাহিনীকে এই শর্তে আন্দালুসে আগমনের অনুমতি প্রদান করেন যে, তারা আন্দালুসে পৌঁছে বিদ্রোহী বার্বারদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং বিজয় সুনিশ্চিত হয়ে গেলে আন্দালুস ত্যাগ করতে বাধ্য থাকবে। বালজ বিন বিশর এ শর্তেই আন্দালুসে প্রবেশ করতে সম্মত হন। আবদুল মালিক শামের বাহিনীর শর্তপূরণের নিশ্চয়তাস্বরূপ তাদের কয়েকজন লোককে জামিন হিসেবে আটকে রাখেন।

উভয় পক্ষ মিলে সম্মিলিত অভিযান পরিচালনা করে আন্দালুসের বার্বারদের বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়। পরাজিত বার্বার মুসলমানরা আন্দালুস ভূমি ত্যাগ করে আফ্রিকায় ফিরে যেতে শুরু করে। এভাবে পারস্পরিক বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার কারণে মুসলমানরা হারায় আন্দালুস ভূমির বড় একটি অংশ। শত্রুর আগ্রাসন নয়; পারস্পরিক বিভেদই ছিল এর জন্য দায়ী।[১৯]

যুদ্ধ শেষে আন্দালুসের প্রশাসক আবদুল মালিক বালজ বিন বিশরকে পূর্বের শর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আন্দালুস ছেড়ে মাগরিবে চলে যেতে বলেন। কিন্তু বালজের নেতৃত্বাধীন শামের বাহিনী আন্দালুস ত্যাগে অস্বীকৃতি জানায়। যেহেতু তাদের শক্তির পাল্লা ভারী ছিল, তাই তারা

---

১৯. পারস্পরিক বিদ্বেষ ও অপরিণামদর্শিতাই ছিল এর প্রধান কারণ। যদি এই অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা না ঘটত এবং হাজার হাজার বার্বার মুসলমান আন্দালুস ভূখণ্ড ত্যাগ না করত, তাহলে তাদের মাধ্যমে আন্দালুসের প্রতিটি প্রান্তে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতো। বার্বাররা আন্দালুস ত্যাগ করায় ট্যাজু নদীর উত্তরের সকল অঞ্চল বলতে গেলে পুরোপুরি মুসলিমশূন্য হয়ে যায়। ফলে খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই এ সকল অঞ্চল পুরোপুরি অরক্ষিত হয়ে পড়ে এবং উত্তরের খ্রিষ্টানরা নিজেদের ইচ্ছেমতো এ অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যেই খ্রিষ্টানরা উত্তর আন্দালুসের বিরাট অংশ অধিকার করে নেয়। [মূল গ্রন্থের টীকা]

গভর্নর আবদুল মালিককে অপসারণ করে এবং নিজেদের নেতা বালজ বিন বিশরকে গভর্নর পদে বসায়। এরপর শামের সৈন্যরা আবদুল মালিক বিন কাতানের প্রতি অভিযোগ তোলে যে, তিনি তার কাছে জামিনে থাকা জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন। শামের সৈন্যরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আবদুল মালিককে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানায়। বালজ বিন বিশর তাদেরকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলে তারা তাকে হুমকি প্রদান করে এবং বলে যে, আপনি নিজে মুযার বংশীয় হওয়ায় আরেক মুযার বংশীয় আবদুল মালিকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছেন। নিরুপায় হয়ে বালজ আবদুল মালিককে তাদের হাতে তুলে দেন। এরপর শামের সৈন্যরা বয়োবৃদ্ধ আবদুল মালিক বিন কাতানকে হত্যা করে। নিজেদের প্রশাসক নিহত হওয়ায় এবার বালাদি[২০] আরবরা বিদ্রোহ শুরু করে। ফলে আন্দালুস ভূমিতে শুরু হয় ইয়ামেনিদের সঙ্গে শামের আরবদের সংঘাত।

আন্দালুসের এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে খিলাফতের রাজধানী দামেশক হতে ১২৫ হিজরি সনে (৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে) আবুল খাত্তার হুসাম বিন যারার কালবিকে নতুন প্রশাসক হিসেবে আন্দালুসে প্রেরণ করা হয়।

আবুল খাত্তার আন্দালুসে পৌঁছেই পরিস্থিতি শান্তকরণে কাজ শুরু করেন। তিনি প্রথমে শামের আরবদের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে আন্দালুসের বিভিন্ন এলাকায় বসতি স্থাপনের নির্দেশ দেন। শামের যেসব সৈন্য ছিল দামেশকের অধিবাসী, তাদেরকে এলভিরা (Elvira) অঞ্চলে প্রেরণ করা হয় এবং এলভিরা অঞ্চলের নামকরণ করা হয় দামেশক। যেসব সৈন্য ছিল হিমসের অধিবাসী, তাদেরকে সেভিল (Seville) অঞ্চলে প্রেরণ করা হয় এবং সেভিলের নামকরণ করা হয় হিমস। কিননাসরিনের (Qinnasrin) অধিবাসী সৈন্যদেরকে জাইয়ান (Jaén) অঞ্চলে পাঠানো হয় এবং জাইয়ান অঞ্চলের নামকরণ করা হয় কিননাসরিন। জর্ডানের অধিবাসী সৈন্যদেরকে রাইয়া (Rayya) অঞ্চলে বসতি স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং রাইয়া

---

২০. পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে—যেসব আরব আন্দালুসের প্রথম বিজয়াভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল এবং দক্ষিণ আন্দালুসে আবাস স্থাপন করেছিল, পরবর্তীকালে আন্দালুসে হিজরতকারী অন্যান্য আরব থেকে পার্থক্যকরণের জন্য তাদেরকে বালাদি (স্থানীয়) বলা হতো। বালাদি আরবদের অধিকাংশই ছিল ইয়ামানের।

অঞ্চলের নামকরণ করা হয় জর্ডান। ফিলিস্তিনের অধিবাসী সৈন্যদেরকে সিডোনিয়া (Sidonia) অঞ্চলে বসতি স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং সিডোনিয়ার নামকরণ করা হয় ফিলিস্তিন। আর মিশরের অধিবাসী সৈন্যদেরকে আন্দালুসের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে টাডমির (Tudmir) অঞ্চলে বসতি স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং টাডমির অঞ্চলের নামকরণ করা হয় মিশর।

এই অভিনব নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নতুন প্রশাসক আবুল খাত্তার আন্দালুসে বসবাসরত আরব, বার্বার জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় অধিবাসীদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ানো শামের সৈন্যদেরকে সুবিন্যস্ত পদ্ধতিতে বিভক্ত করে ফেলতে সক্ষম হন। এসব সৈন্যরাই পরবর্তী সময়ে আন্দালুসের সামরিক ব্যবস্থাপনার মূল উপাদানে পরিণত হয়। জিম্মি ও কৃষকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয় এবং শর্তারোপ করা হয় যে, প্রশাসন যখন তলব করবে, তখন তারা প্রশাসনকে চাহিদা মোতাবেক সৈন্য সরবরাহ করবে।

কিন্তু এই প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতি খুব বেশি দিন কার্যকর থাকেনি। কিছুদিন না যেতেই মুযারি ও ইয়ামেনি আরবদের মাঝে জাহিলি সাম্প্রদায়িক চেতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। শামের আরবদের মাঝে সামিল বিন হাতিম নামক চরম সাম্প্রদায়িক এক মুযারি নেতা আত্মপ্রকাশ করে এবং তাদের নেতা বনে যায়। বিপরীতে আন্দালুসের প্রশাসক আবুল খাত্তার ছিলেন চরম সংকীর্ণমনা ইয়ামেনি।

এরইমাঝে তুচ্ছ একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়। মুযার গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে এক ইয়ামেনির বিবাদ সৃষ্টি হলে উভয়ে প্রশাসক আবুল খাত্তারের দ্বারস্থ হয়। আবুল খাত্তার ইয়ামেনির পক্ষে ফয়সালা করলে মুযারিরা একে অবিচার দাবি করে সামিলের কাছে অভিযোগ করে। সামিল এ বিষয়ে প্রতিকারের উদ্দেশ্যে আবুল খাত্তারের কাছে গেলে আবুল খাত্তার তাকে অপমান তো করেনই; মাথায় আঘাত করে তার পাগড়ি স্থানচ্যুত করে ফেলেন। অপমানিত সামিল ফিরে আসার সময় জনৈক দ্বাররক্ষী তাকে বলে, 'আবুল জাওশান, আপনার পাগড়ি ঠিক করে নিন।' উত্তরে তিনি বলেন, 'আমার পক্ষে যদি আমার কওম থাকে, তবে তারাই আমার পাগড়ি ঠিক করে দেবে।' সামিলের এ উক্তি ছিল পুনরায় সাম্প্রদায়িক সংঘাত শুরু হওয়ার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত।

১৩০ হিজরিতে (৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দে) কর্ডোভা (গোয়াডেল কুইভার) নদীর তীরে শাকুন্‌দা এলাকায় সামিলের নেতৃত্বাধীন মুযার গোত্র এবং আবুল খাত্তারের নেতৃত্বাধীন ইয়ামেনিদের মাঝে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের প্রথমদিকে মুযারিদের পাল্লা ভারী থাকলেও পরে ইয়ামেনিরা প্রবল বেগে হামলা চালিয়ে বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়। পরাজিত সামিল তার আবাসস্থল জারাগোজায় আশ্রয় নেন। জারাগোজা ছিল প্রাচীরবেষ্টিত সুরক্ষিত এক নগরী। বিজয়ী আবুল খাত্তার তার বাহিনী নিয়ে জারাগোজা পৌঁছে নগরী অবরোধ করেন।

এ সময় অবরুদ্ধ সামিলকে রক্ষা করতে অন্যান্য এলাকায় বসবাসকারী মুযারিরা বেরিয়ে আসে। বিভিন্ন এলাকা থেকে অগ্রসর হওয়া মুযারিরা পথিমধ্যে পরস্পর মিলিত হতে থাকে এবং বিরাট সংখ্যায় পরিণত হয়। আন্দালুসে বসবাসরত বনু উমাইয়ার মাওয়ালিদের (উমাইয়া রাজপরিবার কর্তৃক মুক্ত ক্রীতদাসদের) প্রায় তিনশ সদস্যের একটি দল মুযারিদের সঙ্গে যোগ দেয়। অবশ্য তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিবদমান কোনো পক্ষের হয়ে যুদ্ধ করতে নয়; বরং তারা প্রেরিত হয়েছিল নিজেদের একটি লক্ষ্য বাস্তবায়নে উভয় পক্ষের সঙ্গে দর কষাকষির উদ্দেশ্যে। মাওয়ালিদের দলটি প্রথমে অবরুদ্ধ সামিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার সমর্থন লাভের চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে ইয়ামেনিরা অবরুদ্ধ সামিলের সহায়তায় প্রচুর সংখ্যক মুযারিদের আগমনের সংবাদে ভীত হয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করে কর্ডোভায় ফিরে যায়। মুক্ত সামিল বেরিয়ে এসে তাকে উদ্ধারে আগত মুযারিদের স্বাগত জানান এবং তাদেরকে বিভিন্ন উপঢৌকন প্রদান করেন। এরপর তিনি সকলকে সঙ্গে নিয়ে কর্ডোভা দখলের উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথিমধ্যে মাওয়ালি প্রতিনিধিদল নিজেদের প্রস্তাব সামিলের কাছে পেশ করলে তিনি তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। সামিলের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে মাওয়ালিরা এবার ইয়ামেনিদের শরণাপন্ন হয় আর ইয়ামেনিরা সাদরে তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয়।

উমাইয়া প্রতিনিধিদলের প্রস্তাবটি কী ছিল, তা ভালোভাবে বুঝতে হলে আমাদেরকে একটু পেছনে ফিরে যেতে হবে। বনু উমাইয়ার প্রায় শতাব্দীব্যাপী সাম্রাজ্যকে চূর্ণবিচূর্ণ করে যখন আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আব্বাসিরা নির্বিচারে উমাইয়া রাজপরিবারের সদস্যদের হত্যা করতে থাকে। এ সময় উমাইয়া রাজপরিবারের হাতেগোনা যে কজন

সদস্য গণহত্যা থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল, তাদের একজন হলেন 'আবদুর রহমান আদ-দাখিল'[২১] নামে খ্যাত আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া বিন হিশাম বিন আবদুল মালিক। আবদুর রহমান বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আব্বাসি ঘাতকদের এড়াতে সক্ষম হন। তিনি শাম, মিশর, লিবিয়া ও কায়রোয়ান পাড়ি দিয়ে মাগরিবে তার মাতুলকুলের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তার মা ছিলেন বার্বার শাখাগোত্র নাফযাওয়া (Nefzaoua) বংশোদ্ভূত। এ সময় যুবরাজ আবদুর রহমানের বয়স ছিল বিশেরও কম।

মাগরিবে পৌঁছে আবদুর রহমান সেখানে বসবাসকারী উমাইয়া মাওয়ালিদের তাদের প্রতি বনু উমাইয়ার অনুগ্রহদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং তাকে আন্দালুস প্রবেশে সহায়তা করতে আহ্বান জানান। আবদুর রহমান তাদেরকে জানান যে, তিনি আন্দালুস ভূমিতে তার পিতৃপুরুষের গৌরব ও কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা ফিরিয়ে আনতে চান। এসব মাওয়ালি একদিকে যেমন বনু উমাইয়ার প্রতি কৃতার্থ ছিল, অপরদিকে যথেষ্ট মেধা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞারও অধিকারী ছিল। তারা আন্দালুসে বিরাজমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতিকে নিজেদের পক্ষে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেয় এবং বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে কোনো এক পক্ষের সমর্থন লাভের প্রত্যাশায় অগ্রসর হয়। বাস্তবেও ইয়ামেনিরা তাদের প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করে নেয়।

ইয়ামেনিদের সাড়া পেয়ে মাওয়ালিরা অত্যন্ত আনন্দিত হয় এবং দ্রুত মাগরিবে অবস্থানরত আবদুর রহমানের কাছে বার্তা পাঠিয়ে সুসংবাদ জানিয়ে দেয়। বিস্তারিত অবগত হওয়ার পর আবদুর রহমান জাবালে তারিক প্রণালি অতিক্রম করে আন্দালুসে উমাইয়া মাওয়ালিদের ঘাঁটি তুর্‌শে (Torrox) অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকেই তার পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করেন। আন্দালুসের তৎকালীন প্রশাসক ইউসুফ বিন আবদুর রহমান ফিহরি ও তার সহযোগী সামিল তখন আন্দালুসের উত্তরাঞ্চলে সৃষ্ট গোলযোগ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। তাদের অনুপস্থিতির সুযোগ

---

২১. 'আদ-দাখিল' শব্দের অর্থ 'প্রবেশকারী'। যেহেতু আবদুর রহমান আদ-দাখিলই ছিলেন বনু উমাইয়ার প্রথম ব্যক্তি, যিনি প্রশাসক হিসেবে কর্ডোভায় প্রবেশ করেছেন, তাই তার উপাধি হয় 'আদ-দাখিল'। দেখুন—ইবনে খালদুন, *তারীখে ইবনে খালদুন*, ৪/১২২ ও মাক্কারি, *নাফহুত তীব*, ১/৩২৯।

কাজে লাগিয়ে আবদুর রহমান তার পক্ষের লোকদের সমবেত করতে সক্ষম হন এবং তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে কর্ডোভা অভিমুখে রওনা হন। সংবাদ পেয়ে গভর্নর ইউসুফ ও সামিল দ্রুত কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তন করেন।

১৩৮ হিজরির আরাফার দিন (৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে) গোয়াডেল কুইভার নদীর দুই তীরে মাসারা নামক এলাকায় দুই বাহিনী সমবেত হয়।

আবদুর রহমান অনর্থক রক্তপাত রোধে প্রথমে প্রতিপক্ষের কাছে শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রস্তাব পেশ করেন এবং সমঝোতা আলোচনায় বসার জন্য তাকে নদী পার হওয়ার অনুমতিদানের অনুরোধ জানান। প্রশাসক ইউসুফ আবদুর রহমানের কৌশল উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন এবং তাকে নদী পার হওয়ার সুযোগ দেন। নদী পার হয়েই আবদুর রহমান স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং প্রতিপক্ষকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, আন্দালুস বিজেতা উমাইয়া খলিফা পরিবারের বংশধর হিসেবে তিনিই এ অঞ্চলের প্রশাসন দায়িত্ব লাভের বৈধ হকদার। সুতরাং তাকে আন্দালুসের প্রশাসক হিসেবে মেনে নেওয়া ব্যতিরেকে ভিন্ন কোনো দাবির ওপর কোনো সমঝোতা বা চুক্তি হবে না।

আবদুর রহমানের এ ঘোষণা নতুন যুদ্ধ শুরুর বার্তা ছিল। একে কেন্দ্র করেই মাসারা প্রান্তরে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়।

মাসারা প্রান্তরের নিষ্পত্তিমূলক এ যুদ্ধে আবদুর রহমানের কুদরতপ্রদত্ত প্রতিভা ও দ্রুত চিন্তাগুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আবদুর রহমান জানতে পারেন—তার পক্ষে যুদ্ধ করতে সমবেত হওয়া সৈন্যরা বলাবলি করছে যে, আবদুর রহমান একজন অল্পবয়স্ক যুবক। সে ইতিপূর্বে কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। যুদ্ধ শুরু হলে সে ভীত হয়ে পড়বে এবং তার তাজাদম দ্রুতগামী ঘোড়ার সহায়তায় ঠিকই আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে। আর আমরা ময়দানে থেকে ইউসুফের বাহিনীর নির্মমতার শিকার হব।

আবদুর রহমান কথার পরিবর্তে কাজের মাধ্যমে উত্তরদানের মনস্থ করেন। তিনি তার দ্রুতগামী মূল্যবান ঘোড়াটিকে রেখে জনৈক সৈন্যের অতি দুর্বল একটি ঘোড়া বেছে নেন এবং তাতে আরোহণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা হন। তিনি যেন নীরবে সবাইকে জানিয়ে দেন যে, তিনিই উৎকৃষ্ট ঘোড়ার লাগামধারী প্রথম ব্যক্তি নন। আবদুর রহমানের উপস্থিত সিদ্ধান্ত সকলকে

প্রভাবিত করে এবং সকলে অটল-অবিচল থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আবদুর রহমানের বাহিনীই জয়লাভ করে। বিজয়ী আবদুর রহমান আন্দালুসের রাজধানী কর্ডোভায় প্রবেশ করেন আর আন্দালুসে সূচিত হয় মুসলমানদের এক নতুন অধ্যায়—উমাইয়া রাষ্ট্রের অধ্যায়।

খিলাফতের কর্তৃত্বমুক্ত স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থার কাল

[১৩৮-২৩৮ হিজরি—৭৫৫-৮৫২ খ্রিষ্টাব্দ]

১. আবদুর রহমান আদ-দাখিল ও আন্দালুসে উমাইয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

[১৩৮-১৭২ হিজরি—৭৫৫-৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দ]

আবদুর রহমান আদ-দাখিলের জন্ম ১১৩ হিজরি সনে (৭৩১ খ্রিষ্টাব্দে) তৎকালীন উমাইয়া খিলাফতের রাজধানী দামেশকে। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি আন্দালুসের আমির ও প্রশাসক পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আব্বাসিদের পক্ষ থেকে বনু উমাইয়া প্রচণ্ড নিপীড়নের শিকার হলেও আবদুর রহমান আদ-দাখিল ইসলামি বিশ্বের একক খিলাফতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাই আন্দালুসের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর পরবর্তী কিছুদিন তিনি আব্বাসি খলিফার নামেই খুতবা পাঠ করতেন। কিন্তু পরে আব্বাসি খলিফার পক্ষ থেকে তাকে হত্যা করার প্রচেষ্টা চালানো হলে তিনি আব্বাসি খলিফার নামে খুতবাপাঠ বন্ধ করে দেন এবং আব্বাসি সাম্রাজ্য থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। তবে এরপরও তিনি নিজেকে খলিফা দাবি করার পরিবর্তে আমির (প্রশাসক) পরিচয় ধারণ করেই আন্দালুস শাসন করে যান।

অভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহের সমাধান

আন্দালুসে নবাগত আবদুর রহমান দায়িত্ব গ্রহণের পরই আন্দালুসের ভেতরের-বাইরের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে মনোযোগী হন। যেহেতু আবদুর রহমানের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইয়ামেনি আরবদের উল্লেখযোগ্য সহায়তায়, তাই ইয়ামেনিরা মনে করত, আন্দালুস এখন তাদেরই! তারা জনগণের সঙ্গে যথেচ্ছ আচরণ করতে পারবে। ইয়ামেনিরা পূর্বের ন্যায় নিজেদের বিশৃঙ্খল নীতির ওপর চলতে থাকে,

জনগণের জানমাল নিয়ে স্বেচ্ছাচারী আচরণ করতে থাকে এবং সাম্প্রদায়িক চেতনা উসকে দিতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ করেই তারা উপলব্ধি করে যে, আবদুর রহমান এসব সাম্প্রদায়িক চেতনাকে স্বীকৃতি বা প্রশ্রয় দিচ্ছেন না। তিনি চাচ্ছেন আন্দালুস ভূমিতে দলমতবংশ নির্বিশেষে একটি ঐক্য ও সম্প্রীতিপূর্ণ ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে।

আবদুর রহমানের এই সাম্য নীতি ইয়ামেনিদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তারা একে নিজেদের অধিকারহরণ বিবেচনা করে আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে একের পর এক বিদ্রোহ করতে থাকে। আবদুর রহমান উমাইয়া মাওয়ালিদের সহায়তায় প্রতিটি বিদ্রোহের মোকাবিলা করেন এবং সফলভাবে দমন করেন। বিদ্রোহ দমনে আবদুর রহমানের নীতি ছিল বিদ্রোহীদের সংঘটিত হওয়ার সুযোগ না দিয়ে শুরুতেই তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া। মূলত এটি ছিল তার পূর্বতন উমাইয়া খলিফাগণেরই গৃহীত নীতি। উমাইয়া খলিফাগণ তাদের প্রতিপক্ষকে হুমকি হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বেই সমূলে উৎখাত করতেন।

উল্লেখ্য, শৈশব ও কৈশোরে আবদুর রহমান প্রতিপালিত হয়েছিলেন তার পিতামহ খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালিকের রাজগৃহে। হিশামের শাসনামল ছিল উমাইয়া সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি ও উন্নতির যুগ। তার শাসনামলে রাজপ্রাসাদ ছিল সকল কৌশল ও শাস্ত্রের উন্নত শিক্ষাঙ্গন। এই সমৃদ্ধ শিক্ষাঙ্গনেই শিক্ষাগ্রহণ করেছেন আবদুর রহমান আদ-দাখিল।

আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিদ্রোহ প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল-মানসুরের সমর্থনে পরিচালিত একটি বিদ্রোহ প্রচেষ্টা। ১৪৬ হিজরি সনে (৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে) সংঘটিত এ বিদ্রোহ আলা বিন মুগিস আল-হাযরামির নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এ সময় বিদ্রোহীরা আবদুর রহমানকে প্রায় দু-মাস কারামোনা নগরীতে অবরুদ্ধ করে রাখে। কিন্তু আবদুর রহমান এই বিদ্রোহও সফলতার সঙ্গে দমন করেন। অবরুদ্ধ অবস্থায় আবদুর রহমান ও তার বাহিনীর অবস্থা যখন সঙ্গিন হয়ে পড়েছিল, তখন তিনি তার সৈন্যদের বলেন, 'তোমরা সকলে আবারও ফিরে আসার আশা ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে বের হয়ে এসো।' আবদুর রহমানের নির্দেশে সকলে একযোগে বেরিয়ে এসে অবরোধকারীদের ওপর আক্রমণ চালায় এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে। আবদুর রহমান আলা বিন মুগিস

আল-হাযরামির কর্তিত মস্তক ও আলার নিহত সঙ্গীদের কর্তিত কান খলিফা আল-মানসুরের কাছে পাঠিয়ে দেন। প্রতিটি কানের সঙ্গে যুক্ত কাগজে নিহত ব্যক্তির নাম লেখা ছিল। খলিফা আল-মানসুর তখন হজের সফরে ছিলেন। তার সামনে এগুলো উপস্থিত করা হলে তিনি ক্রোধে অধীর হয়ে যান। পরক্ষণেই তিনি স্বগতোক্তি করেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদের ও এই শয়তানের মাঝে সমুদ্রকে অন্তরায় রেখেছেন।' তিনি আবদুর রহমান আদ-দাখিলকে 'কুরাইশি ইগল' নামে অভিহিত করেন এবং পরবর্তী সময়ে আবদুর রহমান এ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এরপর আব্বাসিরা আর কখনো আন্দালুসের উমাইয়া সাম্রাজ্যে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেনি।

বহিস্থ সমস্যাসমূহের সমাধান

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংঘটিত বিদ্রোহ প্রচেষ্টাসমূহ দমনের পাশাপাশি আবদুর রহমানকে বাইরের বিভিন্ন সমস্যারও মোকাবিলা করতে হয়। এসব সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের আগ্রাসন প্রচেষ্টা।

বার্সেলোনার প্রশাসক সুলায়মান বিন ইয়াকযান কালবির নেতৃত্বে আবদুর রহমানের প্রতি বিক্ষুব্ধ একদল আরব আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং ইউরোপিয়ান ক্রুসেড সেনাপতি ফরাসি সম্রাট শার্লেমাইনের (Charlemagne) কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করে। তারা শার্লেমাইনকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, এখন আন্দালুসে অভিযান পরিচালনা করা সহজ হবে এবং আমরা আপনাকে জারাগোজা নগরী দখলে সহায়তা করব। এভাবে তারা নিজেদের প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে মুসলিম আন্দালুসের ভাগ্যে এক বিরাট দুর্যোগ টেনে আনে।

১৬১ হিজরি সনে (৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) শার্লেমাইন এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আন্দালুস অভিমুখে রওনা হন। তিনি পিরেনিজ পর্বতমালা (Pyrenees Mountains) পাড়ি দিয়ে জারাগোজার দক্ষিণ সীমান্তে আক্রমণ করেন। জারাগোজাবাসী প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুললে শার্লেমাইন জারাগোজা অবরোধ করেন। সংবাদ পাওয়ামাত্র আবদুর রহমান জারাগোজার প্রতিরক্ষায় এগিয়ে আসেন। পরিস্থিতিও তাকে সহায়তা করে। শার্লেমাইনের কাছে নিজ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির

সংবাদ এসে পৌঁছলে তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করে বিফল মনোরথে ব্যর্থতার গ্লানি সঙ্গে করে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তনের পথ ধরেন। মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাআলার কী কৌশল ও মহিমা! শার্লেমাইনের বাহিনী যখন পিরেনিজ পর্বতমালার সংকীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করছিল, তখন পর্বতমালার পাদদেশের বাস্ক অঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের পথরোধ করে। কথিত আছে, আবদুর রহমানই তাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ও জনবল দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। বাস্কের অধিবাসীরা শার্লেমাইনের বাহিনীর পশ্চাদ্‌বর্তী অংশের ওপর কঠিন আক্রমণ করে তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। পিরেনিজ উপত্যকায় ফরাসি সেনাবাহিনীর শৌর্য ও গৌরব ধুলোয় মিশে যায়। ফরাসি বাহিনীর এই অংশটির নেতৃত্বে ছিল শার্লেমাইনের অত্যন্ত আস্থাভাজন রোল্যান্ড নামক জনৈক সেনাপতি। আক্রমণে অন্যান্য সৈন্যদের সঙ্গে সেও নিহত হয়েছিল। শার্লেমাইন তার বিয়োগ বেদনায় অত্যন্ত ব্যথিত হন। জনৈক ফরাসি কবি নিহত রোল্যান্ডকে উৎসর্গ করে *La Chanson de Roland* নামে একটি শোককাব্য রচনা করেন। এ শোককাব্যটিকে ফরাসি সাহিত্যের প্রথম উৎসাহব্যঞ্জক সঙ্গীত হিসেবে গণ্য করা হয় এবং ফরাসি ভাষার গঠন ও বিকাশের ক্ষেত্রে একে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অবশ্য কাব্যটিতে যথেষ্ট পরিমাণে ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। এতে বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনার সঙ্গেই বাস্তব ইতিহাসের কোনো মিল নেই।

ফরাসি বাহিনী চলে যাওয়ার পর আন্দালুসে স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পুরো রাষ্ট্রে আবদুর রহমান আদ-দাখিলের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে। ১৬৪ হিজরি সনে (৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি জারাগোজায় গমন করেন এবং শার্লেমাইনকে শান্তিচুক্তির আহ্বান জানান। শার্লেমাইন আহ্বানে সাড়া দিলে উভয়ের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হয়। আবদুর রহমান আদ-দাখিল মাত্র বিশ বছর বয়সে ১৩৮ হিজরি সনে আন্দালুস সাম্রাজ্যের হাল ধরেছিলেন। এরপর দীর্ঘ পঁচিশ বছর তিনি পরম ধৈর্য ও অবিচলতা, উচ্চাভিলাষ ও দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে পরিস্থিতির উন্নয়নে কাজ করে গেছেন। আন্দালুসের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে যেমন তিনি বিপৎসংকুল এক জীবন অতিক্রম করেছেন, দায়িত্বগ্রহণের পরও একটানা পঁচিশটি বছর তিনি নানা সমস্যার মোকাবিলা করে গেছেন। অবশেষে ১৬৪ হিজরি সনে এসে

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তিনি তার ধৈর্য, উচ্চাভিলাষ ও সংকল্পের সুফল ভোগ করতে শুরু করেন।

স্থিতিশীল অধ্যায়ের সূচনা

আবদুর রহমান আদ-দাখিল ১৭০ হিজরি সনে কর্ডোভা মসজিদের নির্মাণ শুরু করেন। সাত বছর পর্যন্ত এর নির্মাণকাজ অব্যাহত থাকে। প্রশাসনিক বিষয়ে তিনি তার পূর্বপুরুষদের নীতি অনুসরণ করেন। তিনি আন্দালুসের নগরীগুলোকে নতুন করে বিন্যস্ত করেন এবং সেনাবাহিনীকে সুবিন্যস্ত করেন। উমাইয়া মাওয়ালিদের নিয়মিত বাহিনী ও পূর্বে বর্ণিত অঞ্চলকেন্দ্রিক সহায়ক বাহিনীর পাশাপাশি তার শাসনামলে সাকলাবিদের[২২] সমন্বয়ে নতুন একটি সামরিক বাহিনী গঠিত হয়। আবদুর রহমান আদ-দাখিল যদিও একাকী আন্দালুসে পা রেখেছিলেন; কিন্তু সুদক্ষ পরিকল্পনা ও নেতৃত্বগুণের কারণে তার শাসনামলে আন্দালুসে ইসলামি সেনাবাহিনীর সদস্যসংখ্যা এক লক্ষে পৌঁছায়। এই সংখ্যা কেবল অশ্বারোহী সৈনিকদের; পদাতিক সৈন্যদের সংখ্যা এ হিসাবের বাইরে। পরবর্তী সময়ে আন্দালুসে যেসব উমাইয়া প্রশাসক ও খলিফা শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাদের সামরিক শক্তির মূল ভিত্তি ছিল আবদুর রহমান আদ-দাখিলের এই সেনাবাহিনী।

তিনি তরবারি ও মিনজানিকসহ বিভিন্ন অস্ত্র তৈরি করার জন্য বেশ কয়েকটি কারখানা গড়ে তোলেন। টলেডো ও বারডিলের[২৩] সমরাস্ত্র-কারখানাগুলো এ ক্ষেত্রে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করে।

আবদুর রহমান আদ-দাখিল দেশের বার্ষিক বাজেটের ক্ষেত্রে ত্রিবণ্টন নীতি গ্রহণ করেন। বাজেটের পূর্ণ এক-তৃতীয়াংশ বরাদ্দ থাকত সেনাবাহিনীর জন্য; এক-তৃতীয়াংশ দেশের জনসেবামূলক বিভিন্ন কাজ যেমন রসদসামগ্রী, নির্মাণ, বেতন-ভাতা, সেবামূলক প্রকল্প ইত্যাদির পেছনে ব্যয় করার জন্য; আর বাকি এক-তৃতীয়াংশ অনাকাঙ্ক্ষিত

---

[২২]. সাকলাবি সেসব সৈনিককে বলা হতো, যাদেরকে ইউরোপের বিভিন্ন ক্রীতদাস-বাজার থেকে সংগ্রহ করে আনা হতো এবং সুদক্ষ প্রশিক্ষণ ও সুনিবিড় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে বিশুদ্ধ ইসলামি সামরিক চিন্তাধারায় গড়ে তোলা হতো। তারা সাম্রাজ্য এবং শাসকদের অনুগত ও একনিষ্ঠ সেবকে পরিণত হতো।

[২৩]. বর্তমান ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে Garonne নদীর তীরে অবস্থিত একটি নগরী; যার ইংরেজি নাম Bordeaux।

আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা থাকত।

আবদুর রহমান আদ-দাখিল নাগরিক জীবনধারার উন্নয়নেও কাজ করেন। তিনি রাষ্ট্রের বসতিপূর্ণ নগরীগুলোর সৌন্দর্যবর্ধন করেন এবং কর্ডোভার সম্মুখভাগে রুসাফা নামে একটি অভিজাত নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। রুসাফা ছিল উদ্ভিদ-উদ্যানবিশিষ্ট মনোরম একটি নগরী। রুসাফার উদ্যানগুলোতে পানি সরবরাহের সুলভ ব্যবস্থা ছিল। উদ্যানটিতে তিনি অন্যান্য গাছের পাশাপাশি শাম থেকে আনা একটি খেজুরচারাও রোপণ করেন। রুসাফায় এই একটিমাত্র খেজুর গাছের উপস্থিতি ও আন্দালুসে খেজুর গাছের বিরলতা আবদুর রহমানের হৃদয়ে বিষণ্নতা জাগিয়ে তুলত। গাছটির মাঝে তিনি নিজের জীবনকেই খুঁজে পেতেন। তিনি একজন কবিও ছিলেন। এ খেজুরগাছটিকে সম্বোধন করেই তিনি স্বরচিত এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন—

تَبَدَّتْ لَنَا وَسْطَ الرُّصَافَةِ نَخْلَةٌ ❋ تَنَاءَتْ بِأَرْضِ الْغَرْبِ عَنْ بَلَدِ النَّخْلِ

فَقُلْتُ: شَبِيْهِيْ فِي التَّغَرُّبِ وَالنَّوٰى ❋ وَطُولِ التَّنَائِيْ عَنْ بَنِيَّ وَعَنْ أَهْلِيْ

نَشَأْتِ بِأَرْضٍ أَنْتِ فِيْهَا غَرِيْبَةٌ ❋ فَمِثْلُكِ فِي الْإِقْصَاءِ وَالْمُنْتَأَى مِثْلِيْ

سَقَتْكِ غَوَادِي الْمُزْنِ مِنْ صَوْبِهَا الَّذِيْ ❋ يَسِحُّ وَيَسْتَمْرِي السِّمَاكَيْنِ بِالْوَبْلِ

খেজুর-ভূমি থেকে বহু দূর প্রতীচ্যে রুসাফার ভূমিতে উদ্ভাসিত এক খেজুর-বৃক্ষ,
যেন আমারই প্রতিচ্ছবি, আমার মতোই পরিবারহারা, নিঃসঙ্গ ও শেকড়চ্যুত।
আমার মতোই বহিরাগত তুমি, জন্মভূমি হতে দূরত্ব ও নিঃসঙ্গতার শোকে অচেতন,
যদিও তুমি সিঞ্চিত উষ্ণ প্রস্রবণে, মৎসকুল যেখানে করে সন্তরণ।

আবদুর রহমান আদ-দাখিল ১৭২ হিজরি সনের জুমাদাল উলা মাসে (৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) উনষাট বছর বয়সে কর্ডোভায় ইন্তেকাল করেন এবং কর্ডোভাতেই সমাহিত হন।

ঐতিহাসিক ইবনে হাইয়ান আন্দালুসি আবদুর রহমান আদ-দাখিলের গুণ-

বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—

> আবদুর রহমান ছিলেন পরমতসহিষ্ণু, সুপণ্ডিত, প্রদীপ্ত চিন্তাশক্তির অধিকারী, স্থির সংকল্পবিশিষ্ট, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, ত্বরিত উদ্যোগী ও অবিরাম কর্মতৎপরতার অধিকারী। তিনি আরাম-আয়েশ বা ভোগবিলাসে মত্ত হতেন না, বিলাসিতায় প্রশান্তি খুঁজে পেতেন না এবং দায়দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন না। তিনি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজ মতের ওপর নির্ভর করতেন না। তিনি ছিলেন একাধারে রণাঙ্গনের দুঃসাহসী রণসেনানী, তেজোদীপ্ত, সদা চিন্তানিমগ্ন; বাগ্মী, কবি, উদার-মহানুভব, সুভাষী ও সাবলীল বক্তা। তিনি শুভ্র পোশাক পরিধান করতেন, মাথায় সাদা পাগড়ি বাঁধতেন এবং সাদা পরিচ্ছদ পছন্দ করতেন। বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে সবার অন্তরে তার প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত প্রভাব-ভীতি বিরাজমান ছিল। প্রজাদের কারও অসুস্থতার সংবাদ পেলে তিনি তাকে দেখতে যেতেন, কেউ ইন্তেকাল করলে তার জানাজায় শরিক হতেন; রাজধানীতে উপস্থিত থাকলে নিজে জুমা ও ঈদের নামাজ পড়াতেন এবং খুতবা দিতেন।[২৪]

ঐতিহাসিকগণ আবদুর রহমান আদ-দাখিল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

> আবদুর রহমান আদ-দাখিলের আবির্ভাব না হলে আন্দালুস থেকে ইসলামের নামনিশানাই মুছে যেত।

২. হিশাম বিন আবদুর রহমান

[১৭২-১৮০ হিজরি—৭৮৮-৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দ]

হিশাম বিন আবদুর রহমানের জন্ম ১৩৯ হিজরি সনে (৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে) কর্ডোভায়। তেত্রিশ বছর বয়সে তিনি তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন।

আবদুর রহমান তার পুত্রদের মধ্য হতে হিশামকেই তার স্থলাভিষিক্ত নির্বাচিত করেন। পিতার মৃত্যুর সময় তিনি আন্দালুসের উত্তর সীমান্তে মেরিডায় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করছিলেন। আবদুর রহমান তাকে রাজধানী হতে বহু দূরে বিপজ্জনক সীমান্ত অঞ্চলে পাঠিয়ে জিহাদের

---

২৪. মাক্কারি, *নাফহুত তীব*, ৩/৩৭।

ময়দানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন এবং সর্বাবস্থায় বিপদ মোকাবিলা করার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

হিশাম বিন আবদুর রহমান ধর্মপরায়ণ ও খোদাভীরু ছিলেন। জনগণ তার শাসনে সন্তুষ্ট ছিল এবং শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ জীবনযাপনের নিশ্চয়তা লাভ করেছিল। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে নিযুক্ত প্রশাসকদের প্রতি সার্বক্ষণিক নজর রাখতেন, জবাবদিহি করতেন এবং প্রয়োজনে বরখাস্ত করতেন। তার ভাই সুলায়মান তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল; কিন্তু হিশাম তা সফলভাবে দমন করে আপন ক্ষমতা সুসংহত করেন।

তিনি ফ্রান্স ভূমিতে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। আন্দালুসের মুসলিম জনগোষ্ঠী সোৎসাহে এ অভিযানে শরিক হয়। এক লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে হিশাম ১৭৭ হিজরি সনে (৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে) ফ্রান্সে প্রবেশ করেন এবং কারকাসোনা (Carcassonne) নগরীর দিকে অগ্রসর হন। ফ্রান্স অধিপতি শার্লেমাইন তখন দানিয়ুব নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ব্যস্ত ছিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে কাউন্ট অব টুলুজ (Toulouse) রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসকদের দ্রুত সমবেত হতে আহ্বান করেন। তখন তারা চতুর্দিক থেকে আগমন করে এবং মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হয়। তুমুল লড়াইয়ের পর মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে। ফরাসিরা প্রচুর জনবল ও অস্ত্রসম্পদ হারায়। মুসলিম বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন না করে লব্ধ গনিমত নিয়েই প্রত্যাবর্তন করে।

হিশামের শাসনামলেই আন্দালুসে মালিকি মাজহাবের প্রসার ঘটে।[২৫] ইমাম মালিক রহ.-এর শাগরিদ ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া লাইছি আন্দালুসে মালিকি মাজহাবের প্রসারে বড় ভূমিকা রাখেন। হিশামের আমলে আন্দালুসে আলিম ও ফকিহগণের অত্যুচ্চ মর্যাদা ছিল।

হিশাম বিন আবদুর রহমান সাত বছর নয় মাস ব্যাপ্ত শাসনামল শেষে ১৮০ হিজরি সনের সফর মাসে (৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে) চল্লিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

---

২৫. এর পূর্বে আন্দালুসে ইমাম আওযায়ি রহ.-এর মাজহাবের প্রচলন ছিল।

৩. হাকাম বিন হিশাম বিন আবদুর রহমান আদ-দাখিল

[১৮০-২০৬ হিজরি—৭৯৬-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ]

হাকাম বিন হিশামের জন্ম ১৫৪ হিজরি সনে (৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে) কর্ডোভায়। ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি তার পিতা হিশামের স্থলাভিষিক্ত হন।

তার উপাধি ছিল রাবাযি। রাজধানী কর্ডোভার পার্শ্ববর্তী রাবায নামক একটি শহরতলির অধিবাসীদের প্রতি অমানবিক আচরণ করায় তাকে এ উপাধি দেওয়া হয়।

হাকাম বিলাসী জীবনযাপন করতেন এবং খেল-তামাশা ও শিকারের নেশায় ডুবে থাকতেন। তিনি অহংকারী ও দুষ্ট প্রকৃতির কিছু অনুচর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। এ ছাড়াও তার ছিল প্রজাদের প্রতি কঠোর এবং বর্বর আচরণকারী বিশেষ একটি বাহিনী, যার অধিকাংশই ছিল সাকলাবি শ্রেণির। হাকাম ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক মাস পরই রাজপরিবারের লোকজন এবং রাষ্ট্রের প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ অপরিণত এবং অপরিপক্ব হাকামের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে। কয়েকজন ফকিহ-আলিমও তাদেরকে সমর্থন করেন। ফলে জনগণও তার বিরুদ্ধে চলে যায়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হাকামের কঠোর আচরণ

তার শাসনামলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ও প্রসিদ্ধ ঘটনা হচ্ছে রাবায-ট্রাজেডি। ২০২ হিজরি সনের ১৩ রমজান (৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ মার্চ) কর্ডোভার দক্ষিণ শহরতলি শাকুন্দা হতে সাধারণ জনগোষ্ঠী ও আলিমদের সমন্বয়ে একটি দল রাজধানীর উদ্দেশে রওনা হয়। তাদের সঙ্গে আন্দালুসের বিখ্যাত ফকিহ ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া লাইছিও ছিলেন। আন্দোলনকারীরা রাষ্ট্রে ন্যায়প্রতিষ্ঠার দাবিতে সমবেত হয়েছিল; ক্ষমতার প্রতি তাদের কোনো দৃষ্টি ছিল না।

কিন্তু হাকাম তাদের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোর ও নিকৃষ্ট আচরণ করেন। হাকামের নির্দেশে তার বাহিনীর সৈন্যরা আন্দোলনকারীদের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং তাদের স্ত্রী-সন্তানদের নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। আন্দোলনকারীরা তাদের পরিবারকে রক্ষা করার জন্য ফিরে এলে সৈন্যরা তাদেরকেও হত্যা করে। এভাবে কঠোর ও নৃশংস নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে হাকাম আন্দোলনকারীদের দমন করেন।

এরপর হাকাম আন্দালুসের দক্ষিণাঞ্চলীয় গ্রামীণ জনপদগুলোর জনসাধারণকে আন্দালুস থেকে বিতাড়িত করার নির্দেশ দেন। এসব এলাকার অধিবাসীরা ছিল আন্দালুসের সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত শ্রেণির জনগণ। বিতাড়িত জনগণের একটি অংশ আন্দালুস ছেড়ে মাগরিবের ফেজ নগরীতে আশ্রয় নেয়। মাগরিবে তখন প্রথম ইদরিস ইদরিসিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সূচনা স্তরে ছিলেন। তিনি তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে ফেজের একটি এলাকা তাদের জন্য ছেড়ে দেন। বর্তমানেও এলাকাটি আন্দালুসিয়া নামে পরিচিত। নবগঠিত ইদরিসিয়া রাষ্ট্র এসব লোকের অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হয়। বিতাড়িত জনগণের আরেকটি অংশ পূর্ব দিকে চলে যায় এবং দীর্ঘ জলাভূমি ও স্থলভূমি পাড়ি দিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় আবাস গ্রহণ করে। পরে তারা সেখান থেকেও বিতাড়িত হয়ে ক্রিট দ্বীপে[২৬] পৌঁছায়। দ্বীপটি তখন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। আন্দালুসের বিতাড়িত জনগোষ্ঠী সেখানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ২১২ হিজরি সনে (৭২৮ খ্রিষ্টাব্দে) 'কালবিয়া' নামক একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। শতাব্দীকাল পর বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য পুনরায় দ্বীপটি দখল করে নেয়।

শাসনামলের শুরুর দিকে হাকাম বিজয়াভিযানের তৎপরতা অব্যাহত রাখলেও পরে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এসব গোলযোগ ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে স্বাভাবিকভাবেই আন্দালুসের প্রকৃত শত্রু ক্রুসেডার শার্লেমাইনের মোকাবিলার বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে পারেননি। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শার্লেমাইন ১৯০ হিজরি সনে বার্সেলোনা দখল করে নেন এবং সেখানে খ্রিষ্টান সীমান্ত নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই বার্সেলোনা অঞ্চল ইসলামি আন্দালুসের সীমান্তঘেঁষা এক শক্তিশালী খ্রিষ্টান রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

রাবায ট্রাজেডির পরই হাকাম বিন হিশাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। দিনে দিনে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। এ সময় তিনি রাবাযবাসীর সঙ্গে কৃত গর্হিত আচরণের জন্য অনুতপ্ত হয়ে পড়েন। এর কিছুদিন পরই তিনি ইন্তেকাল করেন।

হাকাম বিন হিশাম ২০৬ হিজরি সনের জিলহজ মাসে (৮২২ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে) বায়ান্ন বছর বয়সে মারা যান।

---

[২৬]. **ক্রিট :** ক্রিট (Crete) গ্রিসের সর্ববৃহৎ দ্বীপ।

৪. আবদুর রহমান বিন হাকাম

[২০৬-২৩৮ হিজরি—৮২২-৮৫২ খ্রিষ্টাব্দ]

আবদুর রহমান বিন হাকামের জন্ম ১৭৬ হিজরি সনে (৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে) টলেডোতে। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি আন্দালুসের উমাইয়া সাম্রাজ্যের হাল ধরেন। তিনি 'আবদুর রহমান আল-আওসাত' নামে খ্যাত ছিলেন।(২৭) উত্তরাধিকার সূত্রে আবদুর রহমান একটি মজবুত ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। তিনি ভারসাম্যপূর্ণ স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। কঠোরতা ও কোমলতার মিশেলে গড়ে ওঠা আবদুর রহমান আল-আওসাত জানতেন—তরবারি চালনার স্থলে কীভাবে তরবারি চালাতে হয় এবং কোমলতার স্থলে কীভাবে কোমলতা প্রদর্শন করতে হয়।

তার শাসনামলেই আন্দালুসে নাগরিক সভ্যতা ও সমৃদ্ধ জীবনযাত্রার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে শুরু করে। লোকজন বিলাসবহুল ও দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদসম ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে থাকে। কর্ডোভা সমগ্র ইউরোপের সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন নগরী হওয়ার দিকে যাত্রা শুরু করে। যদিও এ বিবরণ সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল, তবে সাম্রাজ্যের অধিকাংশ লোকই এ সময় তুলনামূলক সমৃদ্ধ জীবনযাপন করত। কারণ, একদিকে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থা সমৃদ্ধ হচ্ছিল, অপরদিকে জনগণও ছিল কর্মোদ্যমী। সরকারি করের পরিমাণও ছিল অতি অল্প। প্রশাসনের লোকজনের আচার-আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ প্রদানের জন্য ন্যায়প্রতিষ্ঠা বিভাগ নামে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান ছিল। বিখ্যাত ফকিহ ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আল-লাইছি বিচার-বিভাগের তত্ত্বাবধান করতেন। তার পদমর্যাদা ছিল অনেকটা বর্তমান সময়ের আইন ও বিচারমন্ত্রীর ন্যায়।

আবদুর রহমান আল-আওসাতই প্রথম কর্ডোভায় টাকশাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন।

---

২৭. আন্দালুসের (স্বাধীন প্রশাসন) ইতিহাসে যে তিনজন প্রশাসক আবদুর রহমান নামে গত হয়েছেন, তিনি তাদের মাঝের জন। এ কারণেই তাকে 'আল-আওসাত' বা মধ্যমজন বলা হয়। প্রথমজন ছিলেন আবদুর রহমান আদ-দাখিল আর তৃতীয় জন আবদুর রহমান আন-নাসির, যার আলোচনা সামনে আসবে।

নরম্যান জলদস্যুদের হামলা

[২৩০ হি.—৮৪৫ খ্রি.]

নরম্যান জলদস্যুরা[২৮] কালো পতাকাবিশিষ্ট তুলনামূলক ছোট নৌযানে চড়ে সাগরপথে বিভিন্ন ভূখণ্ডে যেত। তারা তীরে অবতরণ করে ছোট একটি শিবির স্থাপন করত; এরপর আশেপাশের এলাকায় দ্রুত হামলা চালিয়ে ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে শিবিরে গচ্ছিত রাখত। পুরো জনপদে লুণ্ঠন শেষ হলে তারা লব্ধ সম্পদ শিবির থেকে নৌযানে নিয়ে যেত এবং দ্রুত স্থানত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেত। নরম্যান জলদস্যুরা শত্রুপক্ষকে ভয় দেখানোর জন্য আগুন ব্যবহার করত। এ কারণে মুসলমানরা তাদেরকে অগ্নিপূজারি মনে করত। ঐতিহাসিক বিভিন্ন নথিপত্রে তাদেরকে অগ্নিপূজারি হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

নরম্যান জলদস্যুরা আন্দালুস ভূমিতে রাহাজানি চালালে আবদুর রহমান আল-আওসাতের বাহিনী দীর্ঘ কয়েক মাস যুদ্ধ করার পর তাদেরকে দমন করতে সক্ষম হয়। এ ঘটনা আবদুর রহমানকে ভাবিয়ে তোলে এবং তিনি উপলব্ধি করেন যে, আন্দালুসের ইসলামি ভূখণ্ডের নিরাপত্তার জন্য একটি শক্তিশালী নৌবহর প্রতিষ্ঠা করা অতি জরুরি। ইতিপূর্বে অপ্রয়োজনীয় মনে করে আন্দালুসে নৌবহর প্রতিষ্ঠার চিন্তা করা হয়নি। আবদুর রহমানের তত্ত্বাবধানে আন্দালুসের প্রথম নৌবহর প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আন্দালুসের নৌবহর ভূমধ্যসাগরের ওয়েস্টার্ন বেসিনে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। মুসলিম নৌবহর আন্দালুসের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ব্যালেরিক দ্বীপপুঞ্জেও[২৯] পুনঃকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। আবদুর

---

২৮. উত্তর ইউরোপের উপদ্বীপ স্ক্যান্ডিনেভিয়া (Scandinavia) অঞ্চলের অধিবাসীদের নরম্যান (The Normans) বলা হয়। ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড ও সুইডেন মিলে স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চল গঠিত। নরম্যান জাতিগোষ্ঠী অত্যন্ত বর্বর ও অসভ্য জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল। আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে তারা দস্যুবৃত্তি চালাত। ইতিহাসে তারা ভাইকিং (Viking) জলদস্যু নামে পরিচিত। উল্লেখ্য, দস্যুবৃত্তির অর্থ হলো দেশজয় বা এ জাতীয় কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া কেবল সম্পদ লুণ্ঠন ও জনপদ ধ্বংসের লক্ষ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে হামলা চালানো।

২৯. **ব্যালেরিক দ্বীপপুঞ্জ :** আন্দালুসের পূর্ব উপকূলে ভূমধ্যসাগরের বুকে বেশ কয়েকটি দ্বীপ আছে, যেগুলোকে ব্যালেরিক দ্বীপপুঞ্জ (Balearic Islands) বলা হয়। এসব দ্বীপের মধ্যে সামরিক কৌশলগত দিক থেকে তিনটি দ্বীপের অবস্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; মায়োর্কা=

রহমান আল-আওসাত দুটি নৌবহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একটি ভূমধ্যসাগরে টহল দিত, অপরটি আটলান্টিক মহাসাগরে।

আবদুর রহমান আল-আওসাতের শাসনামলে আন্দালুস রাষ্ট্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি এমন উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছিল যে, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল থেকেও তার দরবারে উপঢৌকন প্রেরণ করা হতো।[৩০]

তার শাসনামলেই আন্দালুসের পূর্বাঞ্চলে মুরসিয়া (Murcia) এলাকায় নতুন করে মুযারি-ইয়ামেনি সংঘর্ষ শুরু হয়। দীর্ঘ সাত বছর চেষ্টা করার পর আবদুর রহমান এই ফিতনা দমন করতে সক্ষম হন। অবশ্য কিছুদিন পরই আমির আবদুল্লাহর শাসনামলে এই ফিতনা আরও ভয়ংকর রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

মুসতারিবিনদের বিদ্রোহ

আন্দালুসের যেসব খ্রিষ্টান নাগরিক মুসলমানদের হাতে আন্দালুস বিজিত হওয়ার পরও আপন ধর্মমতে অটল ছিল এবং জিজিয়া প্রদান করে আন্দালুসে বসবাস করছিল, তাদেরকে মুসতারিবিন বলা হতো। ভাষা, জ্ঞানচর্চা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জীবনাচারের দিক থেকে তারা আরবদের মতোই ছিল। আন্দালুসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসতারিবিন জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। মুসলিম ও মুসতারিবিন জনগণের মাঝে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও সম্প্রীতিপূর্ণ।

এই কারণেই তাদের বিদ্রোহপ্রচেষ্টা ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা। বিশেষ করে আবদুর রহমান আল-আওসাতের শাসনামল ছিল সচ্ছলতাপূর্ণ ও অস্থিরতামুক্ত। জনসাধারণের মাঝে কোনো ধরনের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাও ছিল না।

জনৈক কট্টরপন্থি খ্রিষ্টান পাদরি আন্দালুসের খ্রিষ্টানসমাজে আরব সভ্যতার প্রতি আকর্ষণ এবং খ্রিষ্টান-মুসলিম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে অস্থির হয়ে উঠেছিল। সে খ্রিষ্টানসমাজে ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করলে কিছু খ্রিষ্টান নাগরিক তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিদ্রোহ করে। আবদুর রহমান

=(Palma de Mallorca), ম্যানোর্কা (Menorca) ও ইবিজা (Ibiza) দ্বীপ। প্রাচীন আরবি উৎস-গ্রন্থসমূহে এসব দ্বীপকে 'প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

[৩০]. মাক্কারি, *নাফহুত তীব*, ১/৩৪৬।

প্রজ্ঞার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং একান্ত বাধ্য না হলে কঠোরতা অবলম্বন না করার নীতি অবলম্বন করেন। ফলে শান্তিপূর্ণ পন্থায় এই বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটে।

আবদুর রহমান আল-আওসাত ২৩৮ হিজরি সনের রবিউস সানি মাসে (৮৫২ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে) বাষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

ঐতিহাসিক সাফাদি তার সম্পর্কে বলেছেন—

> তিনি তার পিতার বিপরীতে জনগণের প্রতি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, ছিলেন উদার ও মহানুভব। যুক্তিবিদ্যাসংক্রান্ত শাস্ত্রসমূহের প্রতি তার বিশেষ অনুরাগ ছিল। আন্দালুসে তিনিই প্রথম তৈরি মুদ্রার প্রচলন করেন। তিনি সেভিলে নগরপ্রাচীর নির্মাণ করেন। তার তত্ত্বাবধানে কর্ডোভা মসজিদের সম্প্রসারণ করা হয়। তাকে খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের সঙ্গে তুলনা করা হতো। আবদুর রহমান আলিমদের ভালোবাসতেন এবং তাদেরকে কাছে রাখতেন। সাধারণত নিজেই নামাজে ইমামতি করতেন। প্রাচীন গ্রন্থাদি তিনিই প্রথম আন্দালুসে আনার ব্যবস্থা করেন এবং আন্দালুসের আলিমসমাজকে এসব গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত করেন। তিনি সুদর্শন ও প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন। বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করতেন, হাদিস মুখস্থ করতেন। তার শাসনামলকে 'বরের যুগ' বলা হতো। তিনি ন্যায়ের বিকাশের মাধ্যমে দেশের মানুষের মন জয় করেছিলেন। জনগণ তার শাসনামল উপভোগ করত এবং তার দীর্ঘায়ু কামনা করত। তিনি ইনসাফের সঙ্গে রাজস্ব সংগ্রহ করতেন। রাষ্ট্রের বিনির্মাণে তিনি সবিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। এমনকি তার শাসনামলে দেশের বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ দশ লক্ষ দিনারে পৌঁছেছিল।[৩১]

---

[৩১]. সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল ওয়াফাইয়াত*, ১৮/৮৪।

পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ অনুধাবনে সহায়ক কিছু তথ্য

আন্দালুস মূলত সুবিস্তৃত ও সুপ্রাচীন মালভূমি দ্বারা গঠিত একটি উপদ্বীপ অঞ্চল। পুরো মালভূমি অঞ্চলকে সমান্তরালভাবে ভেদ করে আন্দালুসে আছে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত দীর্ঘ পর্বতসারি ও উপত্যকাসমূহ। এসব পাহাড়ি উপত্যকা অঞ্চলগুলো প্রাকৃতিকভাবেই সুরক্ষিত ছিল। আর কোনো রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান এমন হলে সেখানে কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতি সবার অনুগত না থাকাটাই স্বাভাবিক।

মুসলমানদের আগমনের পূর্ব থেকেই আন্দালুসে দুই শ্রেণির মানুষ বসবাস করত। ১. আন্দালুসের আদিবাসী জনগণ। ২. শাসক গোথ গোষ্ঠী। মুসলমানরা আন্দালুস জয় করার পর আরব ও বার্বাররাও আন্দালুসে বসবাস করতে শুরু করে।

আরব ও বার্বার জাতির অধিবাসীগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে আন্দালুসে বসবাস করত। আরব গোত্রগুলো নিজেদের আরবীয় ব্যক্তিত্ব, বংশপরিচয় ও বংশীয় আভিজাত্য রক্ষা করে চলত। আরবদের মাঝে মুযারি ও ইয়ামেনি উভয় শ্রেণির লোক ছিল। প্রত্যেকে আপন আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলত; প্রতিটি গোত্র নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবতরণ করে সেখানেই বসবাস করত। বার্বাররাও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। তারাও নিজেদের প্রাচীন গোত্রব্যবস্থা ও বংশপরিচয় রক্ষা করে চলত এবং আলাদা ও নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে সেখানেই বসবাস করত।

কিন্তু আন্দালুসের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনধারায় বড় ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের মাঝে ইসলামধর্ম এবং আরবি ভাষা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে এবং আরবি ভাষায় কথা বলা শুরু করে। আরব এবং বার্বারদের অনেকে স্থানীয় নারীদের সঙ্গে বৈবাহিক

সম্পর্ক স্থাপন করলে নতুন এক প্রজন্ম আত্মপ্রকাশ করে। মিশ্র রক্ত ও বংশপরিচয়ের অধিকারী এই প্রজন্ম 'মুওয়াল্লাদিন' বা মিশ্র প্রজন্ম নামে পরিচিত হয়। মিশ্র প্রজন্মও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে ওঠে। স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ না করে নিজেদের খ্রিষ্টান বা ইহুদি ধর্মপরিচয়ে অটল থাকে। কিন্তু তারাও আরবি ভাষা শিখে নেয় এবং আরবদের জীবনাচার গ্রহণ করে। তাদেরকেই মুসতারিবিন বলা হতো।

ক্ষয় ও বিভক্তির কাল বা প্রথম বিভক্তির কাল

[২৩৮-৩০০ হিজরি—৮৫২-৯১৩ খ্রিষ্টাব্দ]

এ আমলেই ইসলামি আন্দালুস ভূখণ্ডের বিরাট অংশ মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং আন্দালুসের ইসলামি রাষ্ট্র প্রথমবারের মতো বিভক্তির শিকার হয়। এ আমলের ব্যাপ্তি আবদুর রহমান আন-নাসিরের দায়িত্ব গ্রহণের আগ পর্যন্ত।

এ আমলে যারা আন্দালুসের শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, তারা হলেন—

- মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আল-আওসাত। জন্ম ২০৭ হিজরি সনে (৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে) কর্ডোভায়, মৃত্যু ২৭৩ হিজরি সনে (৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে) কর্ডোভায়। শাসনকাল ২৩৮ থেকে ২৭৩ হিজরি (৮৫২-৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ)।
- মুনযির বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান। জন্ম ২২৯ হিজরি সনে (৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে) কর্ডোভায়, মৃত্যু ২৭৫ হিজরি সনে (৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে) বাবিস্টারে। শাসনকাল ২৭৩ থেকে ২৭৫ হিজরি (৮৮৬-৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দ)।
- আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান। জন্ম ২২৯ হিজরি সনে (৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে) কর্ডোভায়, মৃত্যু ৩০০ হিজরি সনে (৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে) কর্ডোভায়। শাসনকাল ২৭৫ থেকে ৩০০ হিজরি (৮৮৯-৯১৩ খ্রিষ্টাব্দ)।

আন্দালুস ইতিহাসের এই স্তরে প্রচুর বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং আন্দালুসের আরব জনগোষ্ঠী কয়েকটি বিচ্ছিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সেভিল অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বনু

হাজ্জাজ রাষ্ট্র। বনু হাজ্জাজ ছিল ইয়ামেনি লাখমি বংশের শাখা। বনু হাজ্জাজের সর্দার ইবরাহিম বিন হাজ্জাজ আন্দালুসের উমাইয়া শাসকদের ন্যায় প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের আশায় উমাইয়া সাম্রাজ্যের আদলে তার রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। উমাইয়া শাসকদের ন্যায় ইবরাহিম বিন হাজ্জাজেরও রাজপ্রাসাদ, রাজপ্রহরী, নিজস্ব বাহিনী ও ভৃত্য-অনুচর ছিল। তিনি নিজ দরবারে জ্ঞানী-গুণী, কবি-সাহিত্যিক ও শাস্ত্রজ্ঞদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। বিশিষ্ট কবি ও ঐতিহাসিক, বিখ্যাত সাহিত্যগ্রন্থ *'আল-ইকদুল ফারিদ'*-এর গ্রন্থকার ইবনু আবদি রাব্বিহি তার আমলেই সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশ করেন।

এ আমলে বার্বাররাও উমাইয়া শাসকের আনুগত্য অস্বীকার করে নিজেদের গোত্রকেন্দ্রিক জীবনধারায় ফিরে যায় এবং আন্দালুসের পশ্চিমাঞ্চল ও পর্তুগালের দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠন করে। বার্বাররা জাইয়ান নগরীর ন্যায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় এলাকাতেও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। বার্বার শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল যিননুন পরিবার। তাদের নেতৃত্বে ছিল মুসা নামক জনৈক ধূর্ত ও দুষ্ট ব্যক্তি। তার তিন পুত্রও ছিল পিতার সার্থক উত্তরসূরি! যুননুন পরিবার আন্দালুসের প্রতিটি প্রান্তে অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে ব্যাপক ত্রাস সৃষ্টি করেছিল।

অপরদিকে মুওয়াল্লাদিন সম্প্রদায় আন্দালুসের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে জারফ অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তারা আন্দালুসের বেশ কয়েকটি নগরীতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে আলাদা রাষ্ট্র গঠন করে। ইবনে হাফছুন নামক জনৈক মুওয়াল্লাদিন নেতা এ সময় শক্তিশালী বিদ্রোহীরূপে আবির্ভূত হয়। সে রাইয়া অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং বাবিস্‌টার পর্বতের এক সুরক্ষিত দুর্গে ঘাঁটি স্থাপন করে। ইবনে হাফছুন গ্রানাডার পাহাড়ি লোকজনকে প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করে। দিনে দিনে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সে গ্রানাডার আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চলে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ইবনে হাফছুন তার দলবল নিয়ে মানুষের মাঝে লুটতরাজ চালাত এবং ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টি করত। একপর্যায়ে পুরো দক্ষিণ আন্দালুসে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই সে কর্ডোভার একেবারে কাছাকাছি চলে যায়।

উমাইয়া শাসক আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বেশ কয়েকবার ইবনে হাফছুনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদানের চেষ্টা করলেও তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

একপর্যায়ে ইবনে হাফছুন নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে মুসতারিবিন সম্প্রদায়কে নিজ দলে টানার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তাদেরকে প্রলুব্ধ করতে ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু এর ফল হয় সম্পূর্ণ বিপরীত। তার সঙ্গে থাকা মুসলমানরা তাকে ত্যাগ করে আর খ্রিষ্টান মুসতারিবিন নাগরিকরাও তার দলে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে ইবনে হাফছুনের ক্ষমতা ও প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে আবদুর রহমান আন-নাসিরের হাতে তার রাজ্যের পতন ঘটে।

আন্দালুসে বনু উমাইয়ার স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র একশ বছর পর ২৩৮ হিজরি থেকে ৩০০ হিজরি পর্যন্ত সময়ে এই ছিল আন্দালুসের হালচিত্র। ইসলামি আন্দালুস খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কয়েকটি এলাকা নিয়েই একেকটি রাষ্ট্র গঠিত হতে থাকে এবং সেই ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রগুলো নিজেদেরকে সাম্রাজ্য দাবি করতে থাকে। অপরদিকে বনু উমাইয়ার শাসন ও কর্তৃত্ব রাজধানী কর্ডোভা ও তার পার্শ্ববর্তী কিছু এলাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

অবশ্য এই রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিভক্তি সত্ত্বেও সমকালীন আন্দালুসের নাগরিক সভ্যতা তখন উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অগ্রসর ছিল।

উমাইয়া শাসক আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ তার ওলিয়ে আহদ ও পরবর্তী শাসক হিসেবে পৌত্র আবদুর রহমানকে মনোনীত করেন। আবদুর রহমান তখন জীবনের তেইশতম বসন্তে পদার্পণকারী টগবগে এক যুবক।

ক্ষয় ও বিভক্তির পর পুনরায় সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি অর্জনের কাল

[৩০০-৩৬৮ হিজরি—৯১৩-৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ]

এ আমলেই আবদুর রহমান আন-নাসিরের নেতৃত্বে ইসলামি আন্দালুস পুনরায় একক বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। আবদুর রহমান আন্দালুস সাম্রাজ্যকে খিলাফতে ইসলামিয়া এবং নিজেকে 'খলিফাতুল মুসলিমিন' ঘোষণা করেন।

১. আবদুর রহমান আন-নাসির লি দ্বীনিল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ

[৩০০-৩৫০ হিজরি—৯১৩-৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ]

আবদুর রহমান আন-নাসিরের জন্ম ২৭৭ হিজরি সনে (৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে)। তিনি তেইশ বছর বয়সে পিতামহ আবদুল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হন। আবদুর রহমানের পিতা (২য়) মুহাম্মাদ আবদুর রহমানের জন্মের বিশ দিন পরই ভাই মুতাররিফের হাতে নিহত হন।

আমির আবদুল্লাহ বিন (১ম) মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর সকলে কোনো ধরনের মতানৈক্য ছাড়াই আবদুর রহমানের হাতে বায়আত গ্রহণ করে। অথচ তখন তার কয়েকজন চাচা জীবিত ছিলেন এবং জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে তারা আবদুর রহমানের তুলনায় দায়িত্বলাভের অধিক দাবিদার ছিলেন। তাই তাদের পক্ষ থেকে বিদ্রোহ প্রচেষ্টা বা কমপক্ষে অসন্তোষ প্রকাশ পাওয়া অনুমেয়ই ছিল। কিন্তু তৎকালীন আন্দালুসের দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে সকলে উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের অপেক্ষা করছিল এবং দায়িত্বের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে পড়েছিল। এর ফলে আবদুর রহমান রাষ্ট্রের ভীত মজবুত করার অনুকূল পরিবেশ পেয়ে যান।

বিভক্তি ও পারস্পরিক হানাহানির কারণে আন্দালুসের ব্যবসাবাণিজ্য ও পণ্য পরিবহনব্যবস্থা স্থবির হয়ে পড়েছিল, জনজীবন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংসের উপক্রম হয়েছিল। ঘোরতর সংকটে নিমজ্জিত আন্দালুসবাসী আন্দালুস-ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে দয়াময় আল্লাহর কুদরতি করুণার প্রত্যাশায় প্রহর গুনছিল। তারা প্রতীক্ষায় ছিল উমাইয়া রাজদিগন্তে এমন কারও উদয় হবে, যিনি আন্দালুসকে এই দুর্যোগ থেকে উদ্ধার করবেন। আর তাই আবদুর রহমান আন-নাসির দায়িত্ব গ্রহণের পর যখন বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ব্রতী হন, সাধারণ জনগণ তখন তার প্রতিটি সংস্কারমূলক প্রচেষ্টায় একতাবদ্ধ হয়ে তাকে সমর্থন জোগায়।

অভ্যন্তরীণ সমস্যা দূরীকরণে আবদুর রহমানের গৃহীত নীতি ও পদক্ষেপ

আবদুর রহমান ছিলেন কোমলতা ও কঠোরতার সম্মিলনে একজন আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক। দৃঢ়তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপযুক্ত সময়ে দৃঢ় ও কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সামর্থ্যের সময় উদারতা ও কোমলতা প্রদর্শন—এই ছিল আবদুর রহমান আন-নাসিরের কর্মপদ্ধতি। দায়িত্ব গ্রহণ করেই তিনি আন্দালুসের অভ্যন্তরে গজিয়ে ওঠা প্রতিটি রাষ্ট্রের শাসক ও প্রশাসকদের কাছে একটি করে বার্তা প্রেরণ করেন। বার্তায় প্রতিশ্রুতি যেমন ছিল, হুমকিও ছিল; আশাবাদ যেমন ছিল, সতর্কবাণীও ছিল। তিনি বার্তায় স্পষ্ট করে দেন যে, আঞ্চলিক শাসকদের যে-ই আন্দালুসের বৈধ শাসকের প্রতি মিত্রতার হাত বাড়িয়ে দেবে, সে-ই আবদুর রহমানের আস্থা ও নৈকট্য লাভ করবে এবং কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে সর্বোচ্চ সম্পদ ও ক্ষমতা লাভ করবে। অপরদিকে যে বা যারা মিত্রতার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করবে, তার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার এক বিধ্বংসী লড়াই চালিয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে কাউকে সামান্য ছাড় দেওয়া হবে না এবং কোনোকিছু অক্ষত রাখা হবে না।

আবদুর রহমান বুঝে-শুনেই এই বার্তা প্রেরণ করেছিলেন। তিনি জানতেন—যারা বিভিন্ন অঞ্চলে কর্তৃত্ব বিস্তার করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে, তাদের অধিকাংশই প্রতাপ-প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলা বিভিন্ন প্রাচীন বংশ ও শাখাগোত্রের অবশিষ্ট অংশ।

আবদুর রহমান আন-নাসির তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি অভিনব নীতি অবলম্বন করেন। তিনি একসঙ্গে সবগুলো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে

অভিযান পরিচালনার পরিবর্তে তার বাহিনী নিয়ে একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র অবরোধ করতেন এবং বিভিন্নভাবে তাদের ওপর চাপ বৃদ্ধি করতেন। এরপর তিনি তাদেরকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানাতেন। শাসকপরিবার আত্মসমর্পণ করলে তিনি তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতেন এবং পরাভূত শাসককে তার পরিবার-পরিজন ও অনুচরবৃন্দসহ সসম্মানে কর্ডোভায় নিয়ে আসতেন। এরপর তিনি তাদের যথেষ্ট সমাদর করতেন এবং উমাইয়া রাজপরিবারের নৈকট্য দান করতেন। আবদুর রহমানের এই অভিনব নীতির ফলে দীর্ঘদিন যাবৎ উমাইয়া রাজপরিবারকে যুদ্ধ ও হুমকির মাধ্যমে সন্ত্রস্ত করে রাখা নেতৃবৃন্দ একে একে সকলেই আত্মসমর্পণ করতে থাকে।

তবে একজন বিদ্রোহী নেতাকে দমন করতে গিয়ে আবদুর রহমানকে বেশ বেগ পোহাতে হয়। আর সে হচ্ছে ইবনে হাফছুন। অবশ্য পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলাম ত্যাগ করার পর ইবনে হাফছুনের শক্তি ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং তার ক্ষমতা ও প্রভাব কার্যত নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। ৩০৬ হিজরি সনে (৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে) ইবনে হাফছুনের মৃত্যু হয়। তার পরে তার সন্তানরা আবদুর রহমানের মোকাবিলায় দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হতে পারেনি। ফলে তাদের সুরক্ষিত দুর্গ বাবিস্‌টারেরও পতন ঘটে।

৩১৩ হিজরি সন শুরু হওয়ার পূর্বেই আবদুর রহমান আন-নাসির একক আন্দালুস রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কে পরিণত হন।

দ্রষ্টব্য

ইবনে হাফছুনকে নিয়ে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মিথ্যাচার

উমর ইবনে হাফছুন মূলত আন্দালুসের সাবেক শাসক পরিবার গোথ (Visigoths) বংশোদ্ভূত ছিল। ইউরোপীয় বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র তার পরিচয় ও কর্মনীতির বর্ণনা দিতে গিয়ে মাত্রাতিরিক্ত অতিরঞ্জন করেছে। তাদের বিবরণ অনুযায়ী ইবনে হাফছুন ছিল একজন জাতীয় বীর, যে মাতৃভূমির স্বাধীনতা কামনা করত। অথচ প্রকৃত বাস্তবতা হলো ইবনে হাফছুন একজন বর্বর ও হিংস্র ডাকাতের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। এর অন্যতম প্রমাণ

হচ্ছে—যখন সে ধর্মত্যাগের ঘোষণা করে, তখন নিজের আশেপাশে কাউকেই পায়নি। এমনকি খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী মুসতারিবিনরাও তার পক্ষাবলম্বন করেনি।

ഇ—০—ഇ

বহিস্থ খ্রিষ্টান রাষ্ট্রের মোকাবিলায় আবদুর রহমান আন-নাসির

তারিক বিন যিয়াদ ও মুসা বিন নুসায়রের নেতৃত্বে আন্দালুস বিজয়াভিযানের সময় আন্দালুসের উত্তর-পশ্চিম অংশে গ্যালিসিয়া অঞ্চলের সাখরাতুল বিলাইয়া বা কোভাডঙ্গা (Covadonga) নামক একটি জনপদ অবিজিত থেকে গিয়েছিল। দুর্গমতা ও প্রচণ্ড শীতলতার কারণে মুসলিম অভিযাত্রীদল এলাকাটি জয় করার জন্য বিশেষ চেষ্টাও করেনি। পরবর্তী সময়ে পরাজিত গোথ বাহিনীর অবশিষ্ট সেনাপতি, সৈন্য ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা নিজেদের আবাসভূমির বিস্তৃতির জন্য উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। আন্দালুসে যখন গোলযোগ ও বিভেদ-বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে, তখন এই খ্রিষ্টানরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং নিজেদের রাষ্ট্রের পরিধি দোরু (The Douro) নদী পর্যন্ত বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়। খ্রিষ্টানরা এ সময় লিওন (Leon) নগরী দখল করে নেয় এবং লিওনকেই নিজেদের রাজধানী নির্বাচন করে। ইতিপূর্বে আবদুল মালিক বিন কাতান ফিহরির শাসনামলে আরবদের কাছে পরাজিত হয়ে বার্বাররা যেসব অঞ্চল ছেড়ে চলে গিয়েছিল, খ্রিষ্টানরা ধীরে ধীরে সেসব অঞ্চলও দখল করে নিজেদের রাষ্ট্রসীমা বিস্তৃত করতে থাকে। দ্য গ্রেট উপাধিধারী ৩য় আলফোন্সো[৩২] (Alfonso III) যখন লিওন রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন খ্রিষ্টানরা সামুরা (Zamora) নগরীও দখল করে নেয় এবং নগরীটিকে সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করে। তখন থেকে পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের খ্রিষ্টান ভূমিতে অভিযানের সময় সামুরা নগরী লিওন সাম্রাজ্যের দুর্গ ও প্রতিরোধকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। মুসলমানরা অনেকবার এ নগরীটিতে অভিযান পরিচালনা করে এবং একাধিকবার নগরীটি ধ্বংস করে দেয়। খ্রিষ্টানরাও বারবার সংস্কার করে সামুরা

---

৩২. শাসনকাল ২৫২-২৯৭ হিজরি (৮৬৬-৯১০ খ্রিষ্টাব্দ)।

নগরীকে নিজেদের নিরাপত্তায় ব্যবহার করতে থাকে। এ কারণেই মুসলমানদের কাছে সামুরা নগরীর নাম ছিল 'বিধ্বস্ত সামুরা'।

সারকথা—৩য় আলফোন্সোর শাসনামলের শেষদিকে খ্রিষ্টান লিওন রাষ্ট্রের সীমানা দোরু নদী পর্যন্ত পৌঁছে যায়; বরং দোরু নদীর দক্ষিণে অবস্থিত পশ্চিমে প্রলম্বিত অঞ্চল পর্যন্ত লিওন রাষ্ট্র বিস্তৃত হয়।

অপরদিকে আন্দালুসের (উচ্চ সীমান্ত নামে পরিচিত) উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বিখ্যাত এব্রো (The Ebro) নদী ও তার শাখানদীসমূহ এবং পিরেনিজ পর্বতমালার মধ্যবর্তী অঞ্চলে যেসব খ্রিষ্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলো মূলত দক্ষিণ দিক (জারাগোজা) থেকে ইসলামি অভিযানের শিকার হওয়ার ভয়ে পাহাড়ি অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। এসব রাষ্ট্রের উত্তর সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চল ছিল খ্রিষ্টান ইউরোপের অংশ। তাই এই রাষ্ট্রগুলো পোপ ও ক্যাথলিক বিশ্বের সঙ্গে সার্বক্ষণিক সম্পর্ক বজায় রাখত। এসব খ্রিষ্টান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রবিস্তৃতির কোনো আগ্রহ ছিল না, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষও ছিল না।

আলোচ্য সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী খ্রিষ্টান রাষ্ট্র ছিল নাফার (Navarre) রাজ্য[৩৩]। নাফারের অধিপতি স্যাঞ্চো তার রাজত্বের সীমানা বৃদ্ধি করতে করতে মুসলমানদের সুরক্ষিত দুই দুর্গ লেইদা (Lleida) ও ওয়েস্কা (Huesca) নগরী পর্যন্ত বিস্তৃত করতে সক্ষম হন।

কাজেই একক আন্দালুস রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টার পাশাপাশি সীমান্ত অঞ্চলের খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখাও আবদুর রহমানের কর্তব্য ছিল। খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলো যেন ইসলামি সাম্রাজ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াতে না পারে এবং ইসলামি ভূখণ্ডের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে সাহস না পায় এ উদ্দেশ্যে ৩০৫ হিজরি সনে আবদুর রহমান খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। প্রায় চৌত্রিশ বছর পর ৩৩৯ হিজরি সনে তিনি পরিস্থিতি পুরোপুরি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। কারও সঙ্গে সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে, আবার কারও ক্ষেত্রে শক্তি

---

[৩৩]. **নাফার :** নাফার রাষ্ট্রের অবস্থান ছিল আধুনিক মানচিত্রের বাসকিউ অঞ্চলজুড়ে। প্রায় বিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের বাসকিউ অঞ্চল (The Basque Country) স্পেন ও ফ্রান্সের সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত। অঞ্চলটি দীর্ঘদিন যাবৎ স্পেন ও ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের জন্য আন্দোলন করে আসছে।

প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে বশীভূত করেন। আর এ সবকিছু তিনি এমন বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে সম্পাদন করেন যে, খ্রিষ্টান শাসকগণ তাকে একজন শত্রু নয় বরং বন্ধুরূপে বিবেচনা করত। এমনকি নিজেদের পারস্পরিক বিরোধ-সংঘাতে তারা আবদুর রহমান আন-নাসিরকে বিচারক ও মীমাংসাকারী মানত। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

নাফারের শাসক স্যাঞ্চো (Sancho) এ সময় অতি স্থূলতার রোগে আক্রান্ত হন। তিনি তখন আবদুর রহমান আন-নাসিরকে তার চিকিৎসার জন্য কর্ডোভা থেকে একজন চিকিৎসক পাঠাতে অনুরোধ করেন। আবদুর রহমান তখন তার চিকিৎসার জন্য আন্দালুসের অভিজ্ঞ ইহুদি চিকিৎসক হাসদাই বিন শাবরুত (Hasdai ibn Shaprut)-কে নাফারে প্রেরণ করেন। কিছুদিন পর আবদুর রহমানকে কৃতজ্ঞতা জানাতে স্বয়ং স্যাঞ্চোর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল কর্ডোভায় আগমন করে। আবদুর রহমান প্রতিনিধিদলের যথেষ্ট সমাদর করেন এবং স্যাঞ্চোর চিকিৎসার জন্য সাম্রাজ্যের অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের একত্র করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের মাঝে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং মুসলমানরা আন্দালুস-লিওন সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দুর্গের অধিকার লাভ করে।

অপর দুই খ্রিষ্টান রাষ্ট্র লিওন ও অ্যারাগোন (Aragon)-এর অধিপতিরাও ইসলামি আন্দালুস রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করতে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। এভাবে দীর্ঘ কয়েক বছরের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের পর আবদুর রহমান পুরো আন্দালুস উপদ্বীপে মুসলমানদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

নিজেকে খলিফাতুল মুসলিমিন ঘোষণা

আবদুর রহমানের শাসনামলেই মাগরিবে উবায়দি সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে। উবায়দি শাসকপরিবার নিজেদের রাষ্ট্রকে ইসলামি খিলাফত দাবি করত এবং সমগ্র ইসলামি বিশ্বকে নিজেদের বশীভূত করার স্বপ্ন লালন করত। তারা আন্দালুসের শাসক আবদুর রহমানকেও হুমকি প্রদান করত। যেহেতু মুসলমানদের অন্তরে খলিফা পদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে, তাই আবদুর রহমান ৩১৬ হিজরি সনের রমজান মাসে (৯২৮

খ্রিষ্টাব্দে) নিজেকে 'খলিফাতুল মুসলিমিন' ঘোষণা করেন। তার এ ঘোষণা ছিল উবায়দি শত্রুর বিরুদ্ধে তাদেরই অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর।

আবদুর রহমান আন-নাসিরের শাসনামলেই ৩২৫ হিজরি সনে কর্ডোভা থেকে সাত কিলোমিটার দূরে গোয়াডেল কুইভার নদীর উত্তর তীরে আয-যাহরা নগরীর নির্মাণ শুরু হয়। দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর আবদুর রহমানের পুত্র হাকামের শাসনামলে নগরীটির নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। সমকালীন পর্যটক ঐতিহাসিকগণের সাক্ষ্য অনুযায়ী আয-যাহরা নগরী ছিল ভূপৃষ্ঠে মানুষের নির্মিত অন্যতম বিস্ময়কর নিদর্শন।

তার শাসনামলে কর্ডোভা নগরীর আয়তন ব্যাপক সম্প্রসারিত করা হয়। প্রায় পাঁচ লক্ষ নাগরিক অধ্যুষিত কর্ডোভা তখন জনসংখ্যার বিচারে বাগদাদের পর সমকালীন বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জনবহুল শহরে পরিণত হয়।

তার শাসনামলে কৃষিব্যবস্থাতেও যুগান্তকারী উন্নয়ন সাধিত হয়। আন্দালুসে এ সময় ধান, আখ, জলপাই, শণসহ বিভিন্ন প্রজাতির ফল ও ফসলের চাষ হতো। তিনি রেশম পোকার প্রজনন ও প্রতিপালনের জন্য বিশেষ কয়েকটি খামার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ফসলের ক্ষেতে নিরবচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে সুশৃঙ্খল সেচব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন।

আবদুর রহমান আন-নাসির চাষাবাদের জন্য মৌসুমভিত্তিক ক্যালেন্ডারেরও প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন খনিজ ধাতু যেমন স্বর্ণ, রুপা ও তামা ইত্যাদি আহরণের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। চামড়াজাত শিল্প, জাহাজনির্মাণ শিল্প, চাষাবাদের যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তিনি বেশ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তার শাসনামলে ওষুধশিল্পও বেশ উন্নতি সাধন করেছিল।

বাহাত্তর বছরের সংগ্রামী জীবন শেষে ৩৫০ হিজরির রমজান মাসে (৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে) আন্দালুস ইতিহাসের এই মহান শাসক ইন্তেকাল করেন।

আল্লামা যাহাবি রহ. তার সম্পর্কে বলেছেন—

> তিনি ছিলেন সাহসী, বীর, বিচক্ষণ, উদারমনা ও সুমহান চরিত্রের অধিকারী। আন্দালুসে তার প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত তিনি জবরদখলকারীদের মূলোৎপাটনে সচেষ্ট ছিলেন। তার শাসনামলে আন্দালুসে যেভাবে আলিম-উলামা ও জ্ঞানী-

গুণীদের সমাবেশ ঘটেছিল, তা অন্য কারও আমলে হয়নি। তিনি গুরুত্বপূর্ণ, বিশাল ও ঐতিহাসিক অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।[৩৪]

সাফাদি রহ. তার সম্পর্কে লিখেছেন—

আবদুর রহমান আদ-দাখিলের পর সমরে নিপুণ, সিদ্ধান্তে নিখুঁত এবং বিপদ ও ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সদা অগ্রসর তার মতো আর কেউ আসেনি। তিনি লক্ষ্য বাস্তবায়ন করে তবেই ক্ষান্ত হতেন। তিনি যেভাবে সৈন্যবাহিনীকে সুবিন্যস্ত করেছেন, ইতিপূর্বে কেউ তা করে দেখাতে পারেনি। তিনি জ্ঞানীদের সম্মান করতেন, কাজি ও বিচারক নির্বাচনে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করতেন। তিনি অত্যন্ত ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন; কেবল যথাযথ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় সম্পদ খরচ করতেন।[৩৫]

২. হাকাম আল-মুসতানসির বিল্লাহ বিন আবদুর রহমান আন-নাসির

[৩৫০-৩৬৬ হিজরি—৯৬১-৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ]

হাকাম বিন আবদুর রহমানের জন্ম ৩০২ হিজরি সনে (৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে) কর্ডোভায়। সাতচল্লিশ বছর বয়সে তিনি তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন।

হাকাম নিজে আলিম ও জ্ঞানপিপাসু ছিলেন এবং জ্ঞানী-গুণী ও আলিমসমাজের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। জনৈক ঐতিহাসিক তার সম্পর্কে বলেন, 'হাকাম ছিলেন 'বইপোকা'।'[৩৬]

পার্শ্ববর্তী খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলোর শাসকশ্রেণি হাকামকে কোমল ও নমনীয় মনে করেছিল। তাই তারা সন্ধিচুক্তিতে উল্লেখিত সীমান্তবর্তী বিভিন্ন দুর্গ

---

৩৪. যাহাবি, *তারীখুল ইসলাম*, ২৫/২৩৭।

৩৫. সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল ওয়াফাইয়াত*, ১৮/১৩৭।

৩৬. ইবনুল খতিব রহ. তার সম্পর্কে বলেছেন—তিনি ছিলেন আলিম, ফকিহ, মাজহাবসমূহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী, কুলজিশাস্ত্রের ইমাম, ইতিহাসের হাফেজ, গ্রন্থপ্রেমী ও প্রচুর গ্রন্থ সংগ্রহকারী, যুগ ও প্রজন্ম এবং দেশ ও সময়কালের বিবেচনায় মনীষীদের পার্থক্য নিরূপণশাস্ত্রে সুদক্ষ। এ শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জনের জন্য তিনি যথেষ্ট একাগ্রতার সঙ্গে অধ্যয়ন করতেন এবং অনুসন্ধিৎসু থাকতেন। আর তাই এ বিষয়ে তিনি আদর্শ বলে বিবেচিত হতেন এবং এ বিষয়ে তার মন্তব্যকে হুজ্জত ও দলিল বিবেচনা করা হতো। দেখুন : ইবনুল খতিব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃষ্ঠা : ৪১।

সমর্পণে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু হাকাম তাদেরকে সামান্য সুযোগ না দিয়ে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং এমন সমুচিত শিক্ষা প্রদান করেন যে, তারা চুক্তি বাস্তবায়নে বাধ্য হয়।

হাকামের শাসনামলে আন্দালুসের বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনের পরিস্থিতি

হাকাম দুর্লভ বিভিন্ন গ্রন্থের হস্তলিখিত মূল কপি সংগ্রহ করার জন্য কয়েকজন কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। কর্মকর্তাগণ ইসলামি প্রাচ্যের বিভিন্ন ভূখণ্ডে সফর করে বিভিন্ন শাস্ত্র ও সাহিত্যের দুর্লভ রচনাবলি ক্রয় করে নিয়ে আসত। কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল—কোনো গ্রন্থের মূল্য যত অধিকই হোক না কেন, তা সংগ্রহ করতেই হবে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন ও মাক্কারির হিসাবমতে কর্ডোভায় হাকামের নির্মিত গ্রন্থাগারে প্রায় চার লক্ষ গ্রন্থ ছিল। হাকাম তার সংগ্রহশালার সব গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন এবং তাতে বিভিন্ন টীকা-টিপ্পনী যুক্ত করতেন। তার টীকা ও সংযুক্তিগুলো বোদ্ধামহলের দৃষ্টিতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জ্ঞানগর্ভ বিবেচিত ছিল।

গ্রন্থ সংগ্রহের পাশাপাশি হাকাম ইসলামি বিশ্ব থেকে প্রথিতযশা আলিমদেরকেও কর্ডোভায় সমবেত করেন। তার শাসনামলেই কর্ডোভা মসজিদ বিশ্ববিদ্যালয় মানের শিক্ষাঙ্গনে রূপান্তরিত হয়। সেখানে বিভিন্ন শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ আলিমগণ নানা বিষয়ে পাঠদান করতেন।

হাকাম কর্ডোভা ও অন্যান্য নগরীতে প্রচুর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। দরিদ্র শিক্ষার্থীগণ এসব প্রতিষ্ঠানে বিনা খরচে পড়াশোনা করত। এ ছাড়াও অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জন ব্যাপক ও সহজতর করার লক্ষ্যে তিনি আল-হাকাম গ্রন্থাগারের পাশাপাশি কর্ডোভা ও অন্যান্য নগরীতে অনেকগুলো গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন।

বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনের প্রতি এই মনোনিবেশের কারণে খলিফা হাকাম আল-মুসতানসির রাষ্ট্রের প্রশাসনিক বিষয়াদির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব উজির ও সেনাপতিদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়াদি তার হাজিব ও রাজপ্রহরী জাফর মিসহাফি দেখাশোনা করতেন এবং যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতেন। একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত তিনি খলিফার দ্বারস্থ হতেন না।

একই কারণে হাকাম তার পুত্র হিশামকে খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলারও সুযোগ পাননি। অন্তিম শয্যায় তিনি এ বিষয়ে চিন্তিত হন এবং পুত্রের পরিণতি নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। তখন তিনি সাম্রাজ্যের হাজিব, উজির, পদস্থ কর্মকর্তা ও সেনাপতিদের সমবেত করেন এবং সকলের কাছ থেকে তার অবর্তমানে হিশামকে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত করা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাকে সহায়তা করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন।

তার মৃত্যুর পর হিশাম খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু ক্ষমতা কার্যত চলে যায় উমাইয়া রাজপরিবারের বাইরে মুহাম্মাদ বিন আবু আমির নামক জনৈক উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির হাতে। বলা যায়, হাকামের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কার্যত আন্দালুসে উমাইয়া শাসনের সমাপ্তি ঘটে। হাকামের পর যারা খলিফা হয়েছিলেন, তারা ছিলেন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাহীন ছায়াশাসক। অবশেষে ৪২২ হিজরি সনে (১০৩১ খ্রিষ্টাব্দে) কাগজে-কলমেও আন্দালুসে উমাইয়া শাসনের পতন ঘটে।

খলিফা হাকাম আল-মুসতানসির চুয়াত্তর বছর বয়সে ৩৬৬ হিজরি সনে (৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন।

হাজিব পদবিধারী আমিরিয়া পরিবারের কর্তৃত্বের কাল

[৩৬৬-৩৯৯ হিজরি—৯৭৬-১০০৯ খ্রিষ্টাব্দ]

২য় হিশাম বিন হাকাম বিন আবদুর রহমান আন-নাসির

[৩৬৬ হিজরি-অজ্ঞাতকাল—৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ-অজ্ঞাতকাল]

২য় হিশাম ৩৫৪ হিজরি সনে (৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে) কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র এগারো বছর বয়সে তিনি খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন এবং মুআইয়াদ বিল্লাহ উপাধি ধারণ করেন।

হিশামের পিতা হাকামের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ দু-দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক পক্ষে ছিল সাম্রাজ্যের সামরিক অংশ[৩৭]। তারা কিশোর হিশামকে রাষ্ট্র পরিচালনার অনুপযুক্ত বিবেচনা করে তার চাচা মুগিরা বিন আবদুর রহমান আন-নাসিরকে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল।

আরেক পক্ষে ছিল হাজিব মিসহাফি ও কর্ডোভার নিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তাগণ। তাদের চাওয়া ছিল, হিশামই হবেন পরবর্তী খলিফা। কারণ, তাহলে তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

এই দ্বিতীয় দলটিই ষড়যন্ত্র করে মুগিরা বিন আবদুর রহমান আন-নাসিরকে হত্যা করে। হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবু আমির মাআফিরি কাহতানি নামক জনৈক যুবক। তার পূর্বতন পুরুষ আবদুল মালিক আল-মাআফিরি ছিলেন সেসব মহান আরব অভিযাত্রীর একজন, যারা তারিক বিন যিয়াদের সঙ্গে আন্দালুসে

৩৭. প্রাসাদে রাজপরিবারের একান্ত ও পারিবারিক খেদমত আঞ্জাম দানকারী সাকলাবি পরিচারকগণও এ পক্ষে ছিল।

প্রবেশ করেছিল। তার পূর্বপুরুষগণ বিভিন্ন সময় সেনাবাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের জন্ম আন্দালুসের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত জাযিরাতুল খাযরা (Algeciras) নামক অঞ্চলের এক গ্রামে। পরিণত বয়সে মুহাম্মাদ উচ্চশিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে কর্ডোভায় আগমন করেন এবং কর্ডোভা মসজিদে হাদিস ও সাহিত্যসহ বিভিন্ন শাস্ত্রের জ্ঞানার্জন করেন। সুউচ্চ মনোবল, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সমুন্নত লক্ষ্যের অধিকারী মুহাম্মাদ বিন আবু আমির শিক্ষাসমাপ্ত করার পরই কাজে লেগে যান। তিনি রাজপ্রাসাদের পাশেই একটি দোকান খোলেন এবং আগ্রহী জনসাধারণের অভিযোগ লিখে দেওয়ার কাজ করেন। কর্মদক্ষতা ও অনন্য ব্যক্তিত্বগুণে অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। বিশেষ করে রাজপ্রাসাদের ভৃত্য ও সেবকরা তার ব্যক্তিত্বে অত্যন্ত মুগ্ধ হয় এবং তারাই খলিফা হাকামের প্রিয়তমা দাসী ও হিশামের মা সবাহ বাশকানসিয়ার কাছে মুহাম্মাদের প্রশংসা করে। মুহাম্মাদের প্রতিভার কথা শুনে সবাহ তাকে তার সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। ইবনে আমির এ ক্ষেত্রেও আপন দক্ষতার বহিঃপ্রকাশ ঘটান এবং সবাহকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হন। সবাহ খলিফা হাকামের কাছে ইবনে আমিরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলে খলিফা তাকে এক এলাকার বিচারক পদে নিয়োগ করেন। এভাবে আপন কর্মদক্ষতাগুণে ইবনে আমির রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদ লাভ করতে থাকেন এবং হাকামের শাসনামলের শেষদিকে বিশেষ রাজকীয় পরিচারকদের তত্ত্বাবধায়ক ও উপদেষ্টার পদ লাভ করেন। এরপর যখন হাকাম ইন্তেকাল করেন এবং রাজপ্রাসাদে খিলাফত-সংকট সৃষ্টি হয়, তখন ইবনে আমিরের সামনে তার লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ এসে যায়। আর তা হলো, আন্দালুস রাষ্ট্রের নেতৃত্ব!

মুহাম্মাদ ইবনে আমির একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হতে চেয়েছিলেন। তাই যারা তার লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, প্রথম থেকেই তিনি কৌশল ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাদেরকে সরিয়ে দিতে থাকেন। অবশেষে যখন তিনি আপন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হন এবং আন্দালুসের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হন, তখন থেকেই সাম্রাজ্য ও জনগণের সেবায় আপন যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটান। ইসলামি ইতিহাসে তার চেয়ে অধিক কর্মোদ্যমী কাউকে খুঁজে

পাওয়া যায় না। তিনি রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কাজে দৈনিক বিশ ঘণ্টা ব্যয় করতেন। ইবনে আমির পরবর্তীকালে 'আল-মানসুর' উপাধি ধারণ করেন।

আল-মানসুর সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহে তার আস্থাভাজন লোকদের নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি নিজে তাদের কাজকর্ম তদারকি করতেন। তিনি প্রশাসন ও রাষ্ট্রের ছোট-বড় প্রতিটি বিষয়ে অবগত হওয়ার জন্য প্রচুর গোয়েন্দা নিয়োজিত করেছিলেন।

আল-মানসুর যুদ্ধের ময়দানে নিজেই সেনাপতির দায়িত্ব পালন করতেন। কঠোর শৃঙ্খলাবোধের অধিকারী আল-মানসুর তার সেনাবাহিনীকে অভিনব পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করেছিলেন।

ইবনে আমির আল-মানসুর নিজের বসবাসের জন্য 'আয-যাহিরা' নামে একটি নতুন নগরীর পত্তন করেন। তিনি নগরীটির নিরাপত্তায় পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণের ব্যবস্থা করেন এবং রাষ্ট্রের প্রশাসনিক দপ্তরসমূহ সেখানে স্থানান্তর করেন।

আর খলিফা হিশাম মূলত থেকেও না থাকার মতোই ছিলেন। তিনি প্রাসাদে খেল-তামাশায় ডুবে থাকতেন এবং ভৃত্য, পরিচারক ও দাসীদের সঙ্গে বিনোদনে মত্ত থাকতেন।

খলিফা হিশামের মা সাইয়েদা সবাহ যখন উপলব্ধি করেন যে, ইবনে আমির তার পুত্রকে পাশ কাটিয়ে নিজেই একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসেছেন, তখন তিনি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং ইবনে আমিরের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব শেষ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় নেন।

প্রথমে তিনি আন্দালুসের ওপারের মাররাকিশ অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং আল-মানসুরকে পরাভূত করার জন্য তাদেরকে বাহিনী প্রেরণ করার অনুরোধ করেন। মাররাকিশের নেতৃবৃন্দ এর বিনিময়ে প্রচুর অর্থ দাবি করলে তিনি শুভেচ্ছা উপহারের নাম দিয়ে অর্থসম্পদ প্রেরণ করেন। কিন্তু আল-মানসুর বিষয়টি বুঝে ফেলেন এবং যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। ফলে সাইয়েদা সবাহের ষড়যন্ত্র-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এরপর সবাহ তাকে আরেক পদ্ধতিতে পাকড়াও করার চেষ্টা চালান। তিনি রাষ্ট্রের আলিমসমাজকে এই বলে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেন যে, ইবনে

আমির আন্দালুসের বৈধ ও শরিয়ত নির্ধারিত খলিফার ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করছে। অল্প কদিনেই কর্ডোভার জনগণের মুখে মুখে এ কথা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আল-মানসুর ছিলেন অত্যন্ত চতুর ও কৌশলী। তিনি অনতিবিলম্বে খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও হৃদ্যতা প্রদর্শন করেন। ইবনে আমিরের চাতুর্য উপলব্ধি করার মতো বোধ ও জ্ঞান হিশামের ছিল না। তিনি ইবনে আমিরের আচরণ-উচ্চারণে যথেষ্ট প্রভাবিত হন। এরপর ইবনে আমির খলিফাকে প্ররোচিত করে তাকে নিয়ে কর্ডোভার রাজপথে পরিভ্রমণে বের হন। জনসাধারণ যখন দেখতে পায় যে, খলিফা তার হাজিবকে সঙ্গ দিচ্ছেন এবং তার সঙ্গে প্রশান্ত মনে ঘোরাফেরা করছেন, তখন জনগুঞ্জন ও সমালোচনার আওয়াজ স্তিমিত হয়ে আসে।

এরপর বিরুদ্ধবাদীরা তাকে দমন করার জন্য আরেক কৌশলের আশ্রয় নেয়। তারা কর্ডোভাজুড়ে রটিয়ে দেয় যে, আল-মানসুর একজন ধর্মদ্রোহী ও ধর্মবিরোধী ব্যক্তি। আল-মানসুর এ অপবাদ থেকেও নিজেকে নিষ্কলুষ প্রমাণ করেন। তিনি রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ফকিহগণকে সমবেত করে অনুরোধ করেন যে, তারা যেন হাকামের গ্রন্থাগারে দ্বীনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়—এমন যত গ্রন্থ আছে, সেগুলো বাছাই করে। ফকিহগণ সেগুলো বাছাই করলে তিনি সেসব গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলেন। এর ফলে আলিম ও ফকিহ সমাজে ধন্য ধন্য রব পড়ে যায় এবং তাদের কাছে আল-মানসুরের মর্যাদা সমুন্নত হয়। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে, দর্শনশাস্ত্র-বিরোধী ফকিহগণের এই পদক্ষেপের ফলে দর্শন শাস্ত্রের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

আল-মানসুর তার শাসনামলের পুরোটা সময় নিয়ম করে প্রতিবছর দু-বার বসন্ত ও শরতে খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। তিনি নিজেই যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। পঁচিশ বছর ব্যাপ্ত শাসনামলে তিনি পঞ্চাশের অধিক যুদ্ধে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও একটি যুদ্ধেও পরাজিত হননি। রণাঙ্গনে তার এই অনন্যসাধারণ নিপুণতা ও সার্বক্ষণিক ব্যস্ততা তার প্রতি জনগণের সমর্থন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

আল-মানসুর ৩৯২ হিজরি সনে (১০০২ খ্রিষ্টাব্দে) খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এক অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় সালিম নগরীর কাছে

মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে উত্তরের খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবদুল মালিক 'আল-মুযাফফার' উপাধি ধারণ করে হাজিব পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি সাত বছর আন্দালুস শাসন করেন। তার শাসনামল ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও ছিল শান্ত ও শৃঙ্খলাপূর্ণ। পিতার ন্যায় তিনিও নিয়ম করে বছরে দু-বার খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলোতে অভিযান পরিচালনা করতেন এবং ক্রুসেডারদের ব্যতিব্যস্ত রাখতেন।

ঐতিহাসিক মাক্কারি রহ. *'নাফহুত তীব'* গ্রন্থে আবদুল মালিক আল-মুযাফফার সম্পর্কে লিখেছেন—

> তিনি প্রশাসন পরিচালনা ও সমরনীতির ক্ষেত্রে আপন পিতার আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। তার সাত বছরের শাসনামলকে আনন্দ ও সুখের কাল বলে গণ্য করা হয়েছিল এবং সাবিউল আ'রুস[৩৮]-এর সঙ্গে তুলনা করে এ সময়কালকে সাবি' নামকরণ করা হয়েছিল। উপাধি যেমন মুযাফফার, বাস্তবেও তিনি ছিলেন মুযাফফার ও সফল।[৩৯]

৩৯৯ হিজরি সনে (১০০৮ খ্রিষ্টাব্দে) আবদুল মালিকের মৃত্যু হলে তার ভাই আবদুর রহমান তার স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু আবদুর রহমান তার পিতা আল-মানসুর ও ভ্রাতা আল-মুযাফফার থেকে সম্পূর্ণই ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে উদাসীন থাকতেন, ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকতেন। তার পিতা ও ভাই যে ক্ষমতা অর্জনের স্বপ্ন দেখেননি, তিনি তা-ও লাভ করতে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। যদিও রাষ্ট্রের কার্যকরী ক্ষমতা তার হাতেই ছিল; কিন্তু তিনি তাতেই সন্তুষ্ট না হয়ে কাগজে-কলমেও রাষ্ট্রের অধিকর্তা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন এবং খলিফা পদ থেকে উমাইয়া রাজপরিবারকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই খলিফা হওয়ার মনস্থ করেন। তিনি হিশাম-পরবর্তী খলিফা হিসেবে তার নাম ঘোষণা করতে খলিফা হিশামকে চাপপ্রয়োগ করেন।

---

৩৮. আরব দেশগুলোতে বিয়ের সাতদিন পর নববধূকে নিয়ে আয়োজিত এক ধরনের আনন্দ উৎসবকে সাবিউল আ'রুস বলা হয়।

৩৯. মাক্কারি, *নাফহুত তীব*, ১/৪২৩।

আবদুর রহমানের এই পদক্ষেপ আরব মুযারিদের মাঝে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। খিলাফতের দায়িত্ব কুরাইশদের হাত থেকে ইয়ামেনি (কাহতানি) বংশের হাতে চলে যাবে, এটা তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। একে কেন্দ্র করে নতুন করে আন্দালুসে সাম্প্রদায়িক সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আবদুর রহমান আন্দালুসের উত্তরাঞ্চলে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হলে তার অনুপস্থিতির সুযোগে উমাইয়া ও মুযারিরা একজোট হয়ে হিশামকে সিংহাসনচ্যুত করে এবং তার স্থলে মুহাম্মাদ বিন হিশাম বিন আবদুল জাব্বার বিন আবদুর রহমান আন-নাসির নামক খলিফা আন-নাসিরের জনৈক প্রপৌত্রকে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত করে। তিনি মাহদি বিল্লাহ উপাধি ধারণ করেন।

আবদুর রহমান এ সংবাদ পাওয়ামাত্র যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে কর্ডোভার উদ্দেশে রওনা হন। পথে ধীরে ধীরে তার বাহিনীর সৈন্যরা তাকে ত্যাগ করে সটকে পড়তে থাকে। একপর্যায়ে তিনি প্রায় সঙ্গীহারা হয়ে পড়েন। অব্যবহিত পরেই প্রতিপক্ষের জনৈক ব্যক্তি তাকে পাকড়াও করে হত্যা করে এবং তার ছিন্ন মস্তক মাহদি বিল্লাহর কাছে নিয়ে যায়। আবদুর রহমানের মৃত্যুর মাধ্যমে আন্দালুসে বনু আমিরের কর্তৃত্বেরও সমাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয়বার বিভক্তি এবং আন্দালুসে উমাইয়া শাসনের পতনের কাল

[৩৯৯-৪২২ হিজরি—১০০৯-১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ]

বিগত প্রায় তিন শতাব্দীকালে যে কজন শাসক আন্দালুস শাসন করেছেন, তাদের চেয়েও অধিক সংখ্যক উমাইয়া খলিফা মাত্র তেইশ বছরের এই সময়কালে আন্দালুসের খিলাফত দায়িত্ব পালন করেন। এ তথ্য দ্বারাই অনুমান করা যায় যে, আন্দালুস তখন চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতি মোকাবিলা করছিল এবং আসন্ন দুর্যোগের প্রহর গুনছিল। বারবার খলিফা পরিবর্তনে একদিকে যেমন খিলাফতের প্রভাবশক্তি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল, অপরদিকে আন্দালুসের ইসলামি সাম্রাজ্য আবারও বিভক্তি ও ভাঙনের শিকার হয়েছিল। ধ্বংসাত্মক সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও গোত্রকেন্দ্রিক চেতনা এ সময় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেতে থাকে।

এরচেয়েও নিকৃষ্ট ও দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে—বিভক্ত প্রতিটি গোত্র ও গোষ্ঠী এ সময় প্রতিপক্ষকে পরাভূত করার জন্য উত্তরের খ্রিষ্টান রাজ্যগুলোর সাহায্যপ্রার্থনা করত। খ্রিষ্টানরাও সোৎসাহে তাদের আহ্বানে সাড়া দিত এবং এর বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ভূখণ্ড ও সামরিক দুর্গের নিয়ন্ত্রণ বুঝে নিত।

অবশেষে ৪২২ হিজরি সনে (১০৩১ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফা মুতামিদ বিল্লাহর পতনের মধ্য দিয়ে আন্দালুসে উমাইয়া সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

মুতামিদ বিল্লাহর অন্তর্ধানের পর উমাইয়া রাজপরিবারে খিলাফতের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত কেউ না থাকায় তৎকালীন উজির ও বিচারপতি আবুল হায্‌ম ইবনুল জাহওয়ার আন্দালুসে খিলাফতব্যবস্থার সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে, এখন থেকে একটি উজিরপর্ষদ রাষ্ট্রের প্রশাসনদায়িত্ব পালন করবে। ইবনুল জাহওয়ার কর্তৃক গৃহীত এই

শুরাভিত্তিক শাসনব্যবস্থা ছিল অনেকটা আধুনিক যুগের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কাছাকাছি।

আন্দালুস ইতিহাসের এই স্তরের সমাপ্তি ঘটতেই আন্দালুস রাষ্ট্র আবারও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একেকটি অঞ্চলের প্রশাসক নিজেকে স্বাধীন শাসক দাবি করে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। আন্দালুস প্রবেশ করে এক নতুন যুগে; যে যুগের নাম—তাইফা (বিভক্ত) শাসকদের যুগ।

আন্দালুসের উমাইয়া শাসকগণের তালিকা

১.	(১ম) আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া বিন হিশাম আবুল মুতাররাফ আদ-দাখিল	:	১৩৮-১৭২ হি. (৭৫৫-৭৮৮ খ্রি.)
২.	(১ম) হিশাম বিন (১ম) আবদুর রহমান আবুল ওয়ালিদ আর-রিযা	:	১৭২-১৮০ হি. (৭৮৮-৭৯৬ খ্রি.)
৩.	(১ম) হাকাম বিন (১ম) হিশাম আবুল আছ আর-রাবাযি	:	১৮০-২০৬ হি. (৭৯৬-৮২১ খ্রি.)
৪.	(২য়) আবদুর রহমান বিন হাকাম বিন হিশাম আবুল মুতাররাফ আল-আওসাত	:	২০৬-২৩৮ হি. (৮২১-৮৫২ খ্রি.)
৫.	(১ম) মুহাম্মাদ বিন (২য়) আবদুর রহমান আবু আবদুল্লাহ	:	২৩৮-২৭৩ হি. (৮৫২-৮৮৬ খ্রি.)
৬.	মুনযির বিন (১ম) মুহাম্মাদ আবুল হাকাম	:	২৭৩-২৭৫ হি. (৮৮৬-৮৮৯ খ্রি.)
৭.	আবদুল্লাহ বিন (১ম) মুহাম্মাদ আবুল হাকাম	:	২৭৫-৩০০ হি. (৮৮৯-৯১৩ খ্রি.)

৮.	(৩য়) আবদুর রহমান বিন (২য়) মুহাম্মাদ আবুল মুতাররাফ আন-নাসির লি দ্বীনিল্লাহ[৪০]	:	৩০০-৩৫০ হি. (৯১৩-৯৬১ খ্রি.)
৯.	(২য়) হাকাম বিন (৩য়) আবদুর রহমান আল-মুসতানসির বিল্লাহ	:	৩৫০-৩৬৬ হি. (৯৬১-৯৭৬ খ্রি.)
১০. (ক)	হিশাম বিন (২য়) হাকাম আবুল ওয়ালিদ মুআইয়াদ বিল্লাহ	:	৩৬৬-৩৯৯ হি. (৯৭৬-১০০৯ খ্রি.)
১১.	মুহাম্মাদ (মাহদি বিল্লাহ) বিন হিশাম বিন আবদুল জাব্বার বিন আবদুর রহমান আন-নাসির	:	৩৯৯-৪০০ হি. (১০০৯-১০০৯ খ্রি.)
১২. (ক)	সুলায়মান (মুসতাইন বিল্লাহ) বিন হাকাম বিন সুলায়মান বিন আবদুর রহমান আন-নাসির	:	৪০০-৪০০ হি. (১০০৯-১০১০ খ্রি.)
১০. (খ)	হিশাম বিন (২য়) হাকাম আবুল ওয়ালিদ মুআইয়াদ বিল্লাহ[৪১]	:	৪০০-৪০৩ হি. (১০১০-১০১৩ খ্রি.)
১২. (খ)	সুলায়মান (মুসতাইন বিল্লাহ) বিন হাকাম বিন সুলায়মান বিন আবদুর রহমান আন-নাসির	:	৪০৩-৪০৭ হি. (১০১৩-১০১৬ খ্রি.)

৪০. আবদুর রহমান আন-নাসির লি দ্বীনিল্লাহ ৩১৬ হিজরি সনে নিজেকে 'খলিফাতুল মুসলিমিন' ঘোষণা করেন। তাই তার পূর্ববর্তী সাতজন শাসককে আমির বা প্রশাসক বলা হতো আর পরবর্তীদেরকে খলিফাতুল মুসলিমিন বলা হতো।

৪১. দশম ও দ্বাদশ শাসক দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন।

১৩.	আলি বিন হামুদ আবুল হাসান[৪২]	:	৪০৭-৪০৮ হি. (১০১৬-১০১৭ খ্রি.)
১৪.	(৪র্থ) আবদুর রহমান (মুরতাযি বিল্লাহ) বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আন-নাসির	:	৪০৮-৪০৯ হি. (১০১৭-১০১৮ খ্রি.)
১৫.	কাসিম বিন হামুদ আবু মুহাম্মাদ	:	৪০৯-৪১৪ হি. (১০১৮-১০২৩ খ্রি.)
১৬.	(৫ম) আবদুর রহমান (মুসতাযহির বিল্লাহ) হিশাম বিন আবদুল জাব্বার বিন আন-নাসির	:	৪১৪-৪১৪ হি. (১০২৩-১০২৪ খ্রি.)
১৭.	মুহাম্মাদ (মুসতাকফি) বিন আবদুর রহমান বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আন-নাসির	:	৪১৪-৪১৬ হি. (১০২৪-১০২৫ খ্রি.)
১৮.	ইয়াহইয়া বিন আলি বিন হামুদ আবু যাকারিয়া	:	৪১৬-৪১৭ হি. (১০২৫-১০২৬ খ্রি.)
১৯.	হিশাম মুতামিদ আলাল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবদুর রহমান আন-নাসির	:	৪১৭-৪২২ হি. (১০২৬-১০৩১ খ্রি.)

৪২. ত্রয়োদশ, পঞ্চদশ ও অষ্টাদশ শাসক উমাইয়া রাজপরিবারের সদস্য ছিলেন না; বরং মাগরিবের বার্বার বংশোদ্ভূত ছিলেন।

গোষ্ঠীভিত্তিক বিভক্ত রাষ্ট্রশাসকদের শাসনকাল

[৪২২-৪৮৪ হিজরি—১০৩১-১০৯১ খ্রিষ্টাব্দ]

এ স্তরে আন্দালুস ভূমি অঞ্চলকেন্দ্রিক খণ্ড খণ্ড বিভক্ত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। একে তাইফা (বিভক্ত) শাসকদের যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

উমাইয়া শাসনব্যবস্থার পতন ঘটতেই আন্দালুসের প্রতিটি নগরী ও অঞ্চলের গভর্নর ও প্রশাসকগণ নিজেদের অঞ্চলকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করে এবং নিজেদেরকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন শাসক দাবি করে। দক্ষিণাঞ্চল চলে যায় বার্বারদের দখলে আর পূর্বাঞ্চল চলে যায় সাকলাবিদের দখলে। অন্যান্য অঞ্চলও বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী পরিবার বা বিগত কয়েক বছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকারী নতুন কোনো পরিবারের কর্তৃত্বে চলে যায়। এ সময় প্রায় বিশটি পরিবার ইসলামি আন্দালুসের বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করে। শক্তি ও ক্ষমতা এবং খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির বিচারে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

- সেভিল অঞ্চল শাসনকারী বনু আব্বাদ পরিবার। বনু আব্বাদ ছিল আন্দালুসে বসতি স্থাপনকারী লাখমি আরবদের বংশোদ্ভূত।
- গ্রানাডা অঞ্চলে বার্বার বনু যিরি পরিবার। সেভিল ও গ্রানাডা অঞ্চল আন্দালুসের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত।
- টলেডোতে আরেক বার্বার গোত্র বনু যিননুন। টলেডো আন্দালুসের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত। বিভক্ত শাসকপরিবারগুলোর মধ্যে বনু যিননুন অন্যদের চেয়ে শক্তিশালী ছিল।
- মালাগা এবং জাযিরাতুল খাযরা অঞ্চলে ইদরিসিয়া বনু হাম্মুদ পরিবার।

- জারাগোজায় বনু হুদ পরিবার। জারাগোজা উত্তর-পূর্ব আন্দালুসে অবস্থিত।

অধিকাংশ শাসকপরিবারই ছিল স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী। অবশ্য ব্যতিক্রমী দু-একজন রাষ্ট্রশাসনে সদাচরণও উপহার দিয়েছেন। তবে প্রায় সব শাসকই ছিলেন সংস্কৃতিমনা, জ্ঞান ও সাহিত্যচর্চার প্রতি অনুরাগী। তাদের প্রাসাদগুলো ছিল কবি-সাহিত্যিক ও জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশস্থল। তাইফা শাসকবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় এমন অনেক সুবিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক ও আলিম-উলামা অতিবাহিত হয়েছেন, আন্দালুস ইতিহাস যাদের নিয়ে গৌরব করে থাকে। শাসকদের মধ্যেও অনেকে আলিম, কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন।

তাইফা যুগের শাসকবৃন্দ আপন আপন রাজপ্রাসাদে কবি-সাহিত্যিক ও জ্ঞানীজনদের সমবেত করতে রীতিমত প্রতিযোগিতা করতেন এবং তাদেরকে প্রচুর হাদিয়া প্রদান করতেন। এর ফলে সে যুগে আন্দালুসের বিভিন্ন বিভক্ত রাষ্ট্রের রাজধানীগুলো জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে শাসকবৃন্দের তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতায় আন্দালুসের পরিবেশ সাহিত্য ও কাব্যের পরিবেশে পরিণত হয়।

'*মুজামুল বুলদান*' গ্রন্থকার ইয়াকুত আল-হামাবি (মৃত্যু : ৬২৬ হিজরি) তৎকালীন আন্দালুসের একটি নগরী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন—

> আমি অসংখ্য ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি যে, এই নগরীতে তুমি এমন মানুষ কমই পাবে, যে কবিতা বলতে পারে না বা সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা রাখে না। এমনকি তুমি যদি কৃষিভূমিতে কাজ করা কোনো কৃষকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে কোনো কবিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো, সে-ও তোমার চাহিদামতো বিষয়ে তৎক্ষণাৎ কিছু কবিতা শুনিয়ে দেবে।[৪৩]

---

৪৩. আলোচ্য মন্তব্যটি তিনি করেছিলেন তৎকালীন আন্দালুসের পশ্চিমাঞ্চলীয় নগরী শালব সম্পর্কে। বর্তমানে নগরীটি পর্তুগালের অন্তর্ভুক্ত এবং Silves নামে পরিচিত। দেখুন : ইয়াকুত আল-হামাবি, *মুজামুল বুলদান*, ৩/৩৫৭।

মুসলমানদের পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং খ্রিষ্টানদের রাজ্য বিস্তৃতি

তৎকালীন আন্দালুসের খ্রিষ্টান অংশের প্রতাপশালী নেতা ৬ষ্ঠ আলফোন্সো অ্যারাগোন, লিওন ও ক্যাস্টোলাসহ পুরো খ্রিষ্টান আন্দালুসকে একীভূত করে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের অধিকারী হয়েছিলেন। ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর শাসকগণ উপহারসামগ্রী ও উচ্চমূল্যের কর প্রদান করে আলফোন্সোর সুদৃষ্টি ও সহযোগিতা লাভের প্রতিযোগিতা করত। মুসলিম শাসকবৃন্দের এই নতজানু নীতি এবং ইসলামি আন্দালুসের অস্থিতিশীল ও সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি আলফোন্সোকে ইসলামি ভূখণ্ডের প্রতি লালায়িত করে তোলে এবং তিনি মুসলমানদের কাছ থেকে লাভ করা সম্পদ ব্যবহার করেই ইসলামি ভূমিতে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

আলফোন্সো প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগিয়ে একের পর এক ইসলামি ভূখণ্ডের বিভিন্ন দুর্গ জয় করতে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ৪৭৮ হিজরি সনে (১০৮৫ খ্রিষ্টাব্দে) ইসলামি আন্দালুসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নগরী টলেডো দখল করে নেন। এ ছাড়াও আলফোন্সো আন্দালুসের মধ্যাঞ্চলে লিট দুর্গে বারো হাজারের অধিক নিরাপত্তারক্ষী নিয়োজিত করেন। লিট দুর্গ থেকে খ্রিষ্টান সৈন্যরা বিভিন্ন সময় বেরিয়ে এসে ইসলামি ভূখণ্ডে লুটতরাজ চালাত।

লাঞ্ছনার মাঝে এক টুকরো বীরত্ব-গৌরব!

৬ষ্ঠ আলফোন্সোর অব্যাহত আগ্রাসনে ইসলামি আন্দালুস যখন টালমাটাল, তখনও বিভক্ত রাষ্ট্রসমূহের শাসকবৃন্দ নিজেদের ভূখণ্ড রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, অল্প কদিনের মধ্যেই আলফোন্সো অবশিষ্ট ইসলামি ভূখণ্ডও দখল করে নেবেন আর আন্দালুস উপদ্বীপ থেকে ইসলামের নাম-নিশান চিরদিনের জন্য মুছে যাবে।

এ সময় মুসলিম শাসকবৃন্দ অনুভব করেন যে, প্রণালির ওপারের মুরাবিতি সাম্রাজ্যের শাসক ইউসুফ বিন তাশফিনই পারেন এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে ইসলামি আন্দালুসের সহায়তায় এগিয়ে আসতে। তাই তারা তার কাছে সাহায্যপ্রার্থনার সিদ্ধান্ত নেন। অবশ্য সেভিল ও কর্ডোভার শাসক মুতামিদ বিন আব্বাদকে তার জনৈক উপদেষ্টা এ সিদ্ধান্ত নিতে নিষেধ করে বলেন—'মুরাবিতিদের আন্দালুস উপদ্বীপে অবতরণের সুযোগ

দেওয়া হলে তারা নিজেরাই আন্দালুসের ক্ষমতা দখলে অভিলাষী হয়ে উঠতে পারে।' কিন্তু মুতামিদ তাকে প্রত্যুত্তরে বলেন—

> لَأَنْ أَكُوْنَ رَاعِيَ جِمَالٍ فِيْ صَحْرَاءِ إِفْرِيْقِيَا خَيْرٌ مِنْ أَرْعَى الْخَنَازِيْرَ فِيْ قَشْتَالَةَ.
>
> ক্যাস্টোলায় শূকর চড়ানোর চেয়ে আফ্রিকার মরুভূমিতে উট চড়ানো শতগুণে শ্রেয়।

মুতামিদ বিন আব্বাদ ছিলেন বনু আব্বাদ পরিবারের শেষ শাসক। আরব বংশোদ্ভূত মুতামিদ একজন কবিও ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন অন্যান্য মুসলিম শাসকের ন্যায় তিনিও আলফোন্সোর সঙ্গে নতজানু আচরণ করতেন এবং জিজিয়া-কর ও উপহারসামগ্রী পাঠাতেন। একবার আলফোন্সো মুতামিদের কাছে দাবি জানান যে, তার অন্তঃসত্তা স্ত্রী কর্ডোভা মসজিদে সন্তান প্রসব করবেন এবং কর্ডোভার আয-যাহরা রাজপ্রাসাদে প্রসূতিকালীন অবকাশ যাপন করবেন! কেননা, খ্রিষ্টান চিকিৎসকরা আলফোন্সোকে পরামর্শ দিয়েছে যে, এ সময় তার স্ত্রীর জন্য আয-যাহরার মনোরম আবহাওয়ায় অবস্থান উপকারী হবে; আর ধর্মীয় যাজক ও পাদরিরাও জামে কর্ডোভায় সন্তান-জন্মদান কল্যাণজনক হবে বলে জানিয়েছে! আলফোন্সোর দাবি শোনামাত্র মুতামিদের প্রকৃতিগত আত্মসম্ভ্রমবোধ জেগে ওঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তরবারির এক আঘাতে বার্তাবাহকের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন এবং তার দেহ কর্ডোভায় শূলে চড়িয়ে রাখার নির্দেশ দেন। এরপর মুতামিদের নির্দেশে অন্যান্য দূতদেরকেও হত্যা করা হয়।

সংবাদ পেয়ে আলফোন্সো উন্মাদ হয়ে যান এবং সেভিলে অভিযান চালানোর শপথ করেন। তিনি দুটি বাহিনী প্রস্তুত করে একটি বাহিনীকে বাজা হয়ে সেভিলে পৌঁছার নির্দেশ দেন, আরেকটি বাহিনী নিয়ে নিজেই রওনা হয়ে প্রথম বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হন। আলফোন্সো উভয় বাহিনীকে নিয়ে গোয়াডেল কুইভার নদীর অপর প্রান্তে ইবনে আব্বাদের প্রাসাদের সামনে শিবির স্থাপন করেন। এরপর তিনি ইবনে আব্বাদের কাছে বিদ্রূপাত্মক ভাষায় নিম্নোক্ত বার্তা প্রেরণ করেন—

> মাছির প্রকোপের মাঝে আমার অবস্থান বেশ দীর্ঘায়ত হচ্ছে আর গরম বেশ পড়েছে। তাই তোমার রাজদরবার থেকে আমাকে

> একটি পাখা উপহার পাঠাও, যেন পাখার বাতাসে আরাম পাই এবং মাছিও তাড়াতে পারি।

আত্মমর্যাদাবোধে উদ্দীপ্ত মুতামিদ ইবনে আব্বাদ বার্তা পাঠ করেই উল্টো পিঠে নিম্নোক্ত উত্তর লিখে আলফোন্সোর কাছে পাঠিয়ে দেন—

> হ্যাঁ, তোমার চিঠি পড়েছি এবং তোমার আত্মপ্রসাদ ও আত্মমুগ্ধতা উপলব্ধিও করেছি। আমি শীঘ্রই তোমার যত্ন-আত্তি নেওয়ার জন্য লামতি[৪৪] চামড়ার তৈরি পাখার ব্যবস্থা করছি। দুঃখের বিষয়! সে পাখার বাতাস তোমার প্রশান্তি কেড়ে নেবে, কোনো স্বস্তি দেবে না।

ইবনে আব্বাদ লামতি চামড়া দ্বারা উত্তর আফ্রিকার মুরাবিতি সাম্রাজ্যের কাছে সাহায্যপ্রার্থনার বিষয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন।

---

৪৪. মাগরিবের বিখ্যাত গোত্র লামতা-এর প্রতি সম্বন্ধিত করে বলা হয়েছে। দেখুন : ইয়াকুত আল-হামাবি, *মুজামুল বুলদান*, ৫/২৩।

গোষ্ঠীভিত্তিক বিভক্ত আন্দালুসের উল্লেখযোগ্য শাসকপরিবারের তালিকা

নং	শাসকবংশের নাম	শাসন অঞ্চল	শাসনকাল	
			হিজরি	খ্রিষ্টাব্দ
০১	বনু জাহওয়ার	কর্ডোভা	৪২২-৪৬১	১০৩১-১০৬৯
০২	বনু আব্বাদ	সেভিল	৪১৪-৪৮৪	১০২৩-১০৯১
০৩	বনু আফতাস	বাতালইয়ুস	৪১৩-৪৮৮	১০২২-১০৫৯
০৪	বনু যিননুন	টলেডো	৪২৭-৪৭২	১০৩৬-১০৭৯
০৫	বনু হুদ	জারাগোজা	৪৩১-৫০৩	১০৩৯-১১১০
০৬	বনু যিরি	গ্রানাডা	৪০৩-৪৮৩	১০১৩-১০৯০
০৭	বনু তাহির	মুরসিয়া	৪২৯-৪৭১	১০৩৮-১০৭৮
০৮	বনু বিরযাল	কারমোনা	৪০৪-৪৫৯	১০১৩-১০৬৭
০৯	বনু ইয়াকরান	রুনদা	৪০৬-৪৫৭	১০১৫-১০৬৫
১০	বনু দাম্মার	মুরুর	৪০৩-৪৫৮	১০১৩-১০৬৬
১১	বনু খাযরুন	আরকিশ	৪০২-৪৬১	১০১১-১০৬৮
১২	আমিরি পরিচারক	আলমারিয়া	৪০৫-৪৩৩	১০১৪-১০৪১
১২	বনু ছামাদিহ		৪৩৩-৪৮৪	১০৪১-১০৯১
১৩	আমিরি পরিচারক	দানিয়া ও ব্যালেরিক দ্বীপপুঞ্জ	৪০০-৪৬৮	১০০৯-১০৭৬
১৩	বনু হুদ		৪৬৮-৪৮৩	১০৭৬-১০৯১

নং	শাসকবংশের নাম	শাসন অঞ্চল	শাসনকাল	
			হিজরি	খ্রিষ্টাব্দ
১৪	আমিরি পরিচারক	ভ্যালেন্সিয়া	৪০০-৪৭৮	১০০৯-১০৮৫
১৫	বনু উযিন	পূর্ব সান্তামারিয়া	৪০৩-৪৯৭	১০১২-১১০৪
১৬	বনু হারুন	পশ্চিম সান্তামারিয়া	৪১৭-৪৪৩	১০২৬-১০৫১
১৭	বনু হাম্মুদ	মালাগা ও জাযিরাতুল খাযরা	৪১৭-৪৪৯	১০২৬-১০৫৭
১৮	বনু ইয়াহইয়া	নিয়েবলা	৪১৪-৪৪৫	১০২৩-১০৫৩
১৯	বনু মাযিন	বাজা ও শালব	৪৩২-৪৫৫	১০৪১-১০৬৩
২০	বনু বিকরি	ওয়েলবা	৪০৩-৪৪৩	১০১২-১০৫১

আন্দালুসে মাগরিবকেন্দ্রিক মুরাবিতি শাসনের কাল

[৪৮৪-৫৪১ হিজরি—১০৯১-১১৪৭ খ্রিষ্টাব্দ]

মুরাবিতি সাম্রাজ্য পরিচিতি

হিময়ার গোত্রের প্রতি সম্বন্ধিত বিভিন্ন শাখাগোত্রের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল মুরাবিতি সাম্রাজ্য। শাখাগোত্রগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো লামতুনা, গুদালা, লামতা ইত্যাদি। মুরাবিতি শাসক আমিরুল মুসলিমিন ইউসুফ বিন তাশফিন ছিলেন লামতুনা শাখাগোত্রের সদস্য।

এ সকল গোত্রের সদস্যরা মুসা বিন নুসায়রের সঙ্গে মাগরিবে আগমন করেছিল। এরপর সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদের সঙ্গে তারা তাঞ্জিয়ারে চলে যায়। কিন্তু পরে তারা সংঘবদ্ধ জীবনের পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন জীবনধারাকে বেছে নেয় এবং উচ্চতর মাগরিবের অত্যধিক তাপমাত্রাবিশিষ্ট শুষ্ক ও অনুর্বর মরুভূমি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।

যেহেতু এসব গোত্র সাহারা মরুভূমির গভীরতম অঞ্চলে মাগরিবের একেবারে শেষ প্রান্তে বসবাস করত, তাই 'ইসলাম' নামক প্রদীপের সামান্য আলোকচ্ছটা তাদের জীবনে এলেও ইসলামের সুমহান শিক্ষা, সুসংহত আমল-পদ্ধতি ও আদর্শ জীবনাচার—কিছুই তারা লাভ করেনি; বরং তারা ডুবে ছিল নিজেদের সুপ্রাচীন অজ্ঞতা ও বেদুইন জীবনধারাতে।

৪৪০ হিজরি সনে গুদালা গোত্রের তৎকালীন সর্দার ইয়াহইয়া বিন ইবরাহিম আল-গুদালি হজের সফরে গমন করেন। হজ সমাপন করে মাগরিবে ফেরার পথে তিনি কায়রোয়ানে উপস্থিত হন এবং সেখানকার বিখ্যাত আলিম আবু ইমরান বিন মুসা বিন ঈসা আল-ফাসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ফকিহ আবু ইমরানের সাক্ষাৎ লাভ ও তার দরসে বসার পর ইয়াহইয়ার চোখ খুলে যায়। তিনি উপলব্ধি করেন যে, তার জাতি নাম-পরিচয়ে মুসলমান হলেও প্রকৃতপক্ষে জাহিলিয়াত ও মূর্খতার ঘোর

অমানিশায় নিমজ্জিত হয়ে আছে। তিনি ফকিহ আবু ইমরানকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন তার কোনো শিষ্যকে মাগরিবে প্রেরণ করে সেখানকার জনসাধারণকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রদান করেন।

ফকিহ আবু ইমরান তার ছাত্রদের সামনে বিষয়টি তুলে ধরে মরুভূমির দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষদের কাছে দ্বীন পৌঁছানোর জন্য সফরে উদ্বুদ্ধ করলে দূরত্বের কথা চিন্তা করে সকলে তাতে অসম্মতি জানায়। এরপর তিনি ইয়াহইয়াকে আরেক বিখ্যাত আলিম ওয়াজাজ বিন যিলু আল-লামতির কাছে পাঠান। ইয়াহইয়া তার কাছে উপস্থিত হয়ে সবকিছু খুলে বললে ফকিহ ওয়াজাজ ইয়াহইয়ার সঙ্গে পাঠানোর জন্য নির্বাচিত করেন তার বিশিষ্ট ছাত্র আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিনকে।

শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন সুবিশাল মরু অঞ্চল পাড়ি দিয়ে বর্তমান মৌরিতানিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত প্রচণ্ড উষ্ণ ও অনুর্বর গুদালা গোত্র অধ্যুষিত এলাকায় পৌঁছান। তিনি সেখানকার মুসলমানদের করুণ পরিস্থিতি স্বচক্ষে অবলোকন করে দরদ-ব্যথায় অস্থির হয়ে ওঠেন। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে তিনি তাদের মাঝে দ্বীনি শিক্ষার প্রচার শুরু করেন। কিন্তু শুরুতেই তিনি গুদালা গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হন। তারা তাকে বেদম প্রহার ও অপমান করে; এমনকি একপর্যায়ে বসতি থেকে তাড়িয়ে দেয়।

এরপর তিনি সেখান থেকে আরও গহিনে দক্ষিণ দিকে চলে যান এবং একটি দ্বীপে পৌঁছান। ঐতিহাসিকগণের প্রবল ধারণামতে জায়গাটি ছিল টিমবাক্‌টা (Timbukta)[৪৫] নগরীর কাছে নাইজার নদীর বাঁকে অবস্থিত কোনো এলাকা। আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন সেখানে একটি সাদামাটা তাঁবু স্থাপন করেন। স্বাভাবিকভাবেই তার বিগত দিনের দাওয়াতি প্রচেষ্টার ফলে গুদালা গোত্রের কিছু ব্যক্তি বিশেষ করে কিছু তরুণের হৃদয় ও স্বভাব-প্রকৃতি দ্বীনের প্রতি স্পন্দিত হয়েছিল। তারা শায়খের এই দূরবর্তী অবস্থানস্থলের সংবাদ পেয়ে তার কাছে ভিড় জমাতে শুরু করে। প্রথমে তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র সাতজন। হিজরতকারী দলটির নেতৃত্বে ছিলেন ইয়াহইয়া বিন ইবরাহিম আল-গুদালি; তিনি তার জাতি ও ক্ষমতা ছেড়ে

---

৪৫. **টিমবাক্‌টা :** বর্তমানে আফ্রিকান রাষ্ট্র মালির একটি নগরী।

শায়খের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন।

নতুন এই প্রতিকূল পরিবেশেই শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে থাকেন। তার অব্যাহত প্রচেষ্টায় মাত্র চার বছরের মাথায় ৪৪০ হিজরি সনে (১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দে) তার অনুসারীর সংখ্যা এক হাজারে পৌঁছায়। শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিনের অনুসারীদেরকেই মুরাবিতিন বলা হতো।

এরপর ধীরে ধীরে মুরাবিতিদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অল্পসময়ের মধ্যেই তারা আধুনিক আলজেরিয়া থেকে সেনেগাল পর্যন্ত আফ্রিকা অঞ্চলের সুবিস্তৃত এলাকাজুড়ে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। মুরাবিতি সম্প্রদায়কে তুলনা করা যেতে পারে আন্দালুস বিজেতা তারিক বিন যিয়াদ ও তার সঙ্গী অভিযাত্রীদের সঙ্গে। তাদের মতোই মুরাবিতি সম্প্রদায় ছিল অনন্যসাধারণ বীরত্ব ও সুদৃঢ় মনোবলের অধিকারী; ভোগবিলাসের কোনো স্থান তাদের জীবনধারায় ছিল না।[৪৬]

জাল্লাকার যুদ্ধ (Battle of Zallaqa)

৪৬২ হিজরি সনে (১০৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) ইউসুফ বিন তাশফিনের হাতে মুরাবিতি সাম্রাজ্যের শাসনক্ষমতা অর্পিত হয়। ইউসুফ বিন তাশফিন ছিলেন ধার্মিক ও খোদাভীরু, প্রত্যয়ী ও প্রভাবশালী এবং অভিজ্ঞ একজন শাসক। তিনি মাগরিব অঞ্চলে তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। অ্যাটলাস পর্বতমালা সংলগ্ন অঞ্চলে তিনি মাররাকিশ (Marrakesh) নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। এ অঞ্চলে মাগরিবের সবচেয়ে শক্তিশালী ও অপ্রতিরোধ্য সম্প্রদায় মাছমুদা গোত্র বসবাস করত। মাররাকিশ ছিল মুরাবিতি সাম্রাজ্যের রাজধানী। পরে তিনি সিউটা ও তাঞ্জিয়ার অঞ্চলও অধিকার করেন এবং এর মাধ্যমে মুরাবিতি সাম্রাজ্য আন্দালুসের দক্ষিণ অঞ্চলে নজরদারি করার সক্ষমতা অর্জন করে।

ইউসুফ বিন তাশফিনের নেতৃত্বাধীন মুরাবিতি সাম্রাজ্য ছিল তৎকালীন মাগরিব অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র। আর তাই আন্দালুসবাসী তার কাছেই সাহায্যপ্রার্থনা করেছিল। ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ ও জিহাদ ফি

---

৪৬. মুরাবিতি সম্প্রদায় ও মুরাবিতি সাম্রাজ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অধ্যয়ন করুন মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত ড. রাগিব সারজানির *আন্দালুসের ইতিহাস*।

সাবিলিল্লাহর প্রতি সহজাত আকর্ষণের দাবিতে ইউসুফ বিন তাশফিন তাদের ডাকে সাড়া দেন। তিনি আন্দালুসের খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বাহিনী প্রস্তুত করার পর জাবালে তারিক প্রণালি পাড়ি দিয়ে আন্দালুস উপকূলের জাযিরাতুল খাযরায় অবতরণ করেন এবং জাযিরাতুল খাযরাকেই তার বাহিনীর ঘাঁটি নির্ধারণ করেন।

মুরাবিতি বাহিনীর নৌযানগুলো যখন প্রণালি পাড়ি দিচ্ছিল, তখন পাহাড়ের চূড়ার ন্যায় বিশালাকার ঢেউ নৌযানগুলোর গায়ে আছড়ে পড়ছিল। এ সময় মহান সেনাপতি ইউসুফ বিন তাশফিন তার জাহাজের সম্মুখভাগে এসে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন এবং আত্মবিনয়ী হয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন—

> হে আল্লাহ, আমার এই সমুদ্র পাড়ি দেওয়াতে যদি আপনি মুসলমানদের কল্যাণ ও উপকার রেখে থাকেন, তাহলে এই সমুদ্র-সফর আমাদের জন্য সহজ করে দিন। আর যদি এতে কল্যাণ না থাকে, তাহলে এ সফর কঠিন করে তুলুন, যেন আমরা সমুদ্র পাড়ি দিতে না পারি।

ইউসুফ বিন তাশফিনের দোয়া শেষ হতেই বিক্ষুব্ধ সমুদ্র শান্ত হয়ে যায় এবং নৌযানগুলো দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। আন্দালুসে অবতরণ করার পর তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে মহান আল্লাহর দরবারে সিজদা আদায় করেন।

ইউসুফ বিন তাশফিন আন্দালুসে অবতরণ করার পর বিভক্ত রাষ্ট্রসমূহের শাসকবৃন্দ তার সঙ্গে মিলিত হয়। সবাই যে প্রশান্ত মনে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তা কিন্তু নয়। এরপর ইউসুফ বিন তাশফিন তার বাহিনী নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করে উত্তরাঞ্চলের বাতালইয়ুস (Badajoz) অঞ্চলের নিকটবর্তী জাল্লাকা নামক এলাকায় পৌঁছেন।

জাল্লাকা প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধে সেনাপতি ইউসুফ বিন তাশফিনের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও আচরণ প্রকাশ পেয়েছিল, যা ইসলামের প্রথম যুগের মহান বিজেতা কাফেলার স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে।

খ্রিষ্টান অধিপতি ৬ষ্ঠ আলফোন্সো এক বিশাল বাহিনী[৪৭] গঠন করেছিলেন। বাহিনীর বিশালতা ও যুদ্ধসরঞ্জামের প্রাচুর্যে মোহাচ্ছন্ন হয়ে আলফোন্সো চিৎকার করে বলে ওঠেন—'এই সুবিশাল বাহিনী নিয়ে আমি জিন-মানুষ এমনকি আসমানের ফিরেশতাদের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে পারব।' কিন্তু মুতামিদ ইবনে আব্বাদের দৃঢ়তা ও অবিচলতা, ইউসুফ বিন তাশফিনের কৌশল ও নিপুণতা এবং মুরাবিতি সৈন্যদের ঈমানি শক্তি ও চেতনার সামনে আলফোন্সোর এই আধিক্যের দাম্ভিকতা কোনো কাজে আসেনি।

বাতালইয়ুসের নিকটবর্তী জাল্লাকা প্রান্তরে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। মুতামিদ বিন আব্বাদের নেতৃত্বাধীন অংশ ছিল মুসলিম বাহিনীর সম্মুখ অংশে। ইউসুফ বিন তাশফিন তার বাহিনী নিয়ে কিছুটা দূরে একটি উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে লুকিয়ে ছিলেন। যখন উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের দিন নির্দিষ্ট করার জন্য পত্রবিনিময় হয়, তখন আলফোন্সো প্রতারণার আশ্রয় নেন এবং বলেন যে, 'আগামীকাল শুক্রবার আর শুক্রবার মুসলমানদের সাপ্তাহিক আনন্দের দিন। তাই সেদিন আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে লড়তে চাই না। তার পরের দিন শনিবার, ইহুদিদের আনন্দের দিন। যেহেতু আমাদের এ অঞ্চলে প্রচুর ইহুদি আছে, তাই আমাদের কর্তব্য তাদের দিকটিও খেয়াল রাখা। আর এর পরদিন হলো রোববার, আমাদের আনন্দের দিন। সুতরাং আসুন, আমরা এসব আনন্দের দিনগুলোর সম্মান বজায় রাখি। সোমবারেই পরস্পরের সাক্ষাৎ হবে।'

৪৭৯ হিজরি সনের ১২ রজব (১০৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ অক্টোবর) শুক্রবার ইউসুফ বিন তাশফিন যখন ফজরের উদ্দেশ্যে বের হন, তখনই খ্রিষ্টান বাহিনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মুসলিম বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশ্য

---

৪৭. অধিকাংশ ঐতিহাসিক উৎসগ্রন্থে যদিও খ্রিষ্টান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি; কিন্তু তাদের সংখ্যা যে বিশাল ছিল, বর্ণনাভঙ্গিতে তা স্পষ্ট করা হয়েছে। অপরদিকে যাদের বর্ণনায় খ্রিষ্টান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা উল্লেখ আছে, তাদের কারও মতে খ্রিষ্টান বাহিনীর অশ্বারোহী সৈন্য ছিল আশি হাজার এবং পদাতিক সৈন্য ছিল দু-লক্ষ। আবার কারও মতে, খ্রিষ্টান বাহিনীতে বর্ম পরিহিত অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যাই ছিল আশি হাজার। *'আল-হুলালুল মুওয়াশশিয়া'* গ্রন্থের লেখক এ বর্ণনা উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন, যুদ্ধে খ্রিষ্টান বাহিনীর তিন লক্ষ সৈন্য নিহত হয়েছিল। আবার কারও কারও মতে খ্রিষ্টান বাহিনীর অশ্বারোহী ও বর্মধারী সৈন্যসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার। মতান্তরে অশ্বারোহী ও বর্মধারী সৈন্যসংখ্যা ছিল কমপক্ষে চল্লিশ হাজার এবং তাদের প্রত্যেকের অধীনে প্রচুর সৈন্য ছিল।

আন্দালুসের খ্রিষ্টানদের স্বভাব সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকায় মুতামিদ বিন আব্বাদ পূর্বেই এমন কিছু ঘটার আশঙ্কা করেছিলেন। তাই তিনি তখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েই ছিলেন। মুতামিদের বাহিনী খ্রিষ্টান বাহিনীর অগ্রবর্তী আক্রমণ প্রতিরোধ করে। এরপর মুরাবিতি সৈন্যগণ নামাজ শেষ করেই খ্রিষ্টানদের ওপর আক্রমণ শুরু করে। উভয় পক্ষের মধ্যে শুরু হয় প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী লড়াই। মুসলিম বাহিনী প্রবল বিক্রমে খ্রিষ্টান সৈন্যদের পরাভূত করতে থাকে। অল্পসময়ের মধ্যে সুবিশাল খ্রিষ্টান বাহিনীর পতন ঘটে। সুবিশাল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করতে আসা আলফোন্সো মাত্র পাঁচশ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে সক্ষম হন।

মুসলিম বাহিনী খ্রিষ্টান বাহিনীর প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সম্পদ লাভ করে। কিন্তু ইউসুফ বিন তাশফিন নির্মোহতা ও আত্মনিবেদনের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সমস্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আন্দালুসবাসীকে প্রদান করেন। ইউসুফ বিন তাশফিনের এই উদার আচরণে আন্দালুসের শাসক-জনগণ নির্বিশেষে সকলের হৃদয়ে তার প্রতি ভক্তি, প্রীতি ও শ্রদ্ধার আসন তৈরি হয়।

আন্দালুসে আগমনের পূর্বে ইউসুফ বিন তাশফিন বিভক্ত রাষ্ট্রসমূহের শাসকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি আন্দালুসকে তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। আর তাই জাল্লাকা প্রান্তরের ঐতিহাসিক যুদ্ধে জয়লাভ করার পর তিনি প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আফ্রিকায় ফিরে যান। অবশ্য খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্দালুসবাসীকে সহায়তা করার জন্য তিনি তার বাহিনীর তিন হাজার সৈন্যের একটি অংশকে আন্দালুসে রেখে যান।

জাল্লাকার যুদ্ধের পর শত্রুরাষ্ট্রে ইউসুফ বিন তাশফিনের বীরত্বের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ইউসুফ বিন তাশফিনকে আন্দালুসে আহ্বান করায় খ্রিষ্টানসমাজ মুতামিদ বিন আব্বাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয় এবং তার রাষ্ট্রে উপর্যুপরি হামলা চালাতে থাকে।

খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের অব্যাহত আক্রমণে কোণঠাসা হয়ে ৪৮১ হিজরি সনে (১০৮৮ খ্রিষ্টাব্দে) সেভিল শাসক মুতামিদ পুনরায় মুরাবিতি শাসক ইউসুফ বিন তাশফিনের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করেন। ইউসুফ বিন তাশফিন আবারও তাদের আহ্বানে সাড়া দেন। কিন্তু এবার তিনি খ্রিষ্টানদের পাশাপাশি বিভক্ত রাষ্ট্রসমূহের শাসকবৃন্দকেও তার আক্রমণের

লক্ষ্যবস্তু বানান। কারণ, ইউসুফ বিন তাশফিন যখন টলেডোতে আলফোন্সোকে অবরোধ করেন, তখন তারা তাকে সাহায্য করার পরিবর্তে অবাধ্য আচরণ করে এবং গোপনে আলফোন্সোর সঙ্গে যোগাযোগ করে। বাধ্য হয়ে তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। শাসকবৃন্দের এই বিভক্তি, অবাধ্য আচরণ ও খ্রিষ্টানদের সঙ্গে সখ্য ইউসুফ বিন তাশফিনকে ব্যথিত ও মর্মাহত করে তোলে।

ইউসুফ বিন তাশফিন বিভক্ত রাষ্ট্র-শাসকদের বিলাসিতা, অপচয় ও প্রজাদের ওপর অন্যায় কর আরোপ সম্পর্কে অবগত হন। তিনি তাদেরকে জনসাধারণের ওপর আরোপিত অন্যায় কর প্রত্যাহার করে নিতে বলেন। কিন্তু ইবনে আব্বাদ ব্যতীত অন্যরা তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে।

পাশাপাশি এসব শাসকবৃন্দ একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতারণাসহ বিভিন্ন অভিযোগের কথা শুনিয়ে ইউসুফ বিন তাশফিনের কান ভারী করে তোলে। তার সামনে তাদের সকলের প্রকৃত পরিচয় উন্মোচিত হয়ে যায় এবং আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়।

যে ইবনে আব্বাদ ইতিপূর্বে খ্রিষ্টানদের মোকাবিলায় ইউসুফ বিন তাশফিনের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করেছিলেন, তিনিও ইউসুফ বিন তাশফিনের নিযুক্ত সেনাপতি সায়র বিন আবু বকরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং খ্রিষ্টান শাসক আলফোন্সোর সাহায্য গ্রহণ করেন।

ইউসুফ বিন তাশফিন আন্দালুসকে আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না করার শপথ করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরই আন্দালুসের বিদগ্ধ উলামায়ে কেরাম তাকে উক্ত শপথ হতে মুক্ত ঘোষণা করেন। বরং তারা তাকে বলেন, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এসব দুরাচার শাসকদের অনিষ্ট থেকে মুসলমানদের রক্ষা করা আপনার অপরিহার্য কর্তব্য। সমকালীন ইসলামি প্রাচ্যের উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকেও উক্ত ফতোয়ার সমর্থনে ফতোয়া পাঠানো হয়।

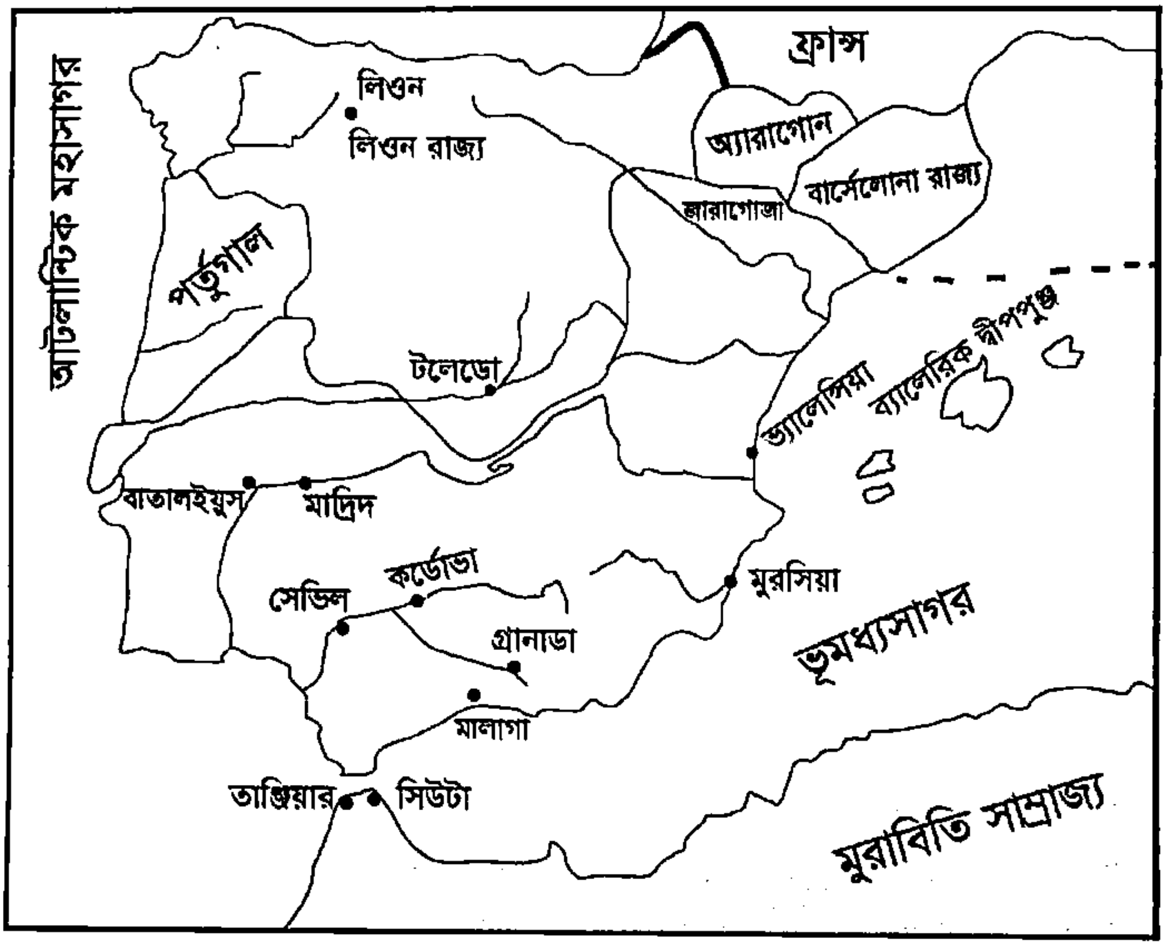
ইউসুফ বিন তাশফিন ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ নেতা। বেদুইন জীবনে অভ্যস্ত এই মহান নেতার জীবনে বিলাসিতা কখনোই জায়গা করে নিতে পারেনি। আন্দালুস ভূমি ও আন্দালুসের সম্পদের প্রতি তার হৃদয়ে সামান্য মোহও ছিল না। মুসলিম জনগণের প্রতি শাসকদের সীমাহীন নিপীড়ন এবং উলামায়ে কেরামের অব্যাহত ফতোয়ার দাবিতে অবশেষে

তিনি একক আন্দালুস রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্যে ৪৮৩ হিজরি সনে (১০৯০ খ্রিষ্টাব্দে) তৃতীয়বারের মতো আন্দালুসে আগমন করেন। গ্রানাডা থেকে তিনি তার অভিযান শুরু করেন এবং ৪৯৫ হিজরি (১১০২ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত ব্যাপ্ত অভিযানের মাধ্যমে বিভক্ত রাষ্ট্রসমূহে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এর ফলে ইবনে আব্বাদের রাষ্ট্রসহ পুরো আন্দালুস আফ্রিকার মুরাবিতি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ইউসুফ বিন তাশফিন একশ বছর বয়সে ৫০০ হিজরি সনে (১১০৬ খ্রিষ্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তার পুত্র আলি বিন ইউসুফ মুরাবিতি সাম্রাজ্যের হাল ধরেন এবং ৫৩৭ হিজরি সন (১১৪৩ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত সাম্রাজ্য শাসন করেন। তার মৃত্যুর পর ৫৩৯ হিজরি সন (১১৪৫ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত তাশফিন বিন আলি বিন ইউসুফ মুরাবিতি সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন।

মুরাবিতি শাসনের মাধ্যমে আন্দালুসে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসায় জনসাধারণ সীমাহীন আনন্দিত হয়। খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররাও নিজেদেরকে গুটিয়ে নেয়। অবশ্য শাসক পর্যায়ের সীমিত কিছু ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মুরাবিতি শাসনে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। এ ছাড়া সমকালীন আন্দালুসের সংস্কৃতিমনা নাগরিক শ্রেণিও মুরাবিতি শাসনে সন্তুষ্ট ছিল না। তাদের দৃষ্টিতে মুরাবিতিরা ছিল কাব্য ও সাহিত্যচর্চার রস ও সুধার গুরুত্ব অনুধাবনে অক্ষম পশ্চাদ্‌পদ এক জাতি।

কিছুদিনের মধ্যেই মুরাবিতিদের সমূলে শেষ করার জন্য আফ্রিকা অঞ্চলে ধ্বংসাত্মক বিদ্রোহ শুরু হয়। বিদ্রোহের প্রভাবে আন্দালুস ভূমিও আক্রান্ত হয় এবং আন্দালুসে ফিরে আসে পূর্বের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি। আন্দালুস আবারও খণ্ড খণ্ড রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এবার বিভক্ত রাষ্ট্রের সংখ্যা পূর্বের চেয়েও বেশি। যতগুলো নগরী, ততগুলো রাষ্ট্র এবং ততজন রাষ্ট্রনায়ক!



মানচিত্র নং-৭
মুরাবিতিদের আন্দালুস শাসন (৪৮৪-৫৩৯ হিজরি)

দ্রষ্টব্য

ইউসুফ বিন তাশফিন ইতিহাসের এক অবমূল্যায়িত বীর যোদ্ধা!

৫৮৩ হিজরি সনে (১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দে) ইসলামি প্রাচ্যে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যিনি অমর বিজয়গাথা রচনা করেছিলেন, তিনি হলেন সালাহুদ্দিন আইয়ুবি। অপরদিকে ৪৭৯ হিজরি সনে (১০৮৬ খ্রিষ্টাব্দে) প্রতীচ্যে যিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছিলেন প্রতিরোধের অনন্য উপাখ্যান, তিনি হলেন ইউসুফ বিন তাশফিন।

কিন্তু ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে অধিক চর্চিত হওয়ায় সালাহুদ্দিন আইয়ুবিই অধিক খ্যাতি ও সুখ্যাতি লাভ করেন। বিপরীতে ধ্বংসপ্রায় আন্দালুসকে খ্রিষ্টান আগ্রাসন থেকে রক্ষা করেও ইতিহাস ও ঐতিহাসিকদের কাছে ইউসুফ বিন তাশফিন ততটা সমাদৃত হননি। নিঃসন্দেহে এটি ইতিহাসের এক বিস্ময়কর আচরণ!

০

মুরাবিতি শাসকগণের তালিকা

০১	ইয়াহইয়া বিন ইবরাহিম আল-গুদালি	:	... -৪৪৫ হি. (... -১০৫৩ খ্রি.)
০২	ইয়াহইয়া বিন উমর লামতুনি	:	৪৪৫-৪৪৭ হি. (১০৫৩-১০৫৫ খ্রি.)
০৩	আবু বকর বিন উমর লামতুনি	:	৪৪৭-৪৬২ হি. (১০৫৫-১০৬৯ খ্রি.)
০৪	ইউসুফ বিন তাশফিন	:	৪৬২-৫০০ হি. (১০৬৯-১১০৬ খ্রি.)
০৫	আলি বিন ইউসুফ	:	৫০০-৫৩৭ হি. (১১০৬-১১৪৩ খ্রি.)
০৬	২য় তাশফিন বিন আলি বিন ইউসুফ	:	৫৩৭-৫৩৯ হি. (১১৪৩-১১৪৫ খ্রি.)
০৭	ইবরাহিম বিন ২য় তাশফিন	:	৫৩৯-৫৩৯হি. (১১৪৫-১১৪৫ খ্রি.)
০৮	ইসহাক বিন আলি বিন ইউসুফ	:	৫৩৯-৫৪১ হি. (১১৪৫-১১৪৭ খ্রি.)

আন্দালুসে মাগরিবকেন্দ্রিক মুওয়াহহিদি শাসনের কাল

[৫৪১-৬২০ হিজরি—১১৪৭-১২২৪ খ্রিষ্টাব্দ]

মুওয়াহহিদি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ বিন তুমার্তের আত্মপ্রকাশ

মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত বার্বার মাছমুদা গোত্রীয় ছিলেন। অবশ্য আদি বংশবিচারে তিনি ছিলেন ইদরিসি আলাবিদের বংশধর। তার পূর্বপুরুষগণ ইদরিসিয়া রাষ্ট্রের পতনের পর বার্বারদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। সুতরাং বংশমূলের বিবেচনায় তিনি ছিলেন আরব আর জন্ম ও বেড়ে ওঠার বিবেচনায় বার্বার।

মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত জ্ঞানার্জনের উদ্দেশে প্রাচ্যে সফর করেন এবং ইবনে হাযমের মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি আবু বকর শাশির সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তার কাছে উসুলে ফিকহের সামান্য জ্ঞান অর্জন করেন। মুবারক বিন আবদুল জাব্বারের কাছ থেকে তিনি হাদিস শ্রবণ করেন। ফিরতি পথে আলেকজান্দ্রিয়া অতিক্রমের সময়ে তিনি আবু বকর তারতুশির মজলিসেও শরিক হন।

মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত জ্ঞানার্জন শেষে মাগরিবে ফিরে এলে সর্বত্র তার জ্ঞানগরিমার কথা ছড়িয়ে পড়ে। মাগরিবে ফিরেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে মুরাবিতি শাসকপরিবারের সমালোচনা ও বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেন। তখন মুরাবিতি শাসক আমিরুল মুসলিমিন আলি বিন তাশফিন তাকে ডেকে পাঠান এবং উলামায়ে কেরামকেও সমবেত করেন। রাজদরবারে অনুষ্ঠিত বিতর্কে মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত সবাইকে পরাভূত করেন। মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌তের মেধার প্রখরতা লক্ষ করে এবং মাছমুদা গোত্রকে নিয়ে মুরাবিতি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহের আশঙ্কা করে আলি বিন তাশফিনের জনৈক উপদেষ্টা তাকে হত্যা করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু আলি

বিন তাশফিন তাকে হত্যা করার পরিবর্তে মুরাবিতি সাম্রাজ্য ছেড়ে অন্য যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে বলেন।

মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত রাজদরবার থেকে বের হয়ে আগমাত (Aghmat) চলে যান। তিনি সেখানকার গহিন পাহাড়ি এলাকার লোকদের সমবেত করে নসিহত করতে শুরু করেন। মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত তাদেরকে বেশি বেশি (হাদিসে বর্ণিত) মাহদির কথা শোনাতেন। দিনে দিনে তার অনুসারী বৃদ্ধি পেতে থাকে। আবদুল মুমিন বিন আলি আল-কুমি নামক তার জনৈক অনুসারী দশজন ব্যক্তিকে নিয়ে তার হাতে এ মর্মে বায়আত গ্রহণ করেন যে, তিনিই প্রতীক্ষিত মাহদি। এরপর মানুষ দলে দলে তার হাতে বায়আত গ্রহণ করতে থাকে। ফলে অল্প কদিনের মধ্যেই মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত মুরাবিতি সাম্রাজ্যের জন্য এক শক্তিশালী হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হন।

মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌তকে পরাভূত করার জন্য আন্দালুসের প্রশাসক একটি বাহিনী প্রেরণ করেন; কিন্তু তারা পরাজিত হয়। এর ফলে তার প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। ৫২৪ হিজরি সনে (১১৩০ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি মুরাবিতিদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই শুরু করেন। তিনি বিশাল এক বাহিনী প্রস্তুত করে মুরাবিতি সাম্রাজ্যের রাজধানী মাররাকিশে প্রেরণ করেন। মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌তের বাহিনী মাররাকিশ অবরোধ করে। কিন্তু সিজিলমাসার গভর্নর মাররাকিশের নিরাপত্তায় সহায়তা বাহিনী প্রেরণ করলে তার বাহিনী পরাজিত হয় এবং অবরোধ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত তখন অসুস্থ থাকায় নিজে অভিযানে অংশগ্রহণ করেননি। এর কিছুদিন পরই তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে আবদুল মুমিনের নাম ঘোষণা করেন এবং লোকেরা তার হাতে বায়আত গ্রহণ করে।

মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত যে স্বপ্ন পূরণ না করেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন, আবদুল মুমিন তা পূরণ করতে সক্ষম হন। তিনি মুরাবিতি সাম্রাজ্যের পতন ঘটান এবং ৫৩৮ হিজরি থেকে ৫৪১ হিজরি সনের (১১৪৩-১১৪৬ খ্রিষ্টাব্দের) মধ্যে মধ্য ও উচ্চ মাগরিব অঞ্চল জয় করেন। ৫৪১ হিজরি সনেই মুওয়াহহিদি বাহিনীর হাতে মাররাকিশের পতন ঘটে এবং মুরাবিতি শাসনের সমাপ্তি ঘটে।

মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌তের অনুসারীরা নিজেদের নাম রেখেছিল 'মুওয়াহহিদি' বা একত্ববাদী জামাত। তারা দাবি করত—পৃথিবীতে একমাত্র তারাই প্রকৃত অর্থে ঈমানদার জামাত, যারা আল্লাহ তাআলার তাওহিদ ও একত্ববাদে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহকে সৃষ্টিজীবের সঙ্গে উপমা থেকে পবিত্র ঘোষণা করে।

আন্দালুসের মুসলমানরা ইতিপূর্বে যেমন মুরাবিতি শাসকদের সাহায্য গ্রহণ করেছিল, তেমনই তারা মুওয়াহহিদি শাসকদের কাছেও সাহায্য প্রার্থনা করে। এর ফলে মুওয়াহহিদি প্রশাসনের সামনে আন্দালুসে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হয়। মুওয়াহহিদি শাসক আবদুল মুমিন ৫৪৩ হিজরি সনে (১১৪৮ খ্রিষ্টাব্দে) আন্দালুসে বাহিনী প্রেরণ করেন। পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যেই আন্দালুসের সমস্ত ইসলামি ভূখণ্ড মুওয়াহহিদিদের কর্তৃত্বে চলে আসে।

মুরাবিতি শাসকগণ যেমন আন্দালুসে স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছিল, মুওয়াহহিদি শাসকরা তেমনটি করার চিন্তা করেনি। মুওয়াহহিদি সাম্রাজ্যের সামরিক ঘাঁটি মাররাকিশেই ছিল। তারা আন্দালুসে তাদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি প্রেরণ করত আর প্রতিনিধিরা তাদের নামে আন্দালুস শাসন করত।

আরিকের যুদ্ধ (Battle of Alarcos)

[শাবান ৫৯১ হিজরি]
[জুলাই ১১৯৫ খ্রিষ্টাব্দ]

৫৮০ হিজরি সনে মানসুর বিল্লাহ ইয়াকুব বিন ইউসুফ বিন আবদুল মুমিন মুওয়াহহিদি সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তৃতীয় মুওয়াহহিদি শাসক। তার শাসনকাল ছিল ৫৮০ হিজরি থেকে ৫৯৫ হিজরি সন (১১৮৪-১১৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত।

৫৯১ হিজরি সনে (১১৯৫ খ্রিষ্টাব্দে) ইয়াকুব বিন ইউসুফ বাতালইয়ুস-এর নিকটবর্তী আরিকের প্রান্তরে[৪৮] খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে

---

৪৮. **আরিক** : রাবাহ দুর্গ হতে উত্তর-পশ্চিমে বিশ কিলোমিটার দূরে ওয়াদিয়ে আনা নদীর একটি শাখার তীরে অবস্থিত এক দুর্গের নাম। বর্তমানে এর অবস্থান আধুনিক স্পেনের সিউডাড রিয়াল (Ciudad Real) নগরীর পশ্চিমে স্ট্যা মারিয়া ডি অ্যালারকোস (Sta Maria de Alarcos) অঞ্চলে। তৎকালে আরিক ছিল আন্দালুস ও ক্যাস্টোলা রাষ্ট্রের সীমান্তরেখায় অবস্থিত একটি এলাকা।

তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাভূত করেন। জাল্লাকার প্রান্তরে মুরাবিতিরা যে বিজয় অর্জন করেছিল, তার তুলনায় আরিকের বিজয় মোটেও কম তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না।

ইকাবের যুদ্ধ

[সফর ৬০৯ হিজরি]
[জুলাই ১২১২ খ্রিষ্টাব্দ]

৬০৯ হিজরি সনে (১২১২ খ্রিষ্টাব্দে) খ্রিষ্টান ক্রুসেড শক্তি আন্দালুসের মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক ও বিস্তৃত যুদ্ধের ঘোষণা করে। ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড ও ইতালি থেকে প্রচুর স্বেচ্ছাসেবী সৈন্য খ্রিষ্টান বাহিনীতে যোগ দেয়। মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দেন আরিক যুদ্ধের মহানায়ক ইয়াকুব বিন ইউসুফের পুত্র মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব আন-নাসির। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ।

মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব আন-নাসিরের অনভিজ্ঞ নেতৃত্ব এবং অদক্ষ যুদ্ধনীতির কারণে ইকাবের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। অধিকাংশ মুসলিম সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হয়।

বরং প্রকৃতপক্ষে ইকাবের যুদ্ধ ছিল আন্দালুসে মুওয়াহহিদি সাম্রাজ্যের সমাপ্তির সূচনা। এর পরপরই খ্রিষ্টানদের হাতে একের পর এক আন্দালুসের নগরীগুলোর পতন ঘটতে থাকে। এ সময় আফ্রিকায় বসবাসরত বার্বার গোত্রসমূহের মাঝে দাঙ্গা-ফ্যাসাদ ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি মুওয়াহহিদি সাম্রাজ্যের ক্ষমতা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের পারস্পরিক সংঘাত ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন অব্যাহত থাকে। ফলে তাদের শক্তি খর্ব হয়ে যায় এবং আন্দালুসের প্রশাসকগণ তাদেরকে আন্দালুস থেকে বিতাড়িত করে দেয়। এ সময় ইবনে হুদ নিজেকে আন্দালুসের দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ এলাকার শাসক ঘোষণা করেন। তার মৃত্যুর পর ৬২০ হিজরি সনে (১২২৪ খ্রিষ্টাব্দে) আন্দালুসের শাসনক্ষমতা চলে যায় গ্রানাডার শাসকপরিবার বনু নাসরের হাতে।

মুওয়াহহিদি শাসকদের তালিকা

১.	আবদুল মুমিন বিন আলি	:	৫২৪-৫৫৮ হি. ১১২৯-১১৬৩ খ্রি.
২.	আবু ইয়াকুব ইউসুফ আল-মানসুর বিন আবদুল মুমিন	:	৫৫৮-৫৮০ হি. ১১৬৩-১১৮৪ খ্রি.
৩.	আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন আবু ইয়াকুব ইউসুফ আল-মানসুর	:	৫৮০-৫৯৫ হি. ১১৮৪-১১৯৯ খ্রি.
৪.	আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আন-নাসির বিন আবু ইউসুফ ইয়াকুব	:	৫৯৫-৬১০ হি. ১১৯৯-১২১৩ খ্রি.
৫.	আবু ইয়াকুব ইউসুফ আল-মুসতানসির (২য় ইউসুফ) বিন আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ	:	৬১১-৬২০ হি. ১২১৩-১২২৪ খ্রি.
৬.	আবদুল ওয়াহিদ বিন আবু ইয়াকুব ইউসুফ আল-মানসুর	:	৬২০-৬২১ হি. ১২২৪-১২২৪ খ্রি.
৭.	আবু আবদুল্লাহ আল-আদিল বিন আবু ইউসুফ ইয়াকুব	:	৬২১-৬২৪ হি. ১২২৪-১২২৭ খ্রি.
৮.	ইয়াহইয়া আল-মুতাসিম বিন আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ	:	৬২৪-৬২৭ হি. ১২২৭-১২৩০ খ্রি.
৯.	ইদরিস আল-মামুন বিন আবু ইউসুফ ইয়াকুব	:	৬২৭-৬৩০ হি. ১২৩০-১২৩২ খ্রি.
১০.	আবদুল ওয়াহিদ রাশিদ বিন ইদরিস আল-মামুন	:	৬৩০-৬৪০ হি. ১২৩২-১২৪২ খ্রি.
১১.	আলি সাইদ আবুল হাসান বিন ইদরিস আল-মামুন	:	৬৪০-৬৪৬ হি. ১২৪২-১২৪৮ খ্রি.
১২.	উমর আল-মুরতাযা বিন আবু ইবরাহিম ইসহাক বিন আবু ইয়াকুব ইউসুফ	:	৬৪৬-৬৬৫ হি. ১২৪৮-১২৬৬ খ্রি.
১৩.	আবু দাবুস ওয়াসিক বিন মুহাম্মাদ উমর বিন আবদুল মুমিন	:	৬৬৫-৬৬৮ হি. ১২৬৬-১২৬৯ খ্রি.

গ্রানাডায় বনু আহমার (বনু নাসর)-এর শাসনকাল

[৬২০-৮৯৭ হিজরি—১২২৪-১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ]

ইকাব যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে আন্দালুসের অধিকাংশ বড় বড় নগরী খ্রিষ্টানদের দখলে চলে যায়। একমাত্র গ্রানাডা থেকে যায় মুসলমানদের হাতে। ৬৩৬ হিজরি থেকে ৬৬৮ হিজরি সন (১২৩৮-১২৬৯ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ক্যাস্টোলার শাসক তৃতীয় ফার্ডিনান্ড ও অ্যারাগোনের শাসক প্রথম জেইম ভ্যালেন্সিয়া, কর্ডোভা, মুরসিয়া, সেভিল প্রভৃতি নগরী জয় করে নেন। আরবদের শাসকক্ষমতা শুধু গ্রানাডাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। দুর্ভেদ্য-দুর্গম গ্রানাডা অঞ্চল এরপর প্রায় আড়াই শতাব্দী কাল খ্রিষ্টান স্পেনের মোকাবিলা করে টিকে থাকে।

গ্রানাডায় বনু আহমার সাম্রাজ্যের স্থপতি ছিলেন বনু নাসরুদ্দিন বংশের আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ নামক জনৈক আরব নেতা। দাবি করা হয় যে, বনু নাসর মদিনার খাযরাজ গোত্রের প্রতি সম্বন্ধিত। মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ ইবনুল আহমার[৪৯] ছিলেন সমুন্নত মনোবল, সচ্চরিত্র ও দুর্লভ যোগ্যতাসম্পন্ন একজন নেতা। এ জন্যই বনু নাসর গোত্রে তার নেতৃত্বের স্বীকৃতি দিয়ে তাকে 'শায়খ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

তৎকালীন আন্দালুসের মুসলিম সমাজ যে দুর্যোগময় পরিস্থিতি মোকাবিলা করছিল, তার প্রতি লক্ষ করে বনু আহমার গ্রানাডার বাইরে অন্য কোনো নগরীতে নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তৃতির চিন্তা করেনি।

বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে—উপর্যুপরি ক্রুসেড আগ্রাসন, সার্বক্ষণিক শঙ্কা, শত্রুবেষ্টন ও শত্রুর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেও নিঃসঙ্গ ইসলামি ভূখণ্ড গ্রানাডা

---

৪৯. তিনি ইবনুল আহমার নামে খ্যাতি লাভ করলেও প্রকৃতপক্ষে এটি তার নাম নয়; বরং তিনি ও তার পরবর্তী বংশধরগণের মধ্যে যারা গ্রানাডা শাসন করেছেন, তারা এই উপাধি ধারণ করেছিলেন।

দৃঢ়তার সঙ্গে টিকে থাকে এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন অঙ্গনে সমুন্নত অবস্থানে উন্নীত হতে সক্ষম হয়।

এর কারণ হিসেবে বলা যায়—আন্দালুসের বিভিন্ন ভূখণ্ড খ্রিষ্টানদের দখলে চলে যাওয়ার পর সেখানকার অধিকাংশ মুসলিম নাগরিক গণহত্যা ও বিতাড়নের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে গ্রানাডায় পাড়ি জমায়। কৃষি, বাণিজ্য, হস্তশিল্পসহ বিভিন্ন পেশায় দক্ষ এসব মানুষের আগমনে গ্রানাডার প্রতিটি অঙ্গন ব্যাপকভাবে মুখরিত হয়ে ওঠে। গ্রানাডা-ভূমির এক ইঞ্চি জমিও এমন ছিল না, যা কোনো উপযোগী কাজে ব্যবহৃত হয়নি।

গ্রানাডা-নৃপতি ইবনুল আহমার একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। তিনি জনগণের সঙ্গে সদাচরণ করতেন। বিভিন্ন ইসলামি নগরী থেকে গ্রানাডায় আগত আলিমসমাজ ও জ্ঞানীদের সহায়তা নিয়ে তিনি রাষ্ট্রের বুদ্ধিবৃত্তিক, অর্থনৈতিক ও নাগরিক সভ্যতার অঙ্গনে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন। তিনি বিভিন্ন খনিজ সম্পদের খনি আবিষ্কার করে সম্পদ আহরণের ব্যবস্থা করেন এবং প্রচুর হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তৎকালীন বিশ্বের সৌন্দর্যের প্রতীক ও স্থাপত্য শিল্পের অপার বিস্ময় আল-হামরা প্রাসাদ নির্মাণ করেন। সুউচ্চ ও দুর্গম বিভিন্ন পর্বতচূড়া চারদিক থেকে ঘিরে রেখে আল-হামরাকে করে তুলেছিল দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত। আল-হামরার উত্তর পাশ দিয়ে কলকল রবে বয়ে যেত দোরু নদীর প্রবাহধারা। প্রাসাদের নিরাপত্তা আরও সুরক্ষিত করতে নির্মাণ করা হয়েছিল মর্মর পাথরের সুদীর্ঘ প্রাচীর। নির্ধারিত দূরত্ব পরপর নিরাপত্তা প্রাচীরের ওপর পর্যবেক্ষণ টাওয়ারও স্থাপন করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি শত্রুদের আগ্রাসনের সম্মুখে গ্রানাডাকে টিকে থাকতে সাহায্য করেছিল তা হচ্ছে মাগরিবের বনু মারিন সাম্রাজ্যের[৫০] সঙ্গে

---

৫০. মাগরিব অঞ্চলে মুওয়াহহিদি সাম্রাজ্যের পতনের পর গড়ে উঠেছিল বনু মারিন সাম্রাজ্য (The Marinid Sultanate)। বনু মারিন ছিল যিনানা নামক একটি আমাজিঘ গোত্রের শাখা। যাযাবর জীবনধারায় অভ্যস্ত বনু মারিন হিজরি সপ্তম শতকের শুরুতে মাগরিব ও সাহারা মরুভূমির মধ্যবর্তী দুর্গম মরু অঞ্চলে স্থায়ী আবাস স্থাপন করে। এর কিছুদিন পর তারা মুওয়াহহিদি সাম্রাজ্যের সামরিক দুর্বলতা ও প্রশাসনিক অস্থিরতাকে কাজে লাগিয়ে মাগরিবের বিভিন্ন নগরী ও জনপদে ছড়িয়ে পড়ে। বনু মারিনের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে উদ্বিগ্ন হয়ে মুওয়াহহিদি শাসক ২য় ইউসুফ আল-মুসতানসির ৬১৩ হিজরি সনে একটি বাহিনী প্রেরণ করলে বাহিনীটি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এরপর থেকে ৬৪২ হিজরি সন পর্যন্ত=

গ্রানাডার শাসকপরিবারের বন্ধুত্ব। যখনই গ্রানাডার ওপর কোনো আক্রমণ হতো, বনু মারিন গ্রানাডার নিরাপত্তায় সামরিক সাহায্য প্রেরণ করত। বরং বনু মারিনের প্রেরিত একটি বাহিনী গ্রানাডাতেই ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। তারা গ্রানাডা-নৃপতির অধীনে থেকে খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের আক্রমণ প্রতিরোধ করত।

৭৬৩ হিজরি সনে (১৩৬২ খ্রিষ্টাব্দে) বনু আহমারের শাসক পঞ্চম মুহাম্মদের শাসনামলে গ্রানাডার বুদ্ধিবৃত্তিক সভ্যতা উন্নতির সর্বোচ্চ চূড়ায় আসীন হয়।

পঞ্চম মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর একে একে বেশ কয়েকজন শাসক গ্রানাডা শাসন করেন। কিন্তু তারা তাদের পূর্বসূরিদের ন্যায় শক্তি, প্রস্তুতি ও সতর্কতার অধিকারী ছিলেন না। বরং তারা ভোগবিলাসের জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন।

গ্রানাডায় যখন শাসকবৃন্দের বিলাসী জীবন ও মাগরিবের মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কারণে দুর্বলতা ধেয়ে আসছিল, খ্রিষ্টান স্পেন তখন নবোদ্যমে জেগে উঠে ঐক্যের শক্তি অর্জনে সচেষ্ট ছিল। অ্যারাগোনের শাসক ফার্ডিনান্ড এ সময় ক্যাস্টোলার রানি ইসাবেলাকে বিয়ে করেন এবং গ্রানাডার বিরুদ্ধে উভয় খ্রিষ্টান রাষ্ট্র ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয়।

এ সময় গ্রানাডার শাসক ছিলেন আবুল হাসান আলি ইবনুল আহমার। আবুল হাসান একজন সাহসী বীর যোদ্ধা ছিলেন; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দূরদর্শী ছিলেন না। ঐক্যবদ্ধ খ্রিষ্টানশক্তির মোকাবিলায় তিনি প্রতিপক্ষ

=একটানা কয়েক বছর বনু মারিন ও মুওয়াহহিদি সরকারের মধ্যে সংঘাত ও যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। বনু মারিন ৬৪৩ হিজরি সনে মিকনাসা নগরী এবং ৬৪৮ হিজরি সনে ফেজ নগরী দখল করে নেয়। ৬৫৫ হিজরি সনে তারা জয় করে সিজিলমাসা (Sijilmasa) ও দারআ (Draa) নগরী। পরের বছর বনু মারিনের তৎকালীন নেতা আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন আবদুল হক আল-মারিনি 'আল-মানসুর বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করে ফেজ নগরীকেন্দ্রিক বনু মারিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

৬৬৭ হিজরি সনের শেষদিকে সংঘটিত হয় বনু মারিন ও মুওয়াহহিদি বাহিনীর চূড়ান্ত যুদ্ধ। বনু মারিন রাষ্ট্রের রাজধানী ফেজ ও মুওয়াহহিদি সাম্রাজ্যের রাজধানী মাররাকিশের মধ্যবর্তী গাফু উপত্যকায় উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয় এবং বনু মারিন নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। যুদ্ধে মুওয়াহহিদি শাসক আবু দাবুস ওয়াসিক নিহত হন। ৬৬৮ হিজরি সনের ৯ মুহাররম আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল-মানসুর তার বাহিনী নিয়ে মাররাকিশে প্রবেশ করলে মুওয়াহহিদি সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটে; সূচিত হয় বনু মারিন সাম্রাজ্যের অধ্যায়।

অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে আক্রমণ করে পরাভূত করার নীতি অবলম্বন করেন। ইতিপূর্বে প্রতি বছর গ্রানাডা খ্রিষ্টান শাসকদের যে জিজিয়া কর প্রদান করত, তিনি তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে ফার্ডিনান্ডের প্রতিনিধিকে বলে দেন—'যাও; তোমার প্রভুকে গিয়ে বলো, গ্রানাডার যে-সকল শাসক কর প্রদান করতেন, তারা মৃত্যুবরণ করেছেন। গ্রানাডার টাকশালে এখন তরবারি ছাড়া অন্য কিছু উৎপাদিত হয় না।'

আবুল হাসানের হুমকির পর উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক যুদ্ধে আবুল হাসানের পুত্র আবু আবদুল্লাহ খ্রিষ্টানদের হাতে বন্দি হন। আবু আবদুল্লাহর বন্দিত্ব ছিল গ্রানাডার মুসলিম শাসনের জন্য এক বিরাট আঘাত। ব্যক্তি আবু আবদুল্লাহর বন্দিত্ব গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় ছিল না; গুরুত্বের বিষয় ছিল—দুই খ্রিষ্টান নৃপতি ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলা হুমকি ও প্রতিশ্রুতি এবং ঘুষ ও ঘুষির অস্ত্র প্রয়োগ করে আবু আবদুল্লাহকে বশীভূত করতে এবং তাকে তার পিতা আবুল হাসান ও তার শাসনব্যবস্থার প্রতি বিক্ষুব্ধ করে তুলতে সক্ষম হয়। আবু আবদুল্লাহ যখন ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার হাতের পুতুলে পরিণত হন, তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মুক্ত আবদুল্লাহ গ্রানাডায় ফিরেই তার পিতার বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এর কিছুদিন পরই ভগ্নহৃদয় আবুল হাসান মৃত্যুবরণ করেন।

আবুল হাসানের মৃত্যুর পর গ্রানাডার শাসনভার গ্রহণ করেন তার ভাই আবদুল্লাহ যাগ্ল। তিনি ছিলেন আন্দালুসের ইসলামি সাম্রাজ্যের শেষ মহান শাসক। আবদুল্লাহ যাগ্ল ছিলেন দৃঢ়চেতা এবং খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াকু যোদ্ধা। ভ্রাতুষ্পুত্র আবু আবদুল্লাহ যদি ক্ষমতা নিয়ে তার সঙ্গে দ্বন্দ্বে না জড়াতেন এবং তার কর্মপ্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি না করতেন, তাহলে হয়তো জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি গ্রানাডার শাসনব্যবস্থা ধরে রাখতে পারতেন। প্রকৃত বাস্তবতা হলো, শাসকশ্রেণির পারস্পরিক সংঘাতই গ্রানাডার পতন ত্বরান্বিত করেছিল।

ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার নেতৃত্বে খ্রিষ্টান যোদ্ধারা একের পর এক এলাকা জয় করে গ্রানাডাকে সংকীর্ণ করে ফেলে। একের পর এক পতন হতে থাকে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন নগরী ও নিরাপত্তা-দুর্গ। ততদিনে বারুদ আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং খ্রিষ্টান যোদ্ধারা তা সংগ্রহও করেছিল। সদ্য আবিষ্কৃত কামানের মাধ্যমে গোলা ছুড়ে খ্রিষ্টান যোদ্ধারা বিভিন্ন দুর্গের প্রাচীর ধসিয়ে

দিচ্ছিল। ফলে পরিস্থিতি আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। তা সত্ত্বেও এ সকল দুর্গের মুসলমানগণ প্রাণপণ লড়াই করে প্রবল প্রতিরোধের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

আবদুল্লাহ যাগ্‌ল ছিলেন দৃঢ়চেতা ও শক্তিশালী একজন শাসক। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র আবু আবদুল্লাহ তার বাহিনীকে বলে রেখেছিলেন—তারা যেন তার চাচার বাহিনীকে দুর্গ রক্ষায় সাহায্য করার পরিবর্তে বাধা প্রদান করে। অহংবোধ, ক্ষমতার লিপ্সা, বিদ্বেষ ও অশুভ চিন্তাই আবু আবদুল্লাহকে অন্ধ করে ফেলেছিল।

এভাবে গ্রানাডা রাষ্ট্রের পশ্চিম অংশ খ্রিষ্টানদের দখলে চলে যায়। খ্রিষ্টান বাহিনী অনিন্দ্যসুন্দর বন্দর নগরী মালাগা ও সুরক্ষিত দুর্গ রুনদা দখল করে নেয়। বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয় হচ্ছে—খ্রিষ্টান বাহিনী মালাগা বিজয়ের পর আবু আবদুল্লাহ ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার কাছে অভিনন্দনবার্তা প্রেরণ করেন।

এরপর ক্রুসেডাররা পূর্বদিকে অগ্রসর হয়। আবদুল্লাহ যাগ্‌ল সর্বোচ্চ চেষ্টা করে তাদেরকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাকদির তখন আন্দালুসে মুসলিম শাসনের চূড়ান্ত পতন ঘোষণা করছিল।

অসহায় আবদুল্লাহ যাগ্‌ল সাগর পাড়ি দিয়ে আফ্রিকা অঞ্চলে চলে যান। সেখানে ফেজের শাসক তাকে বন্দি করে তার সম্পদ জব্দ করে এবং তার ওপর নির্মম নির্যাতন চালায়। তার দু-চোখ উপড়ে ফেলা হয়। বাকি জীবন তিনি অত্যন্ত দুঃখজনক অবস্থায় দিনাতিপাত করেন।

আবু আবদুল্লাহ তার চাচা আবদুল্লাহ যাগ্‌লের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ফার্ডিনান্ডকে প্ররোচিত করেছিলেন। তিনি ফার্ডিনান্ডকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ফার্ডিনান্ড যখন যাগ্‌লকে পরাজিত করে তার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলো দখল করে নেবেন, তখন আবু আবদুল্লাহ তার অধিকারে থাকা রাজপ্রাসাদ, আল-হামরা প্রশাসনিক অঞ্চলসহ গ্রানাডার বাকি অংশের কর্তৃত্ব ফার্ডিনান্ডের হাতে তুলে দেবেন। যাগ্‌লকে পরাজিত করার পর ফার্ডিনান্ড যখন আবু আবদুল্লাহকে তার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তখন আবু আবদুল্লাহ দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। তিনি এ সময় আরব বীর যোদ্ধা মুসা বিন আবুল গাসসানের নেতৃত্বে গ্রানাডার একটি প্রতিনিধিদলকে ফার্ডিনান্ডের কাছে এই বার্তাসহ প্রেরণ করেন যে,

ফার্ডিনান্ডের যদি তাদের অস্ত্রশস্ত্র অর্জন করার আকাঙ্ক্ষাই থাকে, তাহলে যেন তিনি নিজেই তা নিতে আসেন।

তখন ফসল কাটার সময় ঘনিয়ে এসেছিল। ফার্ডিনান্ড এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পঁচিশ হাজার সৈন্য নিয়ে গ্রানাডায় আক্রমণ করেন এবং আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ দখল করে নেন। এরপর তিনি এতটুকুতেই সন্তুষ্ট থেকে সে বছরের মতো নিজ রাষ্ট্রে ফিরে যান।

৮৯৫ হিজরি সনে ফার্ডিনান্ড আবারও গ্রানাডা আক্রমণ করেন। এতক্ষণে এসে অচেতন আবু আবদুল্লাহর চেতনা ফিরে আসে। কিন্তু ততক্ষণে যে বড় বিলম্ব হয়ে গেছে! আবু আবদুল্লাহ যুদ্ধের পোশাক পরিধান করে খ্রিষ্টান বাহিনীর মোকাবিলায় বের হয়ে আসেন। তার সঙ্গে ছিলেন আন্দালুসের শেষ আরব বীর মুসা বিন আবু গাসসান। ততদিনে ফার্ডিনান্ডের সামনে মাথানতকারী গ্রানাডার আরবরা যখন উপলব্ধি করে যে, গ্রানাডার মুসলমানদের দিকে এক কঠিন দুর্যোগ ধেয়ে আসছে আর গ্রানাডার শাসক আবু আবদুল্লাহ তার বাহিনী নিয়ে সেই দুর্যোগের প্রতিরোধে বেরিয়ে পড়েছেন, তখন তারা নিজেদের কাঁধ থেকে ফার্ডিনান্ডের আনুগত্যের জোয়াল নামিয়ে ফেলে এবং মুসলমান ভাইদের সঙ্গে প্রতিরোধযুদ্ধে শরিক হয়। গ্রানাডার বাহিনী প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলে ফার্ডিনান্ডের বাহিনীকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয় এবং বেদখল হওয়া কয়েকটি দুর্গ পুনরুদ্ধার করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই প্রতিরোধযুদ্ধ ছিল নিভে যাওয়ার পূর্বে প্রদীপের শেষবারের মতো জ্বলে ওঠার ন্যায়। প্রদীপের এই অন্তিম শিখা জ্বলে ওঠার পূর্বাভাস নয়; বরং প্রাণান্তকর চেষ্টায় অন্তিম অস্তিত্বের ঘোষণা।

৮৯৭ হিজরি সনে (১৪৯১ খ্রিষ্টাব্দে) ফার্ডিনান্ড গ্রানাডায় চূড়ান্ত অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি এবার পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে গ্রানাডার কেন্দ্রস্থল অবরোধ করেন। এরপর তিনি মাত্র আশি দিনের মধ্যে নগরীর সম্মুখভাগে 'পবিত্র বিশ্বাস' নামে একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ অবরোধে একসময় গ্রানাডাবাসীর আহারসামগ্রী ফুরিয়ে যায়। সঙ্গিন পরিস্থিতিতে আবু আবদুল্লাহ উপলব্ধি করেন যে, ফার্ডিনান্ডের সঙ্গে সমঝোতা করা ব্যতীত তার সামনে অন্য কোনো পথ খোলা নেই। কিন্তু বীর সেনাপতি মুসা বিন আবু গাসসান শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি অস্ত্রধারণ করে অশ্বে আরোহণ করেন এবং একাই

শত্রুবাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়ে তরবারি-বর্শা চালনা করতে থাকেন। মুসা বিন আবু গাসসান লাঞ্ছনার জীবনের পরিবর্তে গৌরবের মৃত্যুকে বেছে নেন এবং শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে শহিদ হয়ে যান।

আত্মসমর্পণের শর্তসমূহ

এরপর আবু আবদুল্লাহ ফার্ডিনান্ডের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেন এবং সাতষট্টিটি শর্তের বিনিময়ে গ্রানাডার নিয়ন্ত্রণ ফার্ডিনান্ডের হাতে তুলে দেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শর্ত হলো—

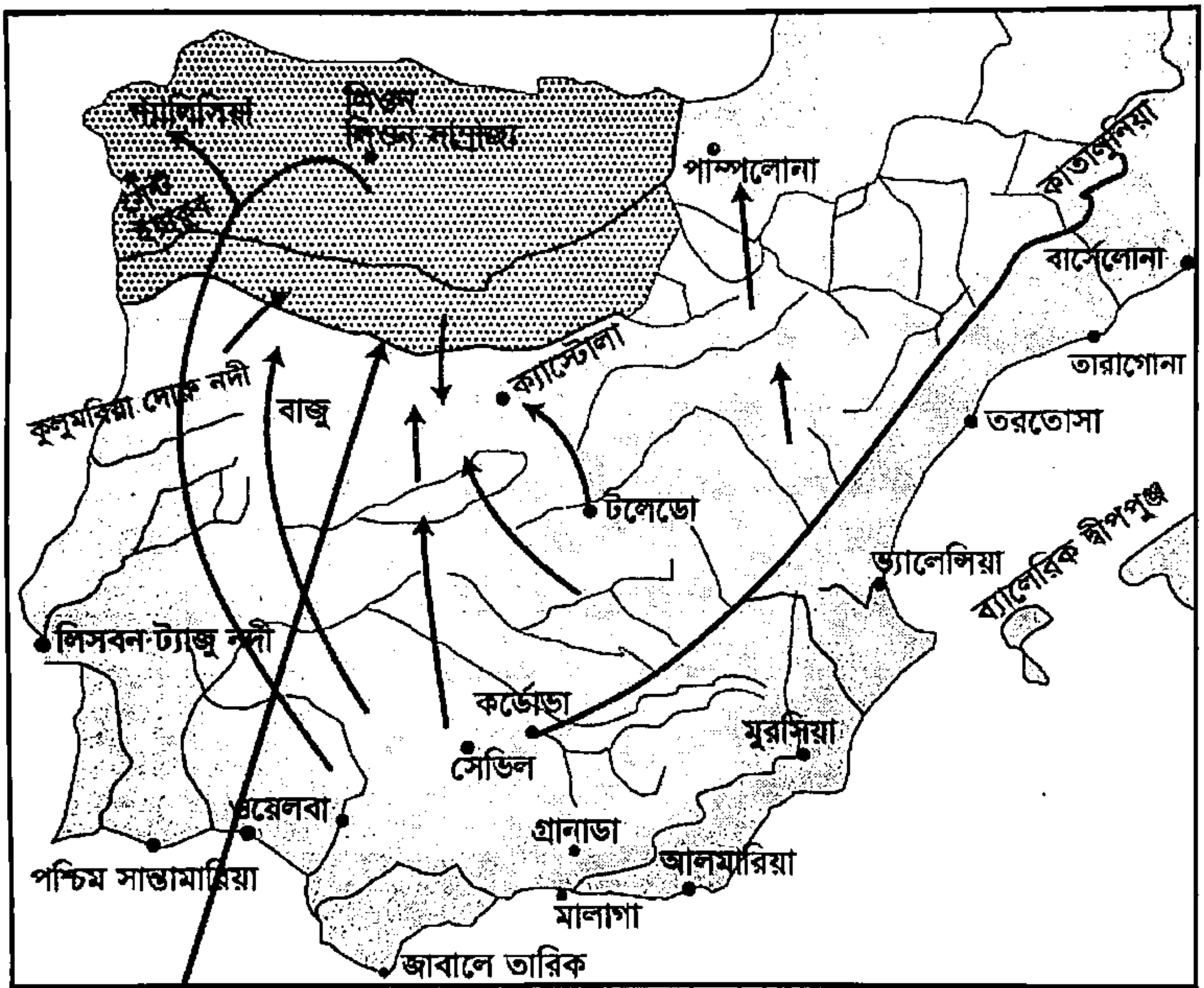
- মুসলমানদের জানমাল ও পরিবারের নিরাপত্তা দেওয়া হবে।
- প্রত্যেকের ঘরবাড়ি ও ভূসম্পত্তি তার অধিকারেই থাকবে।
- প্রত্যেকে আপন আপন ধর্মমতের ওপর অটল থাকতে পারবে।
- মসজিদসমূহ অক্ষত রাখা হবে।
- কাউকে ধর্মত্যাগে বাধ্য করা হবে না।
- মুসলমানগণ জানমালের নিরাপত্তাসহ খ্রিষ্টানদের এলাকায় ভ্রমণ করতে পারবে।
- মুসলিম বন্দিদেরকে মুক্তি দেওয়া হবে।
- যেকোনো মুসলিম নাগরিক যখন ইচ্ছা ধনসম্পদ ও পরিবার-পরিজন নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে আফ্রিকায় চলে যেতে পারবে।

মুসলমানগণ উল্লিখিত যাবতীয় শর্ত মেনে নেয়। তাদের সামনে এ ছাড়া ভিন্ন কোনো অবকাশও ছিল না।

আবু আবদুল্লাহ একদল সৈন্য নিয়ে রায়হান পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান করছিলেন। ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলা যখন শোভাযাত্রা সহকারে আল-হামরার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন আবু আবদুল্লাহ অগ্রসর হয়ে তাদের হাতে নগরীর চাবি সমর্পণ করেন। আবু আবদুল্লাহ দূর থেকে তাকিয়ে হৃত শাসন-ক্ষমতা ও বিসর্জিত ঐতিহ্য-গৌরবকে বিদায় জানান। আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনি যখন কাঁদতে শুরু করেন, তখন তার মা আয়শা আল-হুররা তাকে ধিক্কার দিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, এখন তো তোমার কাঁদাই উচিত। পৌরুষের পরিচয় দিয়ে যে রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে পারোনি, তার শোকে তো নারীর মতোই ক্রন্দন করা উচিত।'

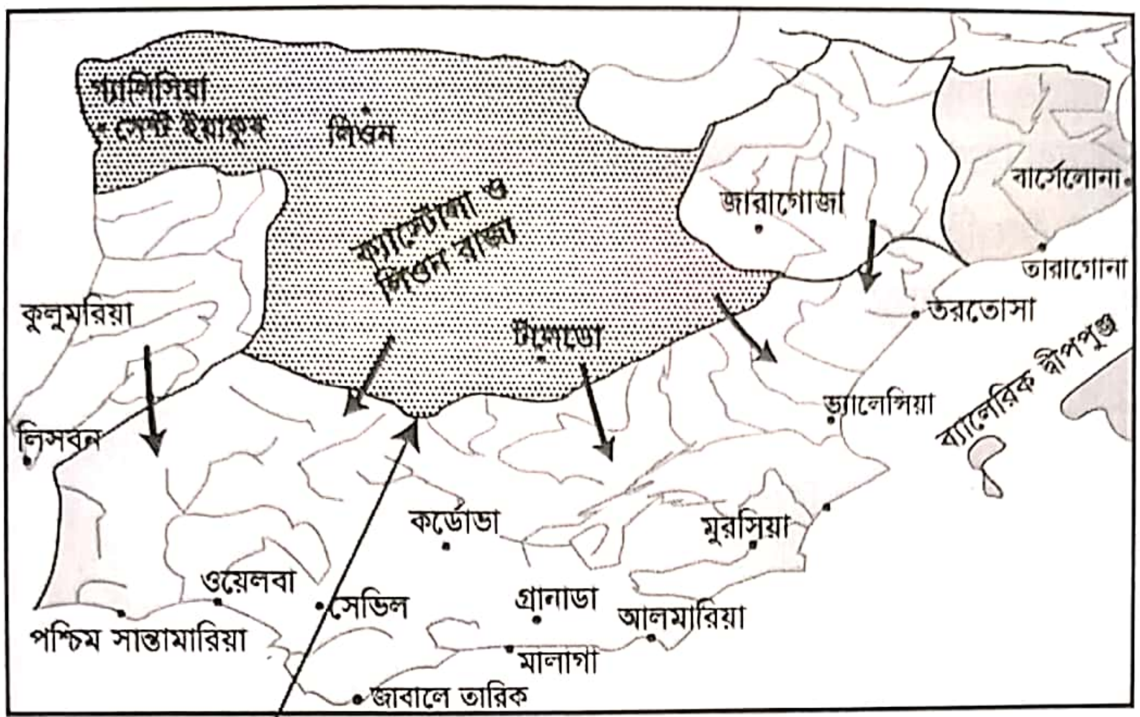
এরপর আবু আবদুল্লাহ হিজরত করে মাগরিবে চলে যান এবং ফেজ নগরীতে বসবাস করেন। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, তিনি ও তার সন্তানরা সেখানে মানুষের করুণা ভিক্ষা করে জীবনযাপন করতেন।

৮৯৭ হিজরি সনের ২ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দের ২ জানুয়ারি আন্দালুসের শেষ ইসলামি দুর্গ গ্রানাডার পতন ঘটে।



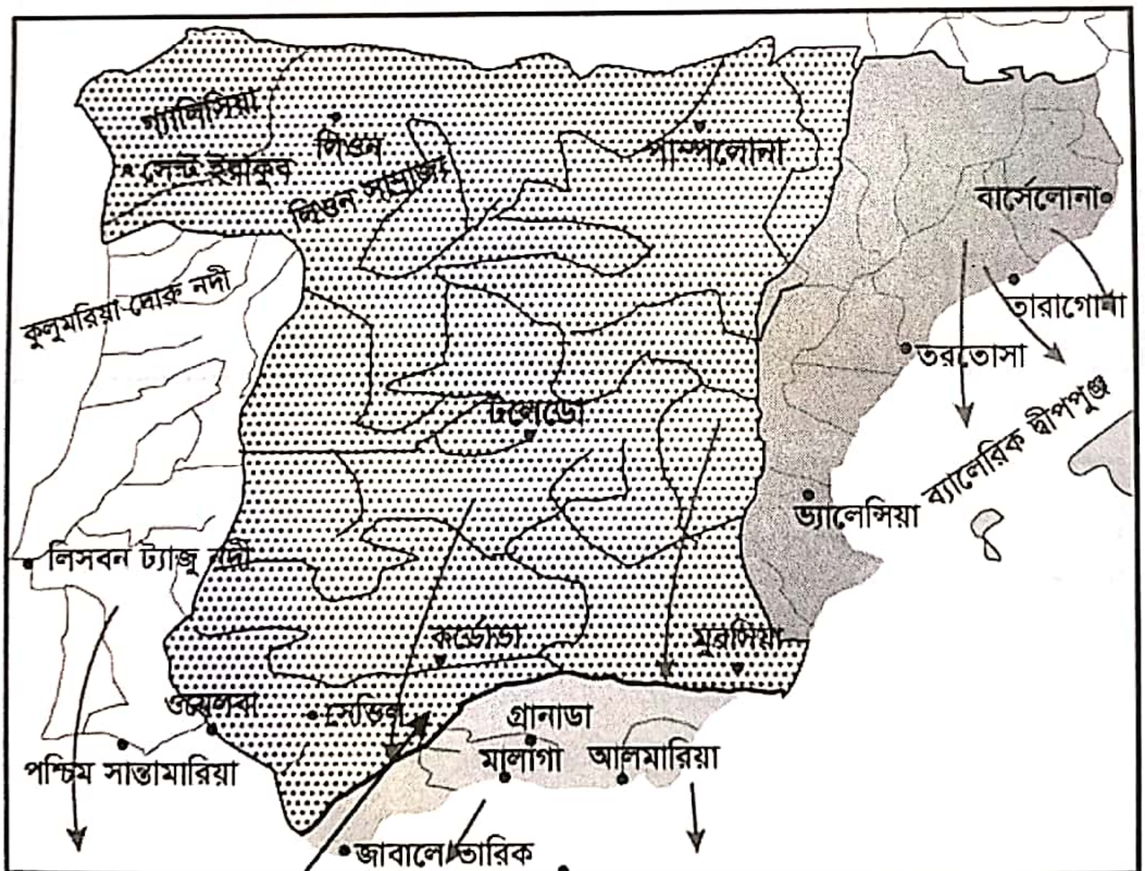
মানচিত্র নং-৮

অষ্টম-দশম খ্রিষ্টীয় শতকে
মুসলিম ভূখণ্ড ও শত্রু ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা



মানচিত্র নং-৯

একাদশ ও দ্বাদশ খ্রিষ্টীয় শতকে
মুসলিম ভূখণ্ড ও শত্রু ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা



মানচিত্র নং-১০

ত্রয়োদশ-পঞ্চদশ শতকে এভাবেই
মুসলমানদের শাসিত অঞ্চল হ্রাস পায়

পতন-পরবর্তী সময়ে আন্দালুস থেকে ইসলাম নিশ্চিহ্নকরণ

আবু আবদুল্লাহর অশ্রুই আন্দালুসে মুসলমানদের শেষ অশ্রু ছিল না। এরপর আন্দালুস ভূমিতে আরও অনেক মুসলমানের অশ্রু ঝরেছে এবং তাদের আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস ভারী হয়েছে। চুক্তি সম্পাদনের কিছু দিন পরই খ্রিষ্টান শাসকগোষ্ঠী চুক্তি অস্বীকার করে এবং শর্তসমূহ লঙ্ঘন করতে শুরু করে। একপর্যায়ে তারা মুসলমানদের ওপর খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। প্রথমদিকে কিছুদিন পরিস্থিতি শান্ত ছিল এবং স্বাধীনভাবে ধর্মপালনের সুযোগ ছিল। গ্রানাডার তৎকালীন বিশপ হারনান্দেজ তালাভেরা উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু বিশপের উদার নীতিতে কার্ডিনাল সিমেন্স চরম অসন্তুষ্ট হয় এবং রানি ইসাবেলাকে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে যে, মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিরক্ষার মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। সিমেন্সের কথায় প্রভাবিত হয়ে ইসাবেলা মুসলমানদের নির্যাতন করার নির্দেশ জারি করেন। মুসলমানরা এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু কার্ডিনাল সিমেন্স পরিস্থিতি আরও কঠিন করে তোলে এবং রানিকে প্ররোচিত করে নতুন আরেকটি ফরমান জারি করে। নতুন ফরমানে মুসলমানদেরকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ বা দেশত্যাগ—দুটির একটি বেছে নেওয়ার অবকাশ দেওয়া হয়। ফরমানে উল্লেখ করা হয়—মুসলমানদের পূর্বপুরুষগণ সকলে খ্রিষ্টান ছিল। তাই গির্জা তাদেরকে জন্মসূত্রে খ্রিষ্টানই গণ্য করে আসছে। কিছুদিন পর মসজিদসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং মূল্যবান গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপিসমূহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি মুসলমানদের জীবনে নেমে আসে অবর্ণনীয় নির্যাতন।

নির্যাতিত মুসলমানদের অনেকে পালিয়ে মাররাকিশ, মিশর ও তুরস্কে চলে যায়। অনেকে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং বাশারাত (Alpujarra) অঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এলাকাটি ছিল বিদ্রোহ পরিচালনার অত্যন্ত উপযোগী ক্ষেত্র। বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য কয়েকটি অভিযান চালানো হয়; কিন্তু প্রতিটি অভিযান ব্যর্থ হয়।

যারা প্রচণ্ড নির্যাতনের মুখে বাহ্যিকভাবে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, তারা অতি সঙ্গোপনে ধর্মীয় বিধানাবলি পালনের চেষ্টা করত। যেসব জলদস্যু আন্দালুস উপকূলে অবতরণ করে খ্রিষ্টানদের সন্তান চুরি করে নিয়ে যেত, তারা তাদেরকে গোপনে সাহায্য করত।

এরপর গ্রানাডায় বনু সিরাজ গোত্রের ফারজ ইবনুল ফারজের নেতৃত্বে নতুন এক বিদ্রোহের সূচনা হয়। ফারজ ইবনুল ফারজ নিপীড়িত মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ি এলাকায় চলে যায়। এক সপ্তাহ না যেতেই বাশারাত অঞ্চলের সকলে অস্ত্র তুলে নেয় এবং খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। উভয়পক্ষের মধ্যে কয়েকবার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। এটি ৯৭৬ হিজরি সনের (১৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দের) ঘটনা। কিন্তু চলমান ঘটনাপ্রবাহ ধীরে ধীরে মুসলমানদের জন্য পরিস্থিতি প্রতিকূল করে তোলে।

শতাব্দীকাল পরেই ১০১৭ হিজরি সনের (১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দের) মধ্যে পুরো স্পেন মুসলিমশূন্য হয়ে যায়। গ্রানাডার পতনের পর থেকে নিয়ে সপ্তদশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত সময়ে স্পেন থেকে বিতাড়িত করা হয় প্রায় ত্রিশ লক্ষ মুসলমানকে। অপরদিকে যারা স্প্যানিশ খ্রিষ্টানদের নির্মম গণহত্যার শিকার হয়, তাদের সংখ্যাও এর কম নয়।

আন্দালুসের মরিস্কোদের[৫১] জীবনে নেমে আসা দুর্যোগের কিছু খণ্ডচিত্র

- ৯০৭ হিজরি সনের ৪ মুহাররম (১৫০১ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জুলাই) রাজকীয় ফরমান জারি করা হয়—গ্রানাডায় কোনো মুসলমানের অস্তিত্ব থাকতে পারবে না। এখনো কোনো মুসলমান থেকে গেলে সে বাইরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না। কেউ এ নির্দেশ অমান্য করলে তার শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড ও সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ।
- ৯০৮ হিজরি সনের ১৩ রমজান (১৫০৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ মার্চ) ফরমান জারি করা হয়—গ্রানাডায় এখনো (ক্রীতদাস বাদে) যেসব মুসলমান রয়ে গেছে, তাদের মধ্যে যাদের বয়স ইতিমধ্যে (পুরুষদের ক্ষেত্রে) ১৪ বছর ও (নারীদের ক্ষেত্রে) ১২ বছর হয়ে গেছে, তাদের চলতি বছরের মে মাস শুরু হওয়ার পূর্বে অবশ্যই গ্রানাডা ত্যাগ করতে হবে। তবে দেশত্যাগের সময় কোনো

[৫১]. গ্রানাডায় মুসলমানদের পতনের পরও যে সমস্ত মুসলিম নাগরিক স্পেনেই বসবাস করে এবং পরে 'দেশত্যাগ বা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ'-নির্দেশের সম্মুখীন হয়, স্প্যানিশ খ্রিষ্টানরা তাদেরকে অবজ্ঞা প্রদর্শন ও মর্যাদাহানির জন্য 'মরিস্কো' বলে ডাকত।

সম্পদ সঙ্গে নেওয়া যাবে না এবং দেশত্যাগ করে আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলে যাওয়া যাবে না। কারণ, তা একটি ইসলামি রাষ্ট্র।

- ৯০৯ হিজরি সনের ১৯ রবিউল আউয়াল (১৫০৩ খ্রিষ্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর) রাজকীয় প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়—মরিস্কোরা (নতুন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণকারী) আগামী দু-বছর নিজেদের সম্পদে কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এ সময় কেউ দেশত্যাগ করতে চাইলে কেবল অ্যারাগোন বা পর্তুগালে যেতে পারবে। কারণ, এ দুটি অমুসলিম রাষ্ট্র।
- ৯২০ হিজরি সনের ৬ জুমাদাল উলা (১৫১৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জুন) পোপের পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে ক্যাথলিক ধর্মগ্রহণে বাধ্য করার নির্দেশ জারি করা হয়। নির্দেশে বলা হয়—যে ব্যক্তি ধর্ম পরিবর্তনে অস্বীকৃতি জানাবে, তাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্পেন ত্যাগ করতে হবে কিংবা সে বাকি জীবন ক্রীতদাস হিসেবে কাটাবে। নির্দেশের শেষে সকল মসজিদকে গির্জায় রূপান্তরিত করার কথা বলা হয়। নির্দেশ মোতাবেক অনেকে ক্যাথলিক ধর্মমত গ্রহণ করলেও কেউই নির্যাতন ও বাস্তুচ্যুতকরণ থেকে রেহাই পায়নি।
- ১০০৭ হিজরি সনে (১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে) রাজকীয় নির্দেশ জারি করা হয়—সকল মরিস্কো যুবক ও বৃদ্ধদের দাসে পরিণত করতে হবে। তাদের সম্পদ জব্দ করা হবে এবং তাদেরকে দেশের বাইরে নির্বাসিত করা হবে। আর শিশুদেরকে ধরে নিয়ে খ্রিষ্টধর্মের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে খ্রিষ্টধর্মের শিক্ষাদীক্ষায় গড়ে তোলা হবে।
- ১০১৮ হিজরি সনের ২২ জুমাদাল উখরা (১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর) ফরমান জারি করা হয়—ফরমান ঘোষণা-পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে সকল মরিস্কোকে বার্বারদের দেশে (মাগরিবে) নির্বাসিত করতে হবে। এই ফরমান জারি করার পর দশ লক্ষের অধিক মানুষকে নির্বাসিত করা হয়।

- অবশিষ্ট মরিস্কোদের ওপর স্প্যানিশ খ্রিষ্টান সরকার বিচিত্র ও অমানবিক নানারকম নির্যাতন চালায়। যেমন ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, নির্বাসিত করা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, মিথ্যা ও মনগড়া নানা অভিযোগ আরোপ করে বিচারের নামে গাধার পিঠে চড়িয়ে শহরের রাস্তাঘাটে ঘোরানো এবং গলায় কার্ড ঝুলিয়ে দিয়ে তাতে তার নাম ও অপরাধ লিখে দেওয়া ইত্যাদি। যেসব অপরাধে মরিস্কোদের অভিযুক্ত করা হতো, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—নিয়মিত গোসল করা, মৃত ব্যক্তিকে নতুন কাফন পরানো, ইসলামের নবীর আলোচনা করা, কুরআন পাঠ করা, আরবি গ্রন্থ বা আরবি লেখা পৃষ্ঠা সংরক্ষণ করা, আরবি সংগীত গাওয়া, শূকরের গোশত আহার বা মদপানে বিরত থাকা, অজু করা, নামাজ-রোজা করা ইত্যাদি![৫২]

---

৫২. রানি ইসাবেলা মরিস্কোদের নির্যাতন করার জন্য স্প্যানিশ তদন্ত কমিশন (The Tribunal of the Inquisition) নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্থাটি খ্রিষ্টবাদ সংরক্ষণের নামে মরিস্কোদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালাত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য—মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত ড. রাগিব সারজানির *আন্দালুসের ইতিহাস*।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উবায়দি সাম্রাজ্যের ইতিহাস

[২৯৭-৫৬৭ হিজরি—৯০৯-১১৭১ খ্রিষ্টাব্দ]

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের প্রতি দৃশ্যমান নির্ভরতা ছিল উবায়দি সাম্রাজ্যের খলিফাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উবায়দি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে অত্যুজ্জ্বল একটি নাম মানসুর বিন মুকশির! এই খ্রিষ্টান লোকটি আজিজ বিল্লাহর প্রাসাদের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিল। আরেক খ্রিষ্টান ঈসা বিন নাস্তুরাস ছিল তার একান্ত সচিব। ইহুদি মানশা ছিল শাম অঞ্চলে আজিজ বিল্লাহর নিযুক্ত গভর্নর। উবায়দি সাম্রাজ্যের আরেক উজ্জ্বল নক্ষত্র ইহুদি ইয়াকুব বিন কিল্লিস! আজিজ বিল্লাহ মিশরের জনসাধারণকে শিয়া ইসমাইলিয়া মতাদর্শ শিক্ষাদানের দায়িত্ব তার হাতেই ন্যস্ত করেছিলেন! আজিজ বিল্লাহ তাকে এত ভালোবাসতেন যে, একবার তাকে বলেছিলেন—'আমার মন চায়, তোমাকে বিক্রি করা হোক আর আমি তোমাকে আমার পুরো রাজত্বের বিনিময়ে কিনে নিই।'

নির্বোধ আজিজের এতটুকু উপলব্ধিও ছিল না যে, তার এই নীতির কারণে তো বাস্তবে তার রাজত্ব বিক্রি হয়েই গেছে! এই ইহুদি-খ্রিষ্টান তোষণনীতিই মিশরে উবায়দি শাসনামলকে করে তুলেছিল পারস্পরিক হানাহানি, দুর্যোগ ও কঠোরতার যুগ।

উবায়দি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কালে উবায়দিরা আব্বাসিদের নীতি অবলম্বন করেছিল। প্রথমে তারা মিশর, মাগরিব ও ইয়ামেনে নিজেদের মতাদর্শ প্রচার করে এ সকল অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যক অনুসারী ও সহযোগী তৈরি করতে সক্ষম হয়। এমনকি আগলাবিয়া রাষ্ট্রের শেষ যুগের উজিরগণও উবায়দি মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়। উবায়দি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা-পূর্ববর্তী শেষ স্তরে আফ্রিকায় উবায়দি মতাদর্শের প্রধান প্রচারক ছিলেন আবু আবদুল্লাহ আলি বিন হাওশাব শিয়ি। তিনি ২৮০ হিজরি সন (৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে মাগরিবে এবং ২৮৯ হিজরি সন (৯০২ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে উত্তর আফ্রিকায় উবায়দি মতাদর্শ প্রচারে ব্যাপক পরিসরে কাজ করেন।

আবু আবদুল্লাহ তার অনুসারীদের নিয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করতে সক্ষম হন এবং তাদেরকে নিয়ে আগলাবিয়া রাষ্ট্রে উপর্যুপরি আক্রমণ করেন। ২৯৬ হিজরি সন (৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত ব্যাপ্ত একটানা প্রায় পাঁচ বছরের লড়াইয়ের পর তিনি আগলাবিয়া সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটান। এর ফলে মাগরিবের অধিকাংশ অঞ্চলে উবায়দিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কায়রোয়ান নগরীর পশ্চিমে অবস্থিত সকল এলাকায় উবায়দিদের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম হয়।

আগলাবিয়া সাম্রাজ্যে অভিযান চলাকালেই আবু আবদুল্লাহ শিয়ি উবায়দুল্লাহর[৫৩] কাছে বার্তা পাঠিয়ে তাকে মাগরিবে আগমন করতে

---

৫৩. উবায়দুল্লাহ হচ্ছেন উবায়দি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তার বংশপরিচয় নিয়ে ঐতিহাসিক ও কুলজিবিশারদগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কতক ঐতিহাসিক তাকে হজরত আলি বিন আবু তালিব রাযি.-এর বংশোদ্ভূত উল্লেখ করলেও অধিকাংশের মত হলো, তিনি মূলত ইহুদি বংশোদ্ভূত। আবার কেউ কেউ তাকে কারামাতিয়াদের দিকেও সম্বন্ধিত করেছেন। যারা তাকে আলি রাযি.-এর প্রতি সম্বন্ধিত করেন, তাদের মতে তার বংশধারা এরূপ— উবায়দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বিন জাফর বিন আলি বিন হাসান বিন আলি বিন আবু তালিব। [মূল গ্রন্থের টীকা]

তার বংশপরিচয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছা এ জন্যও কঠিন যে, উমাইয়া শাসনামলের শেষদিকে এবং আব্বাসি আমলে আলাবি নেতৃবৃন্দের কয়েক পুরুষ আত্মগোপন করে ছিলেন এবং সরকার ও বৃহত্তর জনসাধারণ হতে নিজেদের গোপন রেখে শিয়া মতবাদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন। এ কারণে তাদের প্রত্যেকের সন্তানসন্ততির পরিচয় ও সংখ্যাও জনসাধারণ জানতে পারত না।=

বলেন। উবায়দুল্লাহ কালবিলম্ব না করে মাগরিব সফরের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং যথেষ্ট সতর্কতা ও গোপনীয়তা অবলম্বন করেন। তিনি মিশর অতিক্রমের সময় সেখানকার প্রচারক ও অনুসারীরা তাকে স্বাগত জানায়। এরপর পথে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত ও কষ্টকর অভিজ্ঞতা পাড়ি দিয়ে অবশেষে তিনি উচ্চ মাগরিবের সিজিলমাসা অঞ্চলে পৌঁছান। উবায়দুল্লাহ সিজিলমাসার[৫৪] শাসক ইয়াসা বিন মিদরারকে উদার হস্তে অর্থসম্পদ প্রদান করে নিরাপদে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। তবে ২৯৬ হিজরি সনে (৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে) আবু আবদুল্লাহ শিয়ি আগলাবিদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করলে ইয়াসার আচরণ পাল্টে যায়। ইয়াসা উবায়দুল্লাহকে তার পরিবার ও কিছু অনুসারীসহ বন্দি করেন। পরবর্তী সময়ে আবু আবদুল্লাহর ক্ষমতার পরিধি আরও বিস্তৃত হয় এবং সিজিলমাসাও তার কর্তৃত্বে চলে আসে। তখন সিজিলমাসার শাসক ইয়াসা বিন মিদরার পালিয়ে যান। আবু আবদুল্লাহ সিজিলমাসায় পৌঁছে উবায়দুল্লাহকে কারামুক্ত করেন। এরপর উবায়দুল্লাহর হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করা হয়। উবায়দুল্লাহ বিশাল এক বাহিনী নিয়ে (আগলাবিয়া রাষ্ট্রের রাজধানী) রাক্কাদায় পৌঁছান। রাক্কাদার অধিবাসীরা তাকে উষ্ণ অভিবাদন জানায়। তিনি রাক্কাদাকে তার নবগঠিত রাষ্ট্রের রাজধানী নির্বাচিত করেন, পুরো অঞ্চলের মিম্বরসমূহে খুতবায় তার নাম পাঠ করার নির্দেশ দেন এবং 'আমিরুল মুমিনিন আল-মাহদি' উপাধি ধারণ করেন। এভাবেই উত্তর আফ্রিকায় ফাতিমি নামধারী উবায়দি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

=যেহেতু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর দৃষ্টিতে হজরত ফাতিমা রাযি.-এর প্রতি তার বংশ-সম্বন্ধ সঠিক নয়, তাই তার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যকে ফাতিমি সাম্রাজ্য না বলে উবায়দি সাম্রাজ্য অভিহিত করাই সমীচীন।

৫৪. সিলিজমাসায় তখন মিদরারিয়া রাষ্ট্র নামে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। মিদরারিয়া রাষ্ট্রের ব্যাপ্তি ছিল ১৪০ হিজরি হতে ৩৪৫ হিজরি সন (৭৫৭-৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত। অবশ্য ২৯৬ হিজরি সনের পর থেকে মিদরারিয়া রাষ্ট্র উবায়দি সাম্রাজ্যের করদরাজ্য ছিল। মিদরারিয়া রাষ্ট্রের শাসকপরিবার (বার্বার উপগোষ্ঠী) বনু মিদরার গোত্র ছিল খারিজি সাফারিয়া মতাদর্শের অনুসারী।

৬৩—দ্রষ্টব্য—৫২

একক খিলাফতব্যবস্থা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের সেতুবন্ধন

মুসলিম উম্মাহর অবিচ্ছিন্নতা ও কাফিরশক্তির মোকাবিলায় দৃঢ়তার ক্ষেত্রে একক খিলাফতব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর থেকে পৃথিবীর সকল ভূখণ্ডের মুসলমান এক ও অভিন্ন জাতি হিসেবে এক খলিফার অধীনে বসবাস করত। স্থান-বর্ণ ও জাতি-পরিচয়ের ভিন্নতা সত্ত্বেও কখনোই মুসলিমবিশ্বে একাধিক খলিফার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। বনু উমাইয়ার শাসনামলে যদিও সীমিত কিছু সময় দুই খলিফার অস্তিত্ব ছিল; কিন্তু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর মতাদর্শ অনুসারে তখন আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি. ছিলেন একমাত্র বৈধ খলিফা। উমাইয়া শাসনব্যবস্থার পতন ও আব্বাসি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর ইসলামি বিশ্বের নানা অংশে বিভিন্ন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও আব্বাসি খলিফা ব্যতীত অন্য কেউ নিজেকে খলিফা বলে দাবি করেনি। ২৯৭ হিজরি সনে যখন উবায়দি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উবায়দুল্লাহ আল-মাহদি নিজেকে খলিফা ও আমিরুল মুমিনিন দাবি করেন, মূলত তখনই মুসলিমবিশ্ব প্রথমবারের মতো খিলাফত প্রশ্নে বিভক্তির শিকার হয়। উনিশ বছর পর ৩১৬ হিজরি সনে যখন আন্দালুসে আবদুর রহমান আন-নাসিরও নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন, তখন মুসলিমবিশ্ব খিলাফতের ক্ষেত্রে তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সাতাশি বছর পর ৪০৩ হিজরি সনে কর্ডোভাকেন্দ্রিক খিলাফতব্যবস্থার পতন ঘটলে মুসলিমবিশ্ব আবারও দুই খলিফার যুগে প্রবেশ করে। এরও একশ চৌষট্টি বছর পর ৫৬৭ হিজরি সনে উবায়দি সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে আবারও মুসলিমবিশ্ব এক-অভিন্ন খিলাফতব্যবস্থায় ফিরে আসে। যদিও এ সময় আব্বাসি খিলাফতের ভঙ্গুর অবস্থার কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্র আব্বাসি খলিফার কর্তৃত্ব শিকার করত না; কিন্তু তারা আব্বাসি খলিফার মোকাবিলায় ভিন্ন খলিফা দাঁড় করানোর চিন্তাও করেনি। ৬৫৬ হিজরি সনে তাতার আগ্রাসন-পরবর্তী সময়ে অল্প কিছুদিন মুসলিমবিশ্ব খিলাফতশূন্য থাকলেও ৬৫৯ হিজরি সনে মিশরে আবারও আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

খলিফাদের কর্তৃত্ব ও সমৃদ্ধির যুগ

[২৯৭-৪৮৭ হিজরি—৯০৯-১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দ]

মাগরিব অঞ্চলে অব্যাহত গোলযোগ ও বিদ্রোহ মোকাবিলা

যেহেতু মাগরিবে উবায়দি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সর্বাধিক ভূমিকা ছিল আবু আবদুল্লাহ শিয়ির, তাই বিশেষ করে কুতামা গোত্রসহ[৫৫] এ অঞ্চলের সাধারণ জনগণের মাঝে আবু আবদুল্লাহর যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল। আবু আবদুল্লাহর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় উবায়দি শাসক উবায়দুল্লাহ তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন এবং নিজের কর্তৃত্ব ও প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ২৯৮ হিজরি সনের জুমাদাল উখরা মাসে (৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে) আবু আবদুল্লাহ ও তার ভাই আব্বাসকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। ফলে কুতামা গোত্রসহ মাগরিবের অন্যান্য অধিবাসীরা তার প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অবশ্য উবায়দুল্লাহ শেষ পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে শান্ত করতে সক্ষম হন।

আগলাবিয়া রাষ্ট্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত উবায়দি সাম্রাজ্যের প্রাথমিক পরিধি নিয়ে উবায়দুল্লাহ মোটেও তুষ্ট ছিলেন না। তিনি এবার পুরো মাগরিব অঞ্চলকে উবায়দি সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে আসার মনস্থ করেন। ৩১২ হিজরি সনে (৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি মুসা বিন আবুল আফিয়ার মাধ্যমে ইদরিসিয়া রাষ্ট্রের বিরাট অংশের পতন ঘটাতে সক্ষম হন। কিন্তু মুসা বিজিত অঞ্চলে নিজের কর্তৃত্ব ও প্রভাব বৃদ্ধি করার পর উবায়দিদের আনুগত্য প্রত্যাহার করে আন্দালুসের উমাইয়া খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসিরের আনুগত্য স্বীকার করেন। উবায়দুল্লাহ তার পুত্র ও ঘোষিত যুবরাজ (ওলিয়ে আহদ) আবুল কাসিম আল-কায়িমকে ৩১৫ হিজরি সনে

---

৫৫. কুতামা একটি বার্বার গোত্র। উবায়দুল্লাহর স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় কুতামা গোত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

(৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে) মুসার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রেরণ করেন। আবুল কাসিম মুসাকে পরাজিত করে সেখানে উবায়দিদের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করেন।

পরবর্তী সময়ে উবায়দুল্লাহ মাহদিয়া নগরী প্রতিষ্ঠা করে উবায়দি সাম্রাজ্যের রাজধানী রাক্কাদা হতে মাহদিয়ায় স্থানান্তর করেন। মাহদিয়া নগরী তিনদিক থেকে সমুদ্রবেষ্টিত ছিল। তিনি মাহদিয়ায় সুবিখ্যাত 'দারুস সিনাআ' (জাহাজ নির্মাণ কারখানা) প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে একসঙ্গে দুইশ জাহাজের স্থান সংকুলান হতো। এরপর উবায়দুল্লাহ মাহদিয়া নগরীর সন্নিকটেই যাবিলা (Zawila) নগরী প্রতিষ্ঠা করেন।

৩১৬ হিজরি সনে (৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে) আবু ইয়াযিদ মুখাল্লাদ বিন কিদাদ নামক জনৈক ব্যক্তি উবায়দুল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। উবায়দুল্লাহর মৃত্যুর পর তার পুত্র আবুল কাসিম আল-কায়িমের শাসনামলেও এ বিদ্রোহ চলমান ছিল। আবু ইয়াযিদ তুযিয়ার (Tozeur) নগরীতে বেড়ে উঠেছিল এবং সেখানেই কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। খারিজি মতাদর্শের শাখা সাফারিয়া মতাদর্শ গ্রহণকারী আবু ইয়াযিদ শিয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দিলে খারিজি মতাদর্শীরা তার পক্ষে সমবেত হয়। কিছু বার্বার সম্প্রদায়ও তার দলে যোগ দেয় এবং ৩৩১ হিজরি সনে (৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে) সকলে আবু ইয়াদিদের হাতে উবায়দিদের বিরুদ্ধে লড়াই করার বায়আত গ্রহণ করে। বার্বাররা মনে করত যে, তারাই আন্দালুস বিজয় করেছে এবং পরবর্তী সময়ে মাগরিবে উবায়দিদের খিলাফত প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে; অথচ বিনিময়ে তারা বারবার বঞ্চিত হয়েছে। তাই তারা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় উবায়দি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আবু ইয়াযিদ তাদেরকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় উবায়দি খলিফা আবুল কাসিম আল-কায়িম তার পিতা উবায়দুল্লাহর চেয়েও নিকৃষ্ট ছিল। সে ছিল অভিশপ্ত ধর্মদ্রোহী। সে প্রকাশ্যে নবীদের নিন্দা ও গালিগালাজ করত। তার পক্ষ থেকে ঘোষক

জনসমক্ষে ঘোষণা করত—'তোমরা গুহা ও তার প্রতিবেশীকে[৫৬] অভিসম্পাত করো।' আবুল কাসিম অনেক আলিমকে হত্যা করেছিল। ৩৩৪ হিজরি সনে (৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে) তার মৃত্যু হয়।

আবু ইয়াযিদের বিদ্রোহ উবায়দি সরকারকে যথেষ্ট ভোগান্তিতে ফেলে দিয়েছিল। অবশেষে ৩৩৬ হিজরি সনে (৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে) তারা এ বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়। তবে এর পেছনে প্রচুর শক্তি ব্যয়ের ফলে মাগরিবে উবায়দিদের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে যায় এবং একের পর এক বিদ্রোহে উত্তর আফ্রিকার পরিস্থিতি শোচনীয় হয়ে পড়ে।

আবুল কাসিম আল-কায়িমের মৃত্যুর পর ৩৩৪ হিজরি সনে তার পুত্র ইসমাইল আবু তাহির 'আল-মানসুর' উপাধি ধারণ করে উবায়দি সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। ৩৩৭ হিজরিতে (৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি মানসুরিয়া নগরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং মানসুরিয়াকে সাম্রাজ্যের রাজধানী নির্বাচিত করেন। নিরাপত্তাপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত মানসুরিয়া নগরীর পাঁচটি প্রবেশদ্বার ছিল—সম্মুখদ্বার, পূর্ব দ্বার, যাবিলামুখী দ্বার, কুতামা দ্বার ও আল-ফুতুহ দ্বার। উবায়দি সেনাবাহিনী আল-ফুতুহ দ্বার দিয়ে অভিযানে বের হতো। আল-মানসুরের শাসনামলে মানসুরিয়া নগরী বাণিজ্য ক্ষেত্রে ব্যাপক সমৃদ্ধি অর্জন করে।

আল-মানসুরের পর তার পুত্র মাআদ 'মুইয লি দ্বীনিল্লাহ' উপাধি ধারণ করে উবায়দি সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি মাগরিবে উবায়দি সরকারের কর্তৃত্ব ও প্রভাব দৃঢ়করণে প্রচুর কাজ করেন। মুইয তার সেনাপতি জাওহার সিকিল্লিকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বিদ্রোহীদের দমনের দায়িত্ব দেন এবং সিউটা ও তাঞ্জিয়ার বাদে পুরো মাগরিবের মিম্বরসমূহে উবায়দি মতাদর্শের প্রচারণা চালু করতে সক্ষম হন।

তবে প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে—উবায়দি শাসকগণ মাগরিব অঞ্চলে নিজেদের পূর্ণ কর্তৃত্ব ও স্থায়ী অবস্থান গড়ে তুলতে যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালালেও তা সফল হয়নি। বরং প্রচুর সামরিক শক্তি ব্যয় করে একটি বিদ্রোহ দমন

---

৫৬. নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের সফরে হজরত আবু বকর রাযি.-কে সঙ্গে নিয়ে সাওর গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন। শিয়ারা এই অভিশপ্ত বাক্যের মাধ্যমে সেদিকেই ইঙ্গিত করত।

করলেই নতুন আরেকটি বিদ্রোহ শুরু হয়ে যেত এবং উবায়দি শাসকপরিবারকে নির্ঘুম রজনী উপহার দিত।

উবায়দি শাসকদের মিশর জয়ের প্রচেষ্টা

মাগরিব অঞ্চলে অব্যাহত বিদ্রোহ প্রচেষ্টার কারণেই উবায়দিরা মিশরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। প্রথম উবায়দি শাসক উবায়দুল্লাহ আল-মাহদি বেশ কয়েকবার মিশর জয়ের প্রচেষ্টা চালান। ৩০১ হিজরি সনে (৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি নিজে মিশরের উদ্দেশে অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু মিশরের প্রাণকেন্দ্র ফুসতাত নগরী পর্যন্ত পৌঁছার পথে তার বাহিনীর সামনে নীলনদ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। বাধ্য হয়ে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরে আসেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে বারকা (Cyrenaica) অঞ্চলে তার বাহিনী আব্বাসি খলিফা মুকতাদির বিল্লাহর প্রেরিত বাহিনীর মুখোমুখি হয় এবং তুমুল লড়াইয়ের পর পরাজিত হয়ে মাগরিবে ফিরে আসে।

৩০৬ হিজরি সনে (৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে) উবায়দুল্লাহ তার পুত্র আবুল কাসিম আল-কায়িমের নেতৃত্বে আরেকটি বাহিনী মিশর অভিমুখে প্রেরণ করেন। আবুল কাসিম আলেকজান্দ্রিয়া জয় করে জিযা (Giza) অভিমুখে রওনা হন। কিন্তু আব্বাসি খলিফার তুর্কি সেনাপতি মুনিস আল-খাদিম উবায়দি বাহিনীকে পরাভূত করেন এবং উবায়দিদের যুদ্ধজাহাজগুলো জ্বালিয়ে দেন।

উবায়দুল্লাহ ৩২১ হিজরি সনে (৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে) হাবশ বিন আহমাদ মাগরিবির নেতৃত্বে মিশরের উদ্দেশে আরেকটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু এবারের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয় এবং উক্ত বাহিনী ৩২২ হিজরি সনে ইখশিদি শাসক মুহাম্মাদ বিন তুগজ ইখশিদির কাছে পরাজিত হয়। শেষোক্ত দুটি অভিযানে উবায়দি বাহিনী বাহরাইনের কারামাতি শাসক ইবনে তাহির জান্নাবির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে অগ্রসর হয়েছিল।

৩২৩ হিজরি সনে (৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে) দ্বিতীয় উবায়দি শাসক আবুল কাসিম মিশরের উদ্দেশে আরেকটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা খুব সহজেই আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রবেশ করে এবং মিশরের বিভিন্ন নেতার সহায়তা লাভ করে। এর ফলে অনুমিত হচ্ছিল যে, মিশরে ইতিমধ্যে উবায়দি মতাদর্শ বিস্তৃতি লাভ করেছে। কিন্তু এবারও উবায়দিদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং

উবায়দি বাহিনী ইখশিদি বাহিনীর হাতে পরাজিত হয়। এরপর থেকে উবায়দিরা বিভিন্ন কৌশলে মিশরের শাসকদের পরাভূত করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।

৩৩৪ হিজরি সনে (৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে) তৎকালীন মিশর-প্রশাসক (আবুল কাসিম আনুজুরের পক্ষে দায়িত্ব পালনকারী) কাফুর একইসঙ্গে আব্বাসি খলিফা ও উবায়দি খলিফার সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে ব্রতী হন। তিনি মাগরিবের অধিপতি উবায়দি সরকারের কাছে বিভিন্ন উপহারসামগ্রী প্রেরণ করতেন এবং তাদের প্রতি নিজের আনুগত্য-ভাব প্রকাশ করতেন। পাশাপাশি তিনি আব্বাসিদের প্রতিও আনুগত্যের ভান করতেন। এই পরিস্থিতির মধ্যেই চতুর্থ উবায়দি খলিফা মুইয মিশরে উবায়দি মতাদর্শের পরিধি বিস্তৃতির লক্ষ্যে কাজ করতে থাকেন এবং দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর কাফুরের অধীনস্থ বড় বড় কর্মকর্তা ও সেনাপতিদের তার আনুগত্যের বায়আত গ্রহণ করাতে সক্ষম হন। পাশাপাশি তিনি মাগরিব থেকে মিশর পর্যন্ত পথ নির্মাণ ও পথের ধারে কূপ খননের কাজও করেন। ৩৫৬ হিজরি সন পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে।

৩৫৭ হিজরি সনে (৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে) কাফুর মৃত্যুবরণ করলে মিশরের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। জাতীয় অর্থনীতি দুর্যোগের সম্মুখীন হয়; নীলনদের প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। ইখশিদি সরকার সৈনিকদের বেতন-ভাতা প্রদানেও অক্ষম হয়ে পড়ে। তখন মিশরের নেতৃবৃন্দের অনেকে উবায়দি খলিফা মুইয লি দ্বীনিল্লাহর কাছে বার্তা পাঠিয়ে তাকে মিশরে আগমনের অনুরোধ জানায়।

৩৫৮ হিজরি সনের ১৪ রবিউস সানি (৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মার্চ) জাওহার সিকিল্লির নেতৃত্বে এক লক্ষ উবায়দি সৈন্যের একটি বাহিনী মিশর অভিমুখে রওনা হয়। পথে কোনো ধরনের প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই তারা আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রবেশ করে। উবায়দি বাহিনীর আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছার সংবাদ ফুসতাতে পৌঁছলে সেখানকার উজির জাফর ইবনুল ফুরাত ও তার সঙ্গীরা জাওহারের সঙ্গে মিশরবাসীর নিরাপত্তাদানের শর্তে সন্ধিচুক্তি করা সমীচীন মনে করে। ৩৫৮ হিজরি

সনের ১৮ রজব (৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুন) তারা তারুজায়[৫৭] জাওহারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। জাওহার তাদের জানমালের নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং নিরাপত্তা-চুক্তিতে সুস্পষ্ট উল্লেখ করেন যে, তিনি মিশরে কেবল জনকল্যাণের লক্ষ্যেই আগমন করেছেন। মিশরের জনগণ তাদের সুন্নি ধর্মমতের ওপর বহাল থাকতে পারবে; তাদেরকে শিয়া মতবাদ গ্রহণে বাধ্য করা হবে না।

তবে মিশরীয় সৈন্যদের বড় একটি অংশ সন্ধিচুক্তি প্রত্যাখ্যান করে জাওহার সিকিল্লির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়ায়। অবশ্য শেষপর্যন্ত তারাও আত্মসমর্পণ করে এবং পুনরায় নিরাপত্তা প্রার্থনা করে।

কায়রো নগরীর পত্তন এবং জামে আযহার প্রতিষ্ঠা

উবায়দি সাম্রাজ্যের অধীনে মিশরে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ৩৫৮ হিজরি সনের ১৭ শাবান (৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৬ জুলাই) ফুসতাতের উত্তরে মানসুরিয়া (কায়রো) নগরীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। পাশাপাশি উবায়দি খলিফা মুইযের বসবাসের জন্য একটি রাজপ্রাসাদের ভিত্তিও স্থাপিত হয়। পরে প্রাসাদটি 'প্রাচ্য প্রাসাদ' ও 'মহান প্রাসাদ' নামে পরিচিতি লাভ করে।

পত্তনের পর প্রথম চার বছর কায়রো নগরী মানসুরিয়া নামে পরিচিত ছিল। এরপর মুইয শুভলক্ষণ হিসেবে নগরীটির 'কায়রো'[৫৮] নামকরণ করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, শীঘ্রই তিনি এই নগরীর নামের বরকতে আব্বাসিদের পরাভূত করবেন। জাওহার কায়রোর নগরপ্রাচীরে চারটি দ্বার নির্মাণ করেন—আন-নাসর দ্বার, আল-ফুতুহ দ্বার, যুবাইলা দ্বার (Bab Zuweila) ও আল-কাওস দ্বার।

এরপর সেনাপতি জাওহার ৩৫৯ হিজরি সনে (৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে) জামে আযহার মসজিদের নির্মাণ শুরু করেন। দুই বছরের মধ্যে জামে আযহারের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। জামে আযহার নির্মাণ করা হয়েছিল মিশরে উবায়দি মতাদর্শের বিশেষ প্রতীক হিসেবে। উবায়দিরা আশঙ্কা করছিল যে, মিশরের অন্যান্য মসজিদে যদি উবায়দি মতাদর্শ প্রচার করা

---

৫৭. তারুজা : আধুনিক মিশরের বুহায়রা প্রদেশের অন্তর্গত আবুল মাতামির প্রশাসনিক অঞ্চলের একটি জনপদ।

৫৮. কায়রোর আরবি নাম আল-কাহিরা (القاهرة)। শব্দটির অর্থ—পরাভূতকারী।

হয়, তাহলে মিশরবাসী বিদ্রোহ করতে পারে। ৩৬১ হিজরি সনের ৭ রমজান (৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২২ জুন) জামে আযহারে নামাজ আদায় শুরু হয় এবং মিম্বরে উবায়দি খলিফা মুইযের নামে দোয়া করা হয়। এরপর মিশরে আব্বাসি খলিফার পরিবর্তে উবায়দি খলিফার নামে মুদ্রা প্রচলন করা হয়। জাওহার মিশরবাসীর জন্য (আব্বাসিদের প্রতীক) কৃষ্ণ পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ করেন। তিনি শিয়াদের রীতি অনুযায়ী খুতবায় নিম্নোক্ত অংশটুকু বৃদ্ধি করার নির্দেশ দেন—

> হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদ মুসতাফার ওপর শান্তি বর্ষণ করুন; শান্তি বর্ষণ করুন আলি মুরতাযা ও ফাতেমা বাতুলের ওপর। আরও শান্তি বর্ষণ করুন রাসুলের দুই দৌহিত্র হাসান-হুসাইনের ওপর, যাদেরকে আপনি পাপমুক্ত করেছেন এবং পূত-পবিত্র করেছেন। হে আল্লাহ, আপনি শান্তি বর্ষণ করুন আমিরুল মুমিনিনের পিতৃপুরুষগণের ওপর; যারা ছিলেন সুপথপ্রাপ্ত, পথপ্রদর্শক ও হিদায়াতের পথের ইমাম।

উবায়দিরা যদিও অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা মিশরবাসীকে সুন্নি মতাদর্শ পরিবর্তন করে শিয়া মতবাদ গ্রহণে বাধ্য করবে না; কিন্তু তারা নিজেদের অঙ্গীকার রক্ষার পরিবর্তে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করে।

- উবায়দিরা বিচারকসহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে শিয়াদেরকে নিযুক্ত করে।
- তারা বড় বড় মসজিদগুলোকে শিয়া মতবাদ প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত করে।
- শিয়া মতাদর্শের প্রচারের জন্য 'দাঈ আদ-দুআত' নামে একটি নতুন পদ তৈরি করা হয়। এ পদে শিয়া মতাদর্শধারী বড় কোনো আলিমকে নিযুক্ত করা হতো। দাঈ আদ-দুআত পদবিধারী ব্যক্তি প্রধান বিচারকের সমমর্যাদাসম্পন্ন বিবেচিত হতেন। তার অধীনে বারোজন প্রধান সহকারী ও সারাদেশে নিযুক্ত অসংখ্য প্রতিনিধি কাজ করত। অনেক সময় একই ব্যক্তি প্রধান বিচারপতি ও দাঈ আদ-দুআত পদে দায়িত্ব পালন করতেন।
- উবায়দি সরকার মিশরে বিভিন্ন শিয়া প্রথা ও রীতি চালু করে। মিশরে ঈদুল গাদির ও হুসাইন রাযি.-এর মৃত্যুদিবস উদ্‌যাপন শুরু

হয় এবং একে কেন্দ্র করে মিশরবাসীর ওপর নানাভাবে নিপীড়ন চালানো হয়।

- ৩৯৫ হিজরি সনে (১০০৫ খ্রিষ্টাব্দে) ষষ্ঠ উবায়দি খলিফা হাকিম বি আমরিল্লাহ নগরীর দেয়ালে দেয়ালে এবং বাজারগুলোতে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি নিন্দামূলক বাণী উৎকীর্ণ করার নির্দেশ জারি করেন। পরে ৩৯৮ হিজরি সনে (১০০৮ খ্রিষ্টাব্দে) উক্ত নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয়।
- মিশরে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিলাদ শরিফ (জন্ম উৎসব) এবং নবী-কন্যা ফাতিমা রাযি. ও নবী-জামাতা আলি রাযি.-এর জন্ম উৎসব পালনের রীতি চালু হয়।
- শিয়া-রীতি অনুযায়ী সকল মসজিদে আজানে (حي على خير العمل) বলার নির্দেশ জারি করা হয়।

এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জাওহার মিশরে খলিফা মুইযের আগমনের পথ সুগম করেন। ৩৬২ হিজরি সনে (৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) মুইয মিশরে আগমন করেন। তিনি তার জন্য নির্মিত প্রাসাদে প্রবেশ করে কৃতজ্ঞতায় সিজদাবনত হয়ে পড়েন। তার কাছে বিভিন্ন বহুমূল্য উপহারসামগ্রী পেশ করা হয়। এরপর তিনি কায়রোকে উবায়দি সাম্রাজ্যের রাজধানী নির্বাচিত করেন।

উবায়দি খলিফার মিশরে আগমন এবং কায়রোকে রাজধানী নির্বাচনের কারণে মাগরিবে উবায়দিদের প্রভাব-কর্তৃত্ব আরও নড়বড়ে হয়ে পড়ে এবং মাগরিবের অভ্যন্তরে উবায়দিদের প্রভাবমুক্ত বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

খলিফা মুইযও মাগরিবের পরিবর্তে মিশরেই ক্ষমতা বিস্তৃতিতে মনোযোগ দেন। ভবিষ্যতে তার ক্ষমতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি সেনাপতি জাওহারের কর্তৃত্ব হ্রাস করতে থাকেন। ফলে ধীরে ধীরে জাওহারও আপন প্রভাব-প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলেন।

উবায়দি সাম্রাজ্যের অন্যতম সুস্পষ্ট ও দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য হলো, উবায়দি শাসকগণ ইহুদি-খ্রিষ্টানদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন করতেন এবং আস্থাভাজন বিবেচনা করতেন। যেমন :

- চতুর্থ উবায়দি শাসক মুইয লি দ্বীনিল্লাহ বিভিন্ন ইহুদি চিকিৎসককে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করেন। তাদের কেউ কেউ রাষ্ট্রের উচ্চ পদেও আসীন হয়; এমনকি ইয়াকুব বিন কিল্লিস নামক জনৈক ইহুদি মুইযের পুত্র আজিজের শাসনামলে প্রধান উজির পদে অধিষ্ঠিত হয়। উবায়দি সাম্রাজ্যের নীতিমালা ও গঠনতন্ত্র প্রণয়নের কৃতিত্ব এই ইয়াকুব বিন কিল্লিসের।
- পঞ্চম উবায়দি শাসক আজিজ বিল্লাহ জনৈকা খ্রিষ্টান রমণীকে বিয়ে করেন। আজিজের ওপর তার এই খ্রিষ্টান স্ত্রীর যথেষ্ট কর্তৃত্ব ছিল। সে আজিজকে মিশরের খ্রিষ্টান নাগরিকদের প্রতি অনুগ্রহ-আচরণে উদ্বুদ্ধ করে। তার প্ররোচনাতেই আজিজ মিশরে খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন শুরু করেন। উবায়দি সাম্রাজ্যের দপ্তরসমূহে প্রচুর খ্রিষ্টান সচিব নিয়োগ দেওয়া হয়। তারাও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে প্রভাব খাটাতে থাকে।
- আজিজ মানশা বিন ইবরাহিম কাযযারকে শামের প্রশাসক নিযুক্ত করেন।

কিন্তু ষষ্ঠ উবায়দি শাসক হাকিম বি আমরিল্লাহ ছিলেন পূর্ববর্তী শাসকদের তুলনায় ব্যতিক্রম। তিনি ৩৯৩ হিজরি সনে (১০০২ খ্রিষ্টাব্দে) সাম্রাজ্যের ইহুদি-খ্রিষ্টানদের স্বতন্ত্র পোশাক পরিধানের নির্দেশ দেন। এর তিন বছর পর তিনি কায়রোর কয়েকটি গির্জা ধ্বংসের নির্দেশ দেন। বিস্ময়কর তথ্য হলো—একইসময় তিনি মানসুর বিন আবদুন নামক জনৈক খ্রিষ্টানকে তার উজির পদে নিয়োগদান করেন। উজির মানসুরের পরামর্শেই হাকিম বি আমরিল্লাহ খ্রিষ্টানদের অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান আল-কুদসে অবস্থিত 'আল-কিয়ামা' গির্জা (The Church of the Holy Sepulchre) ধ্বংস করার নির্দেশ জারি করেন। আল-কিয়ামা গির্জা ধ্বংসের ঘটনা খ্রিষ্টসমাজকে বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের জন্য ক্রুসেডীয় চেতনায় উদ্দীপ্ত করতে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল।

হাকিম বি আমরিল্লাহর শাসনামলে খ্রিষ্টানদের ওপর অব্যাহত নিপীড়ন চলায় খ্রিষ্টান সচিবদের অনেকে বাধ্য হয়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে; অনেকে দেশত্যাগ করে চলে যায় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে, হাবশায় কিংবা নুবিয়ায়।

৪১১ হিজরি সনে (১০২০ খ্রিষ্টাব্দে) হাকিম বি আমরিল্লাহ খ্রিষ্টানদের ওপর কঠোরতা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন।

হাকিমের পর মিশরের ক্ষমতা লাভ করেন তার পুত্র যাহির। তিনি ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সঙ্গে কোমল ও উদার আচরণ করেন।

অষ্টম উবায়দি শাসক মুসতানসির বিল্লাহর শাসনামলের শুরুর দিকে আবু সাদ ইবরাহিম বিন সাহল তুসতারি নামক জনৈক ইহুদি উবায়দি সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হয়। খলিফা মুসতানসিরের মা ইতিপূর্বে এই আবু সাদের বাড়ির দাসী ছিল। তার পুত্র মুসতানসির খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হলে সে তার প্রাক্তন মালিক আবু সাদ তুসতারিকে সচিব পদে নিয়োগদান করে। তুসতারির বদান্যতায় ইহুদিরা উবায়দি সাম্রাজ্যে মর্যাদাকর অবস্থান তৈরিতে সক্ষম হয়; ইহুদিসমাজের অনেকেই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদ লাভ করে। ৪৩৯ হিজরি সনে (১০৪৭ খ্রিষ্টাব্দে) আবু সাদ তুসতারি নিহত হয়।

দরজিয়া (The Druze) সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ

পারস্য হতে মিশরে আগমনকারী কিছু লোক হাকিম বি আমরিল্লাহর শাসনামলের শেষদিকে ইসমাইলিয়া মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের ধর্মমত পরিবর্তন করে এবং ইসমাইলিয়া শিয়া মতাদর্শ গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে তারা খলিফা হাকিমের মাঝে স্রষ্টা অধিষ্ঠিত হওয়ার দাবি তুলে তা প্রচার করতে থাকে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর অনুসারীগণ তাদের এই গর্হিত আকিদার প্রচারে বিক্ষুব্ধ হয়ে তাদেরকে বিতাড়িত করেন। ধর্মত্যাগী এই দলটির অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও খলিফা হাকিমের অত্যন্ত আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিল মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল দরজি। সে পালিয়ে (দামেশকের পশ্চিমের এক ক্ষুদ্র জনপদ) ইনয়াসের এক গ্রামে চলে যায় এবং সেখানে হাকিমের স্রষ্টা হওয়ার আকিদা প্রচার করতে থাকে। ধীরে ধীরে সে অনেককে তার এই নতুন মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। এই নতুন দলটিই দরজিয়া সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[৫৯]

---

[৫৯]. বর্তমানে বিশ্বে দরজিয়া ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা দশ লক্ষের উর্ধ্বে। তাদের অধিকাংশ বাস করে সিরিয়া, লেবানন, ইসরাইল ও ভেনেজুয়েলায়।

যেহেতু এই মতাদর্শ ছিল খলিফা হাকিম বি আমরিল্লাহকে পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্বের এক ধর্মীয় আলোকবলয়ে আবৃত করার প্রয়াস, তাই খলিফা হাকিম এর পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং এর মাধ্যমে জনগণকে নিজের ইচ্ছার অনুগত করার প্রয়াস চালান।

হাকিমের মৃত্যুর তিন বছর পর তার পুত্র যাহির তার পিতার প্রতি সম্বন্ধিত এই গর্হিত মতবাদ হতে নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করেন।

অষ্টম খলিফা মুসতানসির বিল্লাহর শাসনামলে (৪২৭-৪৮৭ হিজরি/১০৩৫-১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দ) উবায়দি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে একাধিক বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে।

সুদানি সৈন্যরা ওয়াজহে কাবলি[৬০] অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

লাওয়াতাহ গোত্র ও বেদুইনদের সমন্বয়ে গঠিত প্রায় চল্লিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী উবায়দি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী সাবেক উবায়দি গভর্নর নাসিরুদ্দৌলা হাসান বিন হুসাইন বিন হামদান তাগলিবির নেতৃত্বে ওয়াজহে বাহরি[৬১] অঞ্চলে হামলা চালায় এবং ব্যাপক লুটতরাজ চালানোর পাশাপাশি বিভিন্ন পুল-সেতু ও শাখা-নদীপথ ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে কায়রো ও ফুসতাত থেকে এ অঞ্চলে সাহায্য সরবরাহের পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

৪৬২ হিজরি সনে নাসিরুদ্দৌলা মিশরে আব্বাসি খিলাফতের প্রচারণা চালানোর লক্ষ্যে ইরাকের সেলজুক সুলতান আলপ আরসালানের কাছে দূত প্রেরণ করে সামরিক সহায়তা প্রেরণের অনুরোধ করেন। তিনি দাবি জানান যে, মিশরে আব্বাসি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হলে তাকে মিশরের গভর্নরের দায়িত্ব দিতে হবে। আরসালান তার প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। তবে তখন তিনি রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় মিশরের প্রতি মনোযোগী হতে পারেননি।

৪৬৪ হিজরি সনে নাসিরুদ্দৌলা ওয়াজহে বাহরি অঞ্চলে খুতবা থেকে মুসতানসিরের নাম বাদ দেন এবং বাগদাদের তৎকালীন আব্বাসি খলিফা

---

৬০. **ওয়াজহে কাবলি** : মিশরের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের একটি অঞ্চলের নাম ওয়াজহে কাবলি বা সাইদে মিশর, ইংরেজিতে Upper Egypt।

৬১. **ওয়াজহে বাহরি** : মিশরের উত্তরাঞ্চলে বদ্বীপ সদৃশ একটি অঞ্চলের নাম ওয়াজহে বাহরি বা দালতান নীল; ইংরেজিতে The Nile Delta।

কায়িম বি আমরিল্লাহর কাছে খেলাত (সম্মানসূচক পোশাক) প্রার্থনা করেন।

এর কিছুদিন পর তিনি ফুসতাতে পৌঁছে রাজধানী কায়রোর ওপরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। খলিফা মুসতানসিরের পরিবর্তে নাসিরুদ্দৌলা হাসানই এবার উবায়দি সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি খলিফা মুসতানসিরের জন্য মাসিক একশ দিনার ভাতা নির্ধারণ করে দেন। কায়রোতে নাসিরুদ্দৌলার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উবায়দি সাম্রাজ্যের মূল সামরিক শক্তি তুর্কিরা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। তারা এবার ষড়যন্ত্র করে নাসিরুদ্দৌলাকে হত্যা করে। এরপর মিশরে নাসিরুদ্দৌলার পরিবারের সবাইকে খুঁজে বের করে তাদেরকেও হত্যা করা হয়।

এরপর উবায়দি সাম্রাজ্যের লাগাম চলে যায় তুর্কিদের হাতে। অসহায় খলিফা মুসতানসির অবশেষে আক্কার (Acre) গভর্নর বদরুদ্দিন জামালির কাছে বার্তা পাঠিয়ে তাকে কায়রোয় এসে সাম্রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানান। বদরুদ্দিন শর্তারোপ করেন যে, তিনি কায়রোতে অবস্থানরত তুর্কি, মাগরিবি ও সুদানি সৈন্যদের দমন করার জন্য শামের (আর্মেনীয়) নির্বাচিত সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

বদরুদ্দিন জামালি ছিলেন আমির জামালুদ্দৌলা বিন আম্মারের একজন আর্মেনীয় ক্রীতদাস। শামে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধে আপন সামরিক দক্ষতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে তিনি বিভিন্ন পদ লাভ করতে থাকেন। অবশেষে ৪৫৬ হিজরি সনে (১০৬৪ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি মুসতানসির বিল্লাহর পক্ষ থেকে দামেশকের গভর্নর নিযুক্ত হন। দামেশকে তুর্কিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন লড়াইয়ে সাফল্য লাভের পর তিনি ৪৬০ হিজরি সনে (১০৬৮ খ্রিষ্টাব্দে) আক্কার গভর্নর পদ লাভ করেন।

মুসতানসির বিল্লাহর অনুরোধে বদরুদ্দিন কায়রোয় আগমন করেন এবং তুর্কি সেনাপতিদের হত্যা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। তিনি ওয়াজহে কাবলি ও ওয়াজহে বাহরি অঞ্চলে খলিফা মুসতানসিরের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনেন। এরপর তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় 'জামে আত্তারিন' নির্মাণ করেন। বদরুদ্দিন জামালির কঠোর নেতৃত্বে মিশরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ফিরে আসে। ৪৫৭-৪৬৪ হিজরি সনে মিশরের বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে বিশ লক্ষ দিনার থেকে একত্রিশ লক্ষ দিনারে উন্নীত হয়।

জামালি ৪৮৭ হিজরি সনে (১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করেন এবং তার ছেলে আফজাল শাহানশাহকে পরবর্তী উজির নির্বাচিত করে যান।

উজিরদের অবাধ কর্তৃত্বের কারণে মুসতানসির বিল্লাহ তার শাসনামলের অধিকাংশ সময় অনেকটা হাত-পা-বাঁধা ব্যক্তির মতোই ছিলেন। ৪৮৭ হিজরি সনের ১৭ জিলহজ (১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর) তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মুসতানসিরের মৃত্যুর মাধ্যমেই উবায়দি সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় যুগের সূচনা ঘটে, যাকে আমরা অভিহিত করতে পারি 'উজিরদের কর্তৃত্বের যুগ' নামে।

উজিরদের কর্তৃত্বের যুগ

[৪৮৭-৫৬৭ হিজরি—১০৯৪-১১৭১ খ্রিষ্টাব্দ]

মুসতানসির-পরবর্তী উবায়দি সাম্রাজ্য মূলত উজিরদের মাধ্যমেই পরিচালিত হতো। এ স্তরের সূচনা হয় মুসতানসিরের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিযার ও তুলনামূলক অল্পবয়সী আরেক পুত্র আহমাদ আবুল কাসিমের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে। নিযার ছিলেন তার পিতার নির্ধারিত ওলিয়ে আহদ ও ভাবী খলিফা; অপরদিকে ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী প্রধান উজির বদরুদ্দিন জামালি খলিফা হিসেবে দেখতে চাচ্ছিলেন আহমাদকে।

হাসান বিন সাবাহ ছিলেন ইস্পাহানে ইসমাইলি মতাদর্শের দাঈ ও প্রচারক। মিশরের উবায়দি রাজপরিবারে যখন খলিফা পদ নিয়ে নিযার-আহমাদ—দু-ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল, সে সময়ই হাসান বিন সাবাহ ইসমাইলি মতাদর্শ সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে মিশরে আগমন করেন। যেহেতু ইসমাইলি মতাদর্শের নীতি অনুসারে একজন ইমামের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র পরবর্তী ইমাম হওয়ার অধিকার লাভ করে থাকে, তাই হাসান বিন সাবাহ মুসতানসিরের পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিযারের খলিফা ও ইমাম হওয়াকেই সঠিক মনে করেন এবং নিজের এই চিন্তাধারা মিশরে প্রচার শুরু করেন। এর ফলে উজির জামালি শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি কৌশলে হাসানকে বন্দি করে ফেলেন এবং মাগরিবে নির্বাসিত করেন। এটি ৪৭২ হিজরি সনের ঘটনা। কিন্তু হাসানকে বহনকারী জাহাজ পথিমধ্যে ঝড়ের কবলে পড়ে বাতাসের টানে শামের উপকূলীয় এলাকায় চলে যায়। তখন হাসান বিন সাবাহ আক্কার উপকূলীয় এলাকায় অবতরণ করেন এবং সেখান থেকে নিজের এলাকা ইস্পাহানে ফিরে যান।

ইস্পাহানে পৌঁছে হাসান বিন সাবাহ মুসতানসিরের পর তার পুত্র নিযারের ইমাম হওয়ার দাবি প্রচার করতে থাকেন। এ কারণেই পরবর্তীকালে

উবায়দি সম্প্রদায়ের এই শাখাটি 'ইসমাইলিয়া নিযারিয়া' নামে পরিচিতি লাভ করে।

পূর্বেও বলা হয়েছে—উবায়দি সাম্রাজ্যের এই স্তরে উজিররাই ছিল ক্ষমতার মূল নিয়ন্ত্রক। বদরুদ্দিনের পর তার পুত্র আফজালও একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। ৪৯৫ হিজরি সনে (১১০১ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফা আহমাদ আবুল কাসিমের মৃত্যু হলে আফজাল আহমাদের পাঁচ বছর বয়সী পুত্র আবু আলিকে 'আমির' উপাধি প্রদান করে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত করেন। পরিণত বয়সে উপনীত হওয়ার পর আমির তার প্রধান উজির আফজালের অবাধ কর্তৃত্বের কারণে তাকে সরিয়ে দেওয়ার মনস্থ করেন। খলিফার পরিকল্পনায় ৫১৫ হিজরি সনে (১১২১ খ্রিষ্টাব্দে) আফজাল নিহত হন। আফজালকে হত্যা করার পর খলিফা তার পরিবারের সকল সদস্যকে বন্দি করে রাখেন।

৫২৪ হিজরি সনে (১১৩০ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফা আবু আলি আমির নিহত হলে তার চাচাতো ভাই আবদুল মাজিদ আবুল মাইমুন 'হাফিজ' উপাধি ধারণ করে উবায়দি সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু সেনাবাহিনী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং আফজালের পুত্র আবু আলি আহমাদকে কারাগার থেকে মুক্ত করে উজির পদে আসীন করে। উজির পদে অধিষ্ঠিত হয়েই আবু আলি খলিফা হাফিজকে বন্দি করেন। এরপর তিনিও তার পিতার ন্যায় একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন। উবায়দি রাজপরিবার যদিও শিয়া ইসমাইলিয়া মতাদর্শী ছিল; কিন্তু উজির আবু আলি ছিলেন শিয়া ইমামিয়া মতাদর্শী। তাই তিনি ইমামিয়া মতাদর্শের প্রচার ও ইসমাইলিয়া মতাদর্শকে দুর্বল করার লক্ষ্যে কাজ করতে থাকেন। আবু আলি চারজন কেন্দ্রীয় বিচারক নিযুক্ত করেন; যাদের একজন ইমামিয়া মতাদর্শী, একজন ইসমাইলিয়া মতাদর্শী, একজন শাফেয়ি মাজহাবের অনুসারী এবং একজন মালিকি মাজহাবের অনুসারী। তিনি প্রত্যেককে আপন আপন মাজহাব অনুসারে বিধান জারি করার ক্ষমতা প্রদান করেন। ইসলামি ইতিহাসে এরূপ অভিনব ঘটনার অতীত দৃষ্টান্ত নেই।

৫২৬ হিজরি সনে (১১৩২ খ্রিষ্টাব্দে) ইসমাইলিয়া মতাদর্শীরা উজির আবু আলিকে হত্যা করে এবং খলিফা হাফিজকে কারামুক্ত করে। হাফিজ পুনরায় খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

৫২৯ হিজরি সনে (১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দে) গারবিয়া অঞ্চলের (খ্রিষ্টান) প্রশাসক বাহরাম আর্মানি উবায়দি সাম্রাজ্যের প্রধান উজির হওয়ার লক্ষ্যে কায়রোতে আগমন করে একদিন পুরো নগরী অবরোধ করে রাখেন। বাহরাম মুসলমান না হওয়া সত্ত্বেও হাফিজ তাকে প্রধান উজির পদে নিযুক্ত করতে বাধ্য হন। পরবর্তী এক বছর মিশরবাসী আর্মেনীয়দের অত্যাচার ভোগ করতে থাকে। বাহরাম উজির হয়েই মিশরে খ্রিষ্টানদের অবস্থা উন্নয়নে কাজ করেন। এ সময় আর্মেনীয়রা মিশরে প্রচুর গির্জা নির্মাণ করে। প্রত্যেক সেনাপতি ও পদস্থ কর্মকর্তার বাড়ির পাশে একটি করে গির্জা নির্মিত হতে থাকে।

৫৩০ হিজরি সনে (১১৩৬ খ্রিষ্টাব্দে) গারবিয়ার নতুন প্রশাসক রিজওয়ান বিন ওয়ালাখশি বাহরামকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন এবং নিজে প্রধান উজির পদে অধিষ্ঠিত হন। রিজওয়ান খলিফা পদ থেকে হাফিজকে অপসারণ করারও চেষ্টা চালান। একে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে বিরোধ চলতে থাকে এবং ৫৪২ হিজরিতে (১১৪৭ খ্রিষ্টাব্দে) রিজওয়ানের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এর সমাপ্তি ঘটে।

এভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মিশরের উজির পদ নিয়ে খলিফা-উজির বিরোধ ও লড়াই চলতে থাকে। উজিররা খলিফা নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করতে থাকে এবং এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ইসমাইলিয়া মতাদর্শের নীতি ও শিক্ষা উপেক্ষা করতে থাকে।

উবায়দি শাসনের শেষদিকে এসে মিশরে উজির পদ নিয়ে প্রতিযোগিতা চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। এ সময় উজির পদ প্রত্যাশী কেউ কেউ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকদের কাছেও ধরনা দেয়। তাদেরই একজন ছিলেন শাওয়ার বিন মুজির। তিনি ৫৫৮ হিজরি সনে (১১৬৩ খ্রিষ্টাব্দে) যিরগাম নামক জনৈক সেনাপতির কাছে পরাজিত হন এবং উজির পদ হতে পদচ্যুত হয়ে দামেশকের অধিপতি জিনকি সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদের কাছে আশ্রয় নেন। শাওয়ার নুরুদ্দিনকে প্রস্তাব দেন যে, তিনি যদি শাওয়ারকে মিশরের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সামরিক সহায়তা করেন, তাহলে শাওয়ার তাকে মিশরের রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করবেন। নুরুদ্দিন শাওয়ারের প্রস্তাবে রাজি হন এবং আসাদুদ্দিন শিরকুহের নেতৃত্বাধীন একটি বাহিনী দিয়ে শাওয়ারকে সহায়তা করেন। দামেশকের বাহিনীর সহায়তায় শাওয়ার যিরগামকে পরাজিত করে ৫৫৯ হিজরি সনে পুনরায়

মিশরের উজির পদে আসীন হন। কিন্তু কর্তৃত্ব ফিরে পেয়েই শাওয়ার তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। তিনি একদিকে শিরকুহকে মিশর ত্যাগ করে শামে ফিরে যেতে নির্দেশ দেন, অন্যদিকে বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের (The Kingdom of Jerusalem)[৬২] খ্রিষ্টান শাসক অ্যামালরিকের কাছে সাহায্য চেয়ে বার্তা পাঠান। তিনি অ্যামালরিককে বোঝান যে, নুরুদ্দিন মিশর ভূমি দখল করতে পারলে ভবিষ্যতে তার রাজ্যের জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়াবেন। অ্যামালরিক দ্রুত শাওয়ারের সহায়তায় ছুটে আসেন এবং আসাদুদ্দিন শিরকুহকে মিশর ত্যাগে বাধ্য করেন।

শাওয়ারের বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত জবাব দিতে সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ ৫৬২ হিজরি সনে (১১৬৭ খ্রিষ্টাব্দে) শিরকুহের নেতৃত্বেই আরেকটি বাহিনী মিশরে প্রেরণ করেন। শিরকুহের ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহুদ্দিন ইউসুফ বিন নাজমুদ্দিন আইয়ুবও এই অভিযানে অংশ নেন।

শাওয়ার এবারও অ্যামালরিকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনিও আবার তার মিত্রের সাহায্যে ছুটে আসেন।

(মিশরের ওয়াজহে কাবলি অঞ্চলের মিনইয়া নগরীর নিকটবর্তী) বাবাইন এলাকায় শিরকুহের নেতৃত্বাধীন বাহিনী শাওয়ার ও অ্যামালরিকের যৌথ বাহিনীর মুখোমুখি হয়। যুদ্ধে শিরকুহের বাহিনী জয়লাভ করে। শিরকুহ সার্বিক দিক বিবেচনা করে কায়রো অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে বিজিত ওয়াজহে কাবলি অঞ্চলে কর্তৃত্ব দৃঢ়করণে মনোযোগ দেন এবং সেখান থেকে কর উসুল করেন। এরপর তিনি মরুভূমি পাড়ি দিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছান এবং ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহুদ্দিনকে সেখানকার

---

[৬২]. প্রথম ক্রুসেড অভিযানের সময় ৪৯২ হিজরি সনে (১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে) শামের অভ্যন্তরে খ্রিষ্টরাজ্য 'বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্য' গড়ে ওঠে এবং প্রাচ্যে খ্রিষ্টানদের সর্ববৃহৎ রাজ্য ও মূল সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়। শুরুতে গুটিকয়েক নগরী ও গ্রাম মিলে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হলেও কালক্রমে এর আয়তন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে লেবানন, ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন (পশ্চিম তীর, গাজা, ইসরাইল) এবং জর্ডান, সিরিয়া ও সিনাই উপদ্বীপের কিছু অংশ বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের অধিভুক্ত হয়। প্রথমে মহাবীর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ৫৮৩ হিজরি সনে (১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দে) বাইতুল মুকাদ্দাসসহ রাজ্যটির বিভিন্ন নগরী পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। অবশেষে ৬৯০ হিজরি সনে (১২৯১ খ্রিষ্টাব্দে) মামলুক সুলতান আল-আশরাফ খলিলের হাতে আক্কা নগরীর পতনের মাধ্যমে বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটে। এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

প্রশাসক নিযুক্ত করে সামনে অগ্রসর হন। কিন্তু খ্রিষ্টান-মিশরীয় সম্মিলিত বাহিনী জল-স্থল উভয় দিক থেকে আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করলে শিরকুহ দ্রুত সালাহুদ্দিনকে সহায়তা করতে ফিরে আসেন। তখন সম্মিলিত বাহিনী তার সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করতে চাইলে তিনি এই শর্তে চুক্তি করতে সম্মত হন যে, খ্রিষ্টান বাহিনী মিশরে অবস্থান করতে পারবে না। এরপর শিরকুহ দামেশকে ফিরে যান। খ্রিষ্টানরা এবার মিশর ত্যাগের পরিবর্তে শাওয়ারের সঙ্গে মিত্রতার চুক্তি করে। চুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল—কায়রোতে সবসময় একটি ক্রুসেডার বাহিনী অবস্থান করবে এবং কায়রো নগরদ্বারসমূহের নিয়ন্ত্রণ খ্রিষ্টান সৈন্যদের হাতে থাকবে। তারা মিশরে নুরুদ্দিনের প্রেরিত বাহিনীকে বাধা প্রদান করবে। উভয় পক্ষ এই মর্মেও সম্মত হয় যে, ক্রুসেডাররা প্রতি বছর মিশরের রাজস্ব থেকে এক লক্ষ দিনার লাভ করবে।

মিশরের উবায়দি সাম্রাজ্যের এই দুর্বল ও পরাশ্রয়ী নীতি বাইতুল মুকাদ্দাসের অধিপতি অ্যামালরিককে নতুন করে মিশর নিয়ে ভাবতে প্ররোচিত করে। তিনি ৫৬৪ হিজরি সনে (১১৬৮ খ্রিষ্টাব্দে) মিশর জয় করার জন্য বাহিনী নিয়ে রওনা হন। নিরুপায় শাওয়ার খ্রিষ্টান বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আর কোনো উপায় না পেয়ে শেষপর্যন্ত এমন এক পদ্ধতি অবলম্বন করেন, যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া ভার। খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা যেন মিশর আক্রমণে নিরুৎসাহিত হয়, এ লক্ষ্যে তিনি ফুসতাত নগরীতে আগুন লাগিয়ে দেন। একটানা চুয়ান্ন দিন আগুন জ্বলতে থাকে। এরপর তিনি অ্যামালরিকের কাছে বার্তা পাঠান যে, আপনি যদি মিশরে প্রবেশ করেন, তাহলে নুরুদ্দিন মাহমুদ মিশর দখল করতে অগ্রসর হতে পারেন। পাশাপাশি তিনি অ্যামালরিককে বার্ষিক দশ লক্ষ দিনার প্রদানের শর্তে সন্ধি করারও প্রস্তাব দেন।

শাওয়ার জানতেন যে, তার এই প্রস্তাব পাওয়ার পরও অ্যামালরিক ছলচাতুরীর আশ্রয় নিতে পারেন। তাই তিনি নুরুদ্দিনের কাছেও সাহায্য প্রার্থনা করে বার্তা পাঠান। তিনি নুরুদ্দিনকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, মিশরের এক-তৃতীয়াংশ ভূমি তিনি নুরুদ্দিনকে ছেড়ে দেবেন এবং আসাদুদ্দিন শিরকুহকে সসৈন্য কায়রোতে অবস্থানের অনুমতি দেবেন। শিরকুহের বাহিনীর সৈন্যদেরকে জায়গির হিসেবে প্রচুর জমি প্রদান করা হবে, যা নুরুদ্দিনকে প্রদত্ত এক-তৃতীয়াংশ ভূমির বাইরে অতিরিক্ত বিবেচিত হবে।

নুরুদ্দিন মিশর অভিযানের জন্য দ্রুততার সঙ্গে আসাদুদ্দিন শিরকুহের নেতৃত্বে বিশাল এক বাহিনী প্রস্তুত করেন। অ্যামালরিকের ক্রুসেডার বাহিনী এ সংবাদ জানতে পেরে যুদ্ধ না করেই ফিলিস্তিনে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ৫৬৪ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসে (১১৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে) আসাদুদ্দিন শিরকুহ কায়রোতে প্রবেশ করেন। কায়রোবাসী তাকে স্বাগত জানায়। স্বয়ং উবায়দি খলিফা আবদুল্লাহ আল-আযিদ তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে খেলাত প্রদান করেন। এরপর আসাদুদ্দিন খলিফার প্রধান উজির মনোনীত হন। তিনি তার স্বল্প সময়ের উজির আমলেই সাম্রাজ্যের ক্ষমতার লাগাম নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে সক্ষম হন।

ক্ষমতাচ্যুত উজির শাওয়ার এ সময় আসাদুদ্দিন শিরকুহ ও তার সঙ্গী সেনাপতিদের হত্যা করার জন্য চক্রান্ত করার মনস্থ করেন। কিন্তু তার পুত্র কামিল তাকে এরূপ করতে নিষেধ করে বলেন, 'আল্লাহর শপথ! আপনি যদি এরূপ কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, আমি অবশ্যই তা আসাদুদ্দিনকে জানিয়ে দেবো।'

'আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা যদি এমন কিছু না করি, তাহলে আমাদের সকলকে হত্যা করা হবে।' শাওয়ার তার পুত্রকে বোঝানোর চেষ্টা করেন।

পিতার যুক্তির উত্তরে কামিল বলেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন। তবে খ্রিষ্টানদের হাতে আমাদের ভূমি চলে যাওয়ার পর তাদের হাতে নিহত হওয়ার চেয়ে আমাদের দেশ মুসলমানদের হাতে থাকা অবস্থায় মুসলিম পরিচয়ে মৃত্যুবরণ করা আমাদের জন্য অনেক শ্রেয়তর।'

কামিলের যুক্তি শোনার পর শাওয়ার আপন সংকল্প পরিত্যাগ করেন। এর কিছুদিন পর আসাদুদ্দিন তাকে হত্যা করেন।

আসাদুদ্দিন কায়রোয় প্রবেশের মাসতিনেক পরই ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর পর উবায়দি খলিফা আযিদ সালাহুদ্দিন ইউসুফ বিন আইয়ুবকে নতুন উজির মনোনীত করেন।

দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সালাহুদ্দিন আইয়ুবি জনকল্যাণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। ফলে মিশরে তার অগাধ জনপ্রিয়তা তৈরি হয়। তিনি খুতবায় উবায়দি খলিফার পর নুরুদ্দিনের নাম পাঠের নির্দেশ জারি করেন। উজির

সালাহুদ্দিন আইয়ুবি তার বাহিনীর সেনাপতিদের বিভিন্ন অঞ্চলের জায়গির দান করেন এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদের অধিষ্ঠিত করেন। সালাহুদ্দিন আইয়ুবির এসব পদক্ষেপ উবায়দি রাজপরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষীদের সন্ত্রস্ত করে তোলে। তারা এবার সালাহুদ্দিনকে দমন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিরুদ্ধবাদীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে খ্রিষ্টান শাসক অ্যামালরিকের কাছে বার্তা পাঠিয়ে তাকে মিশরে অভিযান পরিচালনার আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের পরিকল্পনা ছিল, সালাহুদ্দিন যখন খ্রিষ্টান বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য কায়রো ত্যাগ করবেন, তখন তারা কায়রোতে অবস্থানরত সালাহুদ্দিন আইয়ুবির সঙ্গীদের হত্যা করবে, এরপর খ্রিষ্টান বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সালাহুদ্দিন আইয়ুবির দফারফা করবে।

কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সালাহুদ্দিন আইয়ুবি পূর্ব থেকেই সতর্ক ছিলেন। তিনি দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদের চক্রান্ত-পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হন। প্রথমেই তিনি খলিফা আযিদের মুতামিন[৬৩] জাওহারকে হত্যা করেন। তখন সুদানি সৈন্যরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। উবায়দি সেনাবাহিনীতে সুদানি সৈন্যের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজারের অধিক। সালাহুদ্দিনের বাহিনীর সঙ্গে সুদানি বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়। সালাহুদ্দিন আইয়ুবি তাদেরকে পরাভূত করার পর ওয়াজহে কাবলি অঞ্চল পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং ৫৭২ হিজরি সনে তাদের পুরোপুরি দমন করতে সক্ষম হন।

এদিকে সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদের কর্তৃত্ব মিশরেও বিস্তৃত হওয়ায় বাইতুল মুকাদ্দাস রাষ্ট্রের ক্রুসেড প্রশাসন নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা এবার নতুন করে মিশরে অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এ সময় বাইজান্টাইন সম্রাট ১ম ম্যানুয়েল কমনিনোস (Manuel I Komnenos) অ্যামালরিকের সাহায্যপ্রার্থনায় সাড়া দিয়ে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামে সমৃদ্ধ একটি বাইজান্টাইন নৌবহর প্রেরণ করেন। মিশর জয়ের উদ্দেশ্যে খ্রিষ্টান বাহিনী রওনা হয়ে ৫৬৫ হিজরি সনের সফর মাসে (১১৬৯ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) দিমইয়াতে (Damietta) পৌঁছায়।

---

৬৩. মিশরে উবায়দি সাম্রাজ্যের শেষ সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ ছিল মুতামিনের পদ। মুতামিন পদধারীকে আধুনিক যুগের বিশেষ রাজকীয় নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

নিজে কায়রো ত্যাগ করলে উবায়দিরা ষড়যন্ত্র করতে পারে এই আশঙ্কায় সালাহুদ্দিন আইয়ুবি কায়রোতেই অবস্থান করেন এবং খালিদ শিহাবুদ্দিন মাহমুদ ও নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র তাকিউদ্দিন উমরের নেতৃত্বে একটি বাহিনী খ্রিষ্টান বাহিনীর মোকাবিলায় প্রেরণ করেন। পাশাপাশি তিনি সুলতান নুরুদ্দিনের কাছে বার্তা পাঠিয়ে সাহায্য প্রেরণের অনুরোধ জানালে নুরুদ্দিন সহায়তাবাহিনী প্রেরণ করেন। উবায়দি খলিফা আযিদও খ্রিষ্টান বাহিনী কর্তৃক দিমইয়াত অবরোধের সময় সালাহুদ্দিনকে আর্থিক সাহায্য করেন। এ বিষয়ে স্বয়ং সালাহুদ্দিন আইয়ুবি বলেন, 'আমি আযিদের চেয়ে সম্ভ্রান্ত কাউকে দেখিনি। খ্রিষ্টানরা দিমইয়াতে অবস্থানের সময় তিনি আমার কাছে সামরিক সাহায্য হিসেবে সামরিক পোশাক ও অন্যান্য বস্তু ছাড়াও নগদ দশ লক্ষ দিনার পাঠিয়েছেন।'

মুসলিম বাহিনীর প্রবল প্রতিরোধের মুখে ক্রুসেডারদের যুদ্ধ-উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে পড়ে। ৫৬৫ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসে (১১৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে) তারা অবরোধ উঠিয়ে নিজেদের অঞ্চলে প্রস্থান করে।

সালাহুদ্দিন আইয়ুবি মিশরে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর মিশরের শিয়া মতবাদ দমন করার প্রতি মনোযোগী হন। তিনি ৫৬৬ হিজরি সনে শাফেয়ি মাজহাবের শিক্ষা প্রদানের জন্য একটি এবং মালিকি মাজহাবের শিক্ষাদানের জন্য আরেকটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শিয়া বিচারকদের বরখাস্ত করেন এবং সদরুদ্দিন আবদুল মালিক বিন দিরবাসকে পুরো মিশরের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করেন। এসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মিশরে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

সুলতান নুরুদ্দিন সালাহুদ্দিন আইয়ুবির কাছে নির্দেশ পাঠান যে, মিশরে যেন উবায়দি খলিফার পরিবর্তে সমকালীন আব্বাসি খলিফার নাম খুতবায় পাঠ করা হয়। কিন্তু সালাহুদ্দিন মিশরবাসীর বিক্ষুব্ধ হওয়ার আশঙ্কায় এই নির্দেশ জারি করতে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। নুরুদ্দিন বারবার একই নির্দেশ প্রেরণ করতে থাকলে একপর্যায়ে সালাহুদ্দিন মিশরের সকল খতিবকে পরবর্তী জুমা হতে খুতবায় আব্বাসি খলিফা আল-মুসতাযি বি আমরিল্লাহর নাম পাঠের নির্দেশনা জারি করেন। উবায়দি খলিফা আযিদ তখন অসুস্থ থাকায় তার পরিবার তাকে এ বিষয়ে অবগত করেনি। ৫৬৭ হিজরি সনের

১০ মুহাররম (১১৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর) খলিফা আযিদ মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মিশরে শিয়া উবায়দি সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

* * *

উবায়দি (ফাতিমি) সাম্রাজ্যের খলিফাগণের তালিকা

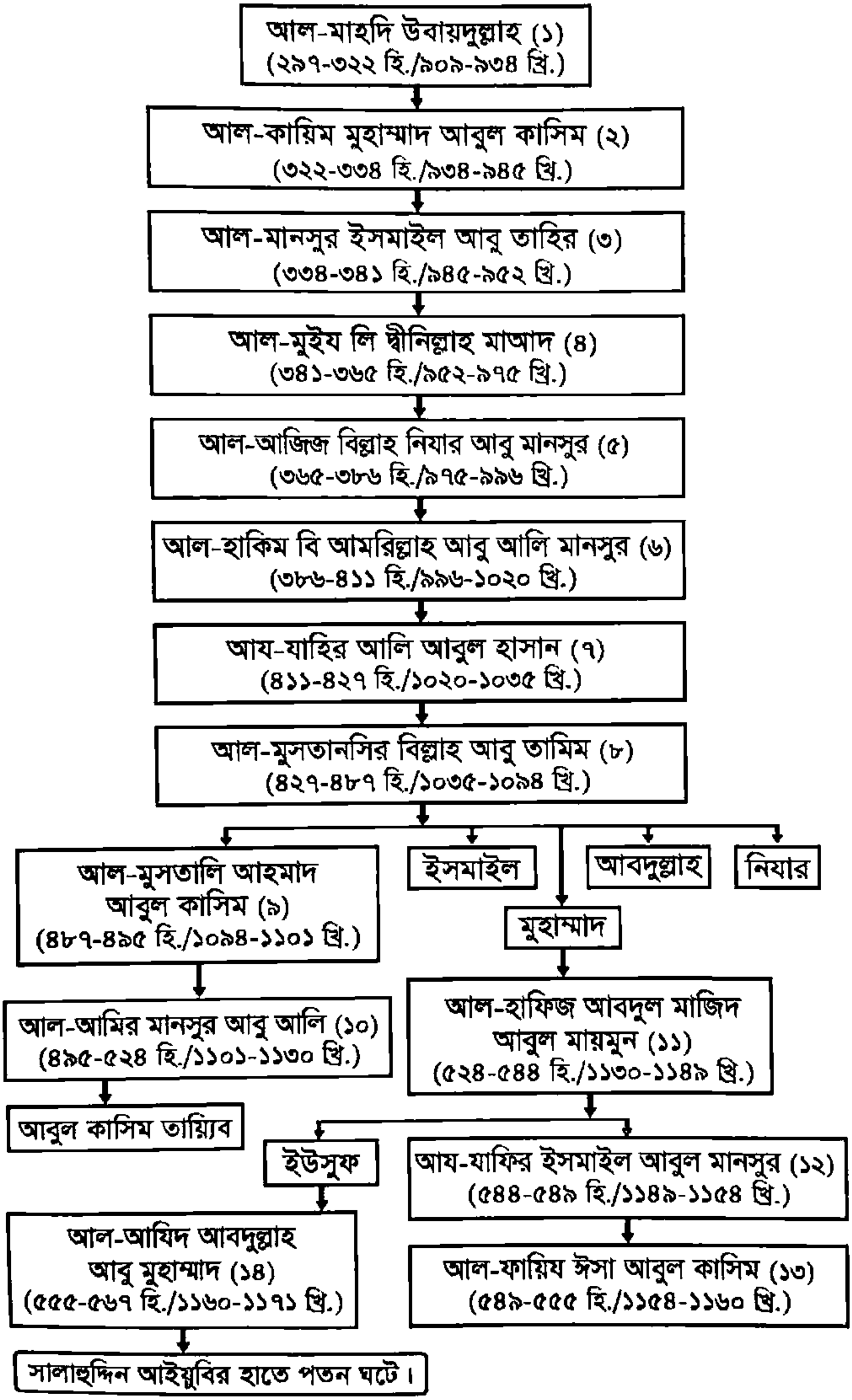
১.	আল-মাহদি উবায়দুল্লাহ	:	২৯৭-৩২২ হি. (৯০৯-৯৩৪ খ্রি.)
২.	আল-কায়িম মুহাম্মাদ আবুল কাসিম	:	৩২২-৩৩৪ হি. (৯৩৪-৯৪৫ খ্রি.)
৩.	আল-মানসুর ইসমাইল আবু তাহির	:	৩৩৪-৩৪১ হি. (৯৪৫-৯৫২ খ্রি.)
৪.	আল-মুইয লি দ্বীনিল্লাহ মাআদ[৬৪]	:	৩৪১-৩৬৫ হি. (৯৫২-৯৭৫ খ্রি.)
৫.	আল-আজিজ বিল্লাহ নিযার আবু মানসুর	:	৩৬৫-৩৮৬ হি. (৯৭৫-৯৯৬ খ্রি.)
৬.	আল-হাকিম বি আমরিল্লাহ আবু আলি মানসুর	:	৩৮৬-৪১১ হি. (৯৯৬-১০২০ খ্রি.)
৭.	আয-যাহির আলি আবুল হাসান	:	৪১১-৪২৭ হি. (১০২০-১০৩৫ খ্রি.)
৮.	আল-মুসতানসির বিল্লাহ আবু তামিম	:	৪২৭-৪৮৭ হি. (১০৩৫-১০৯৪ খ্রি.)
৯.	আল-মুসতালি আহমাদ আবুল কাসিম	:	৪৮৭-৪৯৫ হি. (১০৯৪-১১০১ খ্রি.)
১০.	আল-আমির মানসুর আবু আলি	:	৪৯৫-৫২৪ হি. (১১০১-১১৩০ খ্রি.)

[৬৪]. ৩৫৮ হিজরি সনে (৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) আল-মুইয লি দ্বীনিল্লাহর শাসনামলে মিশর বিজিত হয় এবং ৩৬২ হিজরি সনে (৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) উবায়দি সাম্রাজ্যের রাজধানী মাগরিবের মানসুরিয়া থেকে মিশরের কায়রোতে স্থানান্তরিত হয়।

১১.	আল-হাফিজ আবদুল মাজিদ আবুল মায়মুন	:	৫২৪-৫৪৪ হি. (১১৩০-১১৪৯ খ্রি.)
১২.	আয-যাফির ইসমাইল আবুল মানসুর	:	৫৪৪-৫৪৯ হি. (১১৪৯-১১৫৪ খ্রি.)
১৩.	আল-ফায়িয ঈসা আবুল কাসিম	:	৫৪৯-৫৫৫ হি. (১১৫৪-১১৬০ খ্রি.)
১৪.	আল-আযিদ আবদুল্লাহ আবু মুহাম্মাদ	:	৫৫৫-৫৬৭ হি. (১১৬০-১১৭১ খ্রি.)

উবায়দি (ফাতিমি) সাম্রাজ্যের খলিফাগণের বংশলতিকা

[নামের পাশে বন্ধনীতে খলিফাদের ক্রমধারা উল্লেখ করা হয়েছে]



চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জিনকি ও আইয়ুবি রাষ্ট্রের ইতিহাস এবং ক্রুসেড-বিরোধী জিহাদ

মুসলিম ভূখণ্ডে খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের হিংস্র ও বর্বর আগ্রাসন দুটি মহান রাষ্ট্রের প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়—জিনকি রাষ্ট্র ও আইয়ুবি রাষ্ট্র। এই দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টিই যেন হয়েছিল ইসলামি প্রাচ্যে ইউরোপীয়দের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে এবং তাদের এই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে ছয়শ বছরেরও অধিক সময়ের জন্য পিছিয়ে দিতে।

কোমলতা-উদারতা, সততা-বিশ্বস্ততা ও সাম্প্রদায়িক আচরণ পরিহারের গুণে সজ্জিত হয়ে আইয়ুবি রাষ্ট্র ক্রুসেডারদের সামনে এক মঙ্গলকামী শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। আইয়ুবি শাসকগণ নিজেদের সমুন্নত আচরণের মাধ্যমে ক্রুসেডারদের সামনে তুলে ধরেছিলেন শত্রুর সঙ্গে আচরণের এক অনুপম নীতি; শিখিয়েছিলেন মানুষের সঙ্গে কীরূপ সদাচরণ করতে হয়; চরম নিন্দনীয় পাশবিক গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা ইত্যাদি কীভাবে পরিহার করতে হয়।

ইসলামি প্রাচ্যে ক্রুসেড আগ্রাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস[৬৫]

ক্রুসেড আগ্রাসনের কার্যকারণসমূহ এবং ক্রুসেড আগ্রাসন মোকাবিলায় মুসলিম উম্মাহর সংগ্রামী জিহাদ

প্রথম ক্রুসেড

[৪৮৮-৪৯২ হিজরি—১০৯৫-১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দ]

৪৮০ হিজরি সনে ২য় আরবান (Pope Urban II) রোমান ক্যাথলিক চার্চের পোপ নির্বাচিত হওয়ার পর তৎকালীন খ্রিষ্টান বিশ্বের জনগণের অনুসরণীয় নেতায় পরিণত হন। তিনি মুসলমানদের হাত থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের মুসলিম সেলজুক শাসকদের নিপীড়ন (!) থেকে খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের রক্ষা করার জন্য সমকালীন খ্রিষ্টান রাজন্যবর্গকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানান।[৬৬]

---

৬৫. ক্রুসেড ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অধ্যয়ন করা যেতে পারে মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত ড. রাগিব সারজানির *ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস*।

৬৬. পোপ ২য় আরবান যদিও খ্রিষ্টানসমাজকে ক্রুসেড অভিযানে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য দাবি তুলেছিলেন যে, মুসলিম শাসকগণ বাইতুল মুকাদ্দাসগামী খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের ওপর প্রচণ্ড নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়ে থাকে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ দাবি ছিল সম্পূর্ণই মিথ্যা ও অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

প্রখ্যাত ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক আলেকজান্ডার ভ্যাসিলিভ (Alexander Alexandrovich Vasiliev) [মৃত্যু : ১৯৫৩ খ্রি.] Istoria Imperiului Bizantin [History of the Byzantine Empire] গ্রন্থে লিখেছেন—

> খ্রিষ্টানরা নির্বিশেষে সকলে ইসলামি শাসনের ছায়ায় ধর্মীয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। তাদেরকে শুধু তাদের নিজেদের পুরোনো গির্জাগুলো সংরক্ষণের অনুমতিই দেওয়া হয়নি; বরং নতুন নতুন গির্জা ও মঠ নির্মাণের অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল। নিজেদের গ্রন্থাগারে তারা ধর্মতত্ত্ব বিষয়ের বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থও রাখত।

পোপ ২য় আরবানের আহ্বানে উদ্দীপ্ত হয়ে যারা ক্রুসেড অভিযান সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন, তাদের অন্যতম হলেন পিটার (Peter the Hermit) নামক জনৈক সন্ন্যাসী। তিনি ক্রুসেড অভিযানের জন্য প্রচুর পরিমাণে স্বেচ্ছাসেবী সৈনিক সংগ্রহ করেন। তবে তার সংগৃহীত অধিকাংশ সৈনিক ছিল খ্রিষ্টানসমাজের চোর-ডাকাত ও উচ্ছৃঙ্খল শ্রেণির লোকজন। নিয়মিত সৈন্যদের মূল বাহিনী রওনা হওয়ার পূর্বেই পিটার তার এই উচ্ছৃঙ্খল বাহিনী নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওনা হন। এই বাহিনীটি পথে ব্যাপক নৈরাজ্য ও অরাজকতা সৃষ্টি করে এবং আশেপাশের

আমেরিকান বিখ্যাত ঐতিহাসিক জেমস থমসন (James Westfall Thompson) [মৃত্যু : ১৯৪১ খ্রি.] *Economic and social history of the Middle Ages* গ্রন্থে লিখেছেন— =

> =সেলজুক রাষ্ট্রের অধীনে যেসব খ্রিষ্টান নাগরিক বসবাস করত, তারা খোদ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্রে বসবাসকারী খ্রিষ্টানদের চেয়েও অধিক সুখে-শান্তিতে ছিল।

জেমস থমসন প্রাগুক্ত গ্রন্থে আরও উল্লেখ করেছেন যে, স্বয়ং বাইতুল মুকাদ্দাসের গির্জাধ্যক্ষ (Patriarch of Jerusalem) থিওডোসিয়াস (Theodosius) কনস্টান্টিনোপলের গির্জাধ্যক্ষের কাছে ২৫৫ হিজরিতে (৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) পাঠানো এক পত্রে মুসলমানদের উদার আচরণ ও সহমর্মিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। পত্রে তিনি এ কথাও উল্লেখ করেন যে, মুসলমানরা খ্রিষ্টানদের একান্ত ধর্মীয় বিষয়াদিতে কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করে না এবং তাদেরকে নির্দ্বিধায় অধিক হারে গির্জা নির্মাণের সুযোগ দেয়। পত্রে বাইতুল মুকাদ্দাসের গির্জাধ্যক্ষ একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা তুলে ধরে বলেন, 'মুসলিম জাতি হলো ন্যায়পরায়ণ জাতি। আমরা তাদের কাছ থেকে কোনো ধরনের ক্ষতি বা সীমালঙ্ঘনের সম্মুখীন হই না।' এসব সাক্ষ্য এবং এ জাতীয় অসংখ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ সন্দেহাতীতভাবে এ কথা প্রমাণ করে যে, পোপ ২য় আরবানের উল্লিখিত দাবি অসার রটনা ছাড়া কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে খ্রিষ্টানদের ক্রুসেড অভিযান পরিচালনার পেছনে যেসব অনৈতিক স্বার্থ কার্যকর ছিল, সেগুলোকে ঢেকে রাখার অপচেষ্টা হিসেবেই এই বানোয়াট ও মিথ্যা দাবি তোলা হয়েছিল। [এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত ড. রাগিব সারজানির *ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস*।]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের প্রথম ক্রুসেড অভিযানে বের হওয়ার ক্ষেত্রে পোপ ২য় আরবানের কর্মপ্রচেষ্টা যেমন কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল, তেমনই শিয়া উবায়দি সাম্রাজ্যের কর্ণধারদের প্ররোচনাও এ ক্ষেত্রে অন্যতম কার্যকারণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। ইসলামি বিশ্বে সেলজুক সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধিতে কোণঠাসা হয়ে পড়ায় উবায়দি সাম্রাজ্যের নেতৃবৃন্দ পত্রপ্রেরণের মাধ্যমে ইউরোপীয়দের ইসলামি প্রাচ্যে সেলজুক সাম্রাজ্যে হামলা চালাতে প্ররোচিত করেছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে সেলজুকদের মোকাবিলায় উবায়দি খলিফা ও বাইজান্টাইন সম্রাটের মধ্যে গোপন চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

প্রতিটি জনপদের অধিবাসীদের ওপর নিপীড়ন চালায়। খ্রিষ্টান জনপদগুলোও তাদের নৈরাজ্যের শিকার হয়। তাদের আচরণে বাইজান্টাইন সম্রাট ১ম অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস (Alexios I Komnenos)-ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। উচ্ছৃঙ্খল জনতার এই অনিয়মিত বাহিনীটি মুসলিম ভূখণ্ডের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। অবশেষে সেলজুকরা নিকিয়া[৬৭] এলাকায় তাদের প্রতিরোধ করে তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। এটি ৪৮৯ হিজরি সনের (১০৯৬ খ্রিষ্টাব্দের) ঘটনা।

এরইমাঝে ক্রুসেডারদের নিয়মিত বাহিনী ফ্রান্স থেকে মুসলিম ভূখণ্ডের উদ্দেশে রওনা হয়। সুবিশাল ক্রুসেড বাহিনীতে সৈন্যের সংখ্যাই ছিল তিন লক্ষ। ক্রুসেড বাহিনীর একক কোনো নেতৃত্ব ছিল না। অধিকাংশ অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছিল ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসক ও সেনাপতিগণ। তৎকালীন ইউরোপের অধিকাংশ শাসক এ অভিযানে যোগ দিতে পারেনি। আন্দালুসের খ্রিষ্টরাজ্যগুলোর শাসকগণ আন্দালুসের মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিল। অপরদিকে ফ্রান্সের রাজা ১ম ফিলিপ ও জার্মানির রাজা ৪র্থ হেনরি তখন রোমান চার্চের সন্তুষ্টিবঞ্চিত[৬৮] থাকায় অভিযানে যোগ দিতে পারেননি।

---

৬৭. **নিকিয়া** : আরবিতে نِيقِيَة (নিকিয়া), ইংরেজিতে Nicaea (নিকায়া) এশিয়া মাইনর অঞ্চলের পশ্চিম উপকূলে মর্মর সাগরের নিকটে অবস্থিত সুপ্রাচীন একটি নগরী। আধুনিক তুরস্কের বুরছা প্রদেশে অবস্থিত অঞ্চলটির বর্তমান নাম ইজনিক (İznik)। ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টধর্মের প্রথম সর্বজনীন মহাসভা নিকিয়াতে অনুষ্ঠিত হয় বলে খ্রিষ্টধর্মীয় ইতিহাসে নগরীটির বিশেষ অবস্থান রয়েছে।

৬৮. খ্রিষ্টীয় নবম, দশম ও একাদশ শতকে ইউরোপের ঘটনাপ্রবাহে গির্জা ও পোপদের বিরাট প্রতিপত্তি ও প্রভাব ছিল। কেবল চিন্তা ও ধর্মগত দিক থেকেই নয়; বরং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক—সর্বক্ষেত্রে ইউরোপীয় সমাজের ওপর গির্জাগুলোর ছিল একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ। গির্জাগুলো চাইলেই কোনো শাসক ও রাজার ওপর থেকে আস্থা ও সন্তুষ্টি প্রত্যাহার করে নিতে পারত। আস্থা প্রত্যাহার করামাত্র পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যেত এবং জনগণ দলমতনির্বিশেষে সকলে সন্তুষ্টিবঞ্চিত শাসককে প্রত্যাখ্যান করত। এ কারণেই শাসক ও রাজন্যবর্গ গির্জার মতামতের প্রতি অত্যন্ত ভীতি ও আতঙ্ক এবং মর্যাদা ও সম্মানের চোখে তাকিয়ে থাকত।

তৎকালীন পোপদের প্রভাব-প্রতিপত্তির পরিমাণ উপলব্ধি করতে জার্মান রাজা চতুর্থ হেনরির সঙ্গে (২য় আরবানের পূর্বতন) পোপ ৭ম গ্রেগরি (Gregory VII)-এর কৃত একটি আচরণ উল্লেখ করাই বোধকরি যথেষ্ট হবে।

জার্মান রাজা চতুর্থ হেনরি ছিলেন সমকালীন ইউরোপের সবচেয়ে প্রতাপশালী শাসক। তা

মূল ক্রুসেড বাহিনী ফ্রান্স থেকে রওনা হয়ে রোম হয়ে কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছায়, এরপর সেখান থেকে রোমান সেলজুক সাম্রাজ্যের রাজধানী নিকিয়া অভিমুখে রওনা হয়। রোমান সেলজুক সাম্রাজ্যের শাসক ১ম কিলিজ আরসালানের অনুপস্থিতির সুযোগে তারা উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে নিকিয়া নগরী অবরোধ করে। কিলিজ ফিরে এসে নিকিয়ায় প্রবেশের চেষ্টা করেন এবং ক্রুসেডারদের সাথে তুমুল লড়াই করেন। কিন্তু তিনি নিকিয়ায় প্রবেশ করতে ব্যর্থ হন। ক্রুসেডারদের হাতে নিকিয়ার পতন ঘটে এবং নগরীটি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। উল্লেখ্য, নিকিয়ার অধিকাংশ অধিবাসী ছিল খ্রিষ্টান।

এরপর ক্রুসেডার বাহিনী অভিযান অব্যাহত রেখে অতি সহজে বরং বলতে গেলে বিনা বাধায় জনশূন্য কোনিয়া (Konya) নগরী দখল করে নেয়। কিলিজ এর পূর্বেই কোনিয়ার অধিবাসীদের সেখান থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। এরপর ক্রুসেডার বাহিনী একে একে হিরাক্লিয়া (Heraclea Cybistra), কিলিকিয়া (Cilicia), কায়সারিয়া (Kayseri) ও মারআশ (Kahramanmaraş) নগরী দখল করে নেয়। এই অভিযানের ফলে ক্রুসেডার বাহিনীর হাতে রোমান সেলজুকদের পতন ঘটে। রোমান সেলজুকদের ভূখণ্ডে সৃষ্টি হয় আর্মেনিয়া ও এডেসা-সহ বিভিন্ন খ্রিষ্টরাজ্য।

সত্ত্বেও কোনো এক বিষয়ে পোপ তার প্রতি বিরাগভাজন হন। হেনরি প্রথমে পোপের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে অস্বীকৃতি জানান। তখন পোপ গ্রেগরি রাজা হেনরির ওপর থেকে তার= =আস্থা প্রত্যাহার করে নেন এবং তাকে গির্জার সন্তুষ্টি-বঞ্চিত ও (এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে) স্বর্গ-বঞ্চিত ঘোষণা করেন। পোপের ফরমান জারি হতেই জনগণ তার প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করতে শুরু করে। ফলে রাজার রাজক্ষমতাই হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। অবস্থাদৃষ্টে রাজার ঘনিষ্ঠজন ও শুভানুধ্যায়ীরা তাকে পোপের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করার পরামর্শ দেয়।

প্রচণ্ড ক্ষমতাধর জার্মান রাজা চতুর্থ হেনরি তখন পোপের আস্থা ও সন্তুষ্টি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেন। পূর্ণ অনুতাপ ও অনুশোচনা প্রকাশের উদ্দেশ্যে তিনি জার্মানি থেকে খালি পায়ে হেঁটে রোমে পৌঁছান। কিন্তু এরপরও পোপ পূর্ণ তিন দিন তার সঙ্গে সাক্ষাতে অস্বীকৃতি জানান। এই তিন দিন হেনরি পোপের সাক্ষাৎলাভের অনুমতির অপেক্ষায় বৃষ্টি ও প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে গির্জার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন। এরপর অনুমতি পেয়ে তিনি ক্ষমালাভের উদ্দেশ্যে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং পোপের পদযুগলে চুম্বন করতে থাকেন! আপন রাজত্ব রক্ষায় রাজা চতুর্থ হেনরির সামনে এটাই ছিল একমাত্র সমাধান!

এরপর ক্রুসেডার বাহিনী শাম অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং এন্টিয়কের পূর্বে আছি[৬৯] নদীর (Orontes river) ওপর নির্মিত লৌহ সেতু পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারা পারসিক সেলজুক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত এন্টিয়ক নগরী দখল করে নেয়। এন্টিয়কেও গড়ে ওঠে একটি খ্রিষ্টরাজ্য। ক্রুসেড বাহিনী প্রচণ্ড যুদ্ধের পর শামীয় সেলজুক রাষ্ট্রের লাতাকিয়া (Latakia) নগরীও দখল করে নেয়।

এ সময় ক্রুসেডাররা এন্টিয়কে নিজেদের অবস্থান নিরাপদ ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে মিশরের উবায়দি সরকারের সঙ্গে এ মর্মে চুক্তি করে যে, শামের উত্তরাঞ্চল ক্রুসেডারদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে আর ফিলিস্তিন থাকবে উবায়দিদের নিয়ন্ত্রণে। উবায়দিরা তো দীর্ঘদিন যাবৎ শাম অঞ্চলে মুসলিম (সুন্নি) সেলজুকদের কর্তৃত্ব চিরতরে শেষ করার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তাই তারা কালবিলম্ব না করে এ চুক্তিতে সম্মত হয়।

এরপর ক্রুসেডাররা বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওনা হয়। বাইতুল মুকাদ্দাসে তখন উবায়দিদের কর্তৃত্ব ছিল। পথে তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালানো হলেও তারা প্রতিটি বাধা সফলতার সঙ্গে অতিক্রম করে এবং উবায়দিদের সঙ্গে কৃত চুক্তির সামান্য পরোয়া না করে আল-কুদস নগরীর দ্বারে পৌঁছে যায়। আক্কার (উবায়দি) প্রশাসক ও বৈরুতের অধিবাসীরা তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। দীর্ঘ একচল্লিশ দিনের অবরোধের পর ক্রুসেডারদের হাতে আল-কুদস নগরীর পতন ঘটে। কুদসের নিরাপত্তায় নিয়োজিত উবায়দি সৈন্যরা কোনো ধরনের প্রতিরোধ প্রচেষ্টার পরিবর্তে মসজিদে আশ্রয় নেয়। ক্রুসেডাররা আল-কুদস নগরীতে প্রবেশ করার পর সেখানে গণহত্যা ঘটায়। মুসলমানদের রক্তে বাইতুল মুকাদ্দাস নামে খ্যাত আল-কুদস নগরী প্লাবিত হয়ে যায়। প্রায় সত্তর হাজার সাধারণ মুসলমান ক্রুসেডারদের হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়।

৪৯২ হিজরি সনের শাবান মাসে (১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে) বাইতুল মুকাদ্দাসের পতন ঘটে।

---

[৬৯]. উক্ত অঞ্চলের অন্যান্য নদীর ধারার বিপরীতে এ নদীটি দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হওয়ায় এর নামকরণ করা হয় 'আছি' বা অবাধ্য নদী।

এই অভিযানের মাধ্যমে ক্রুসেডাররা ঐতিহাসিক ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাস, বেথেলহাম, হেবরন, রামলা, রামাল্লা, জাফা (Jaffa), নাবলুস, বায়সান, তাবারিয়া (Tiberias) ও নাসিরিয়া নগরী দখল করে নেয়। আসকালানসহ কয়েকটি গ্রাম থেকে যায় মুসলমানদের হাতে।

জনৈক ঐতিহাসিক তখনকার ফিলিস্তিনের চিত্র নিম্নোক্ত ভাষায় তুলে ধরেছেন—

> তৎকালে শামে বিদ্যমান খ্রিষ্টরাজ্যগুলোকে তুলনা করা যেতে পারে প্রতিশোধ গ্রহণ ও হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় ওত পেতে থাকা শত্রুপক্ষের বিশাল মহাসাগরের মাঝে অবস্থিত বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সঙ্গে।[৭০]

এখানে এ তথ্যটিও উল্লেখযোগ্য যে, ক্রুসেডাররা বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করতে সক্ষম হলেও এর জন্য তাদের বিরাট মূল্য চুকাতে হয়। অভিযানের শুরুতে ক্রুসেডার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল তিন লক্ষ আর যখন তারা বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করে, তখন তাদের সৈন্যসংখ্যা চল্লিশ হাজারের বেশি ছিল না। এডেসা অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য মূল বাহিনী হতে যেসব ক্রুসেডার সৈন্য আলাদা হয়ে গিয়েছিল, তাদের সংখ্যা নিয়ে যত অতিরঞ্জন করা হোক না কেন, তা চল্লিশ হাজারের বেশি হবে না। অর্থাৎ ক্রুসেডার বাহিনীর মাত্র আশি হাজার সৈন্য প্রথম ক্রুসেড অভিযান শেষে জীবিত ছিল; নিহত হয়েছিল দুই লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য। এ তথ্য দ্বারাই অনুমান করা যায় যে, ক্রুসেডার বাহিনী কী পরিমাণ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। তাদের সবাই যে প্রতিপক্ষের সৈন্যদের হাতে নিহত হয়েছিল এমন নয়; অনেক ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়েছিল সেসব সাধারণ জনগণের হাতে, যারা ক্রুসেডার বাহিনীর সৈন্যদের আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে বিদ্রোহ করেছিল। সাধারণ জনগণ যদিও জানত যে, এই বিদ্রোহের কারণে তাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ, তারপরও তারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছিল। বর্বর ক্রুসেডার সৈন্যদের আচরণ এত জঘন্য, কঠোর ও নিকৃষ্ট পর্যায়ের ছিল যে, একজন

---

৭০. খালিদ বিন মুহাম্মাদ মুবারক কাসিমি, *আল-আলাকাতুল খারিজিয়্যাহ ফিল আছরিল ইসলামি*, পৃষ্ঠা : ১১৫।

মানুষ যতই লাঞ্ছনা ও ভীতির শিকার হোক না কেন, বিদ্রোহী হতে বাধ্য হবে।

প্রিয় পাঠক! এবার ভেবে দেখুন, তখন যদি সকল মুসলিম শক্তি ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হতো, তাহলে কেমন হতো ক্রুসেডারদের পরিণতি?!

প্রথম ক্রুসেড অভিযানের মাধ্যমে শামের ইসলামি ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে চারটি খ্রিষ্টরাজ্য গড়ে ওঠে—এডেসা, এন্টিয়ক, বাইতুল মুকাদ্দাস ও ত্রিপোলি [৭১]। রাজ্যচারটির প্রতিষ্ঠাকাল যথাক্রমে :

১. এডেসা রাজ্য : রবিউল আউয়াল ৪৯১ হিজরি (ফেব্রুয়ারি ১০৯৮ খ্রিষ্টাব্দ)।
২. এন্টিয়ক রাজ্য : রজব ৪৯১ হিজরি (জুন ১০৯৮ খ্রিষ্টাব্দ)।
৩. বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্য : শাবান ৪৯২ হিজরি (জুলাই ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দ)।
৪. ত্রিপোলি রাজ্য : জিলহজ ৫০২ হিজরি (জুলাই ১১০৯ খ্রিষ্টাব্দ)।

প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রুসেড হামলার মধ্যবর্তী সময়ের পরিস্থিতি

ক্রুসেডাররা বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করার পর এক বছর অতিবাহিত না হতেই চতুর্দিক থেকে ঘিরে থাকা ইসলামি শক্তিগুলোর পক্ষ থেকে ব্যাপক আক্রমণের সম্মুখীন হয়। পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতাব্দী বলতে গেলে প্রতি বছর তারা মুসলমানদের হামলার শিকার হতে থাকে। এর ফলে খ্রিষ্টানদের জানমালের প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয় এবং তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সেলজুকদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনকারী উবায়দিদের সামনে যখন ক্রুসেডারদের প্রতারণা-বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তিরক্ষায় উদাসীনতার স্বভাব সুস্পষ্ট হয়ে যায়, তখন তারাও ক্রুসেডারদের ওপর হামলা চালাতে থাকে।

---

৭১. **ত্রিপোলি** : এটি লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলি নয়; বরং লেবানিজ নগরী। রাজধানী বৈরুতের পর ত্রিপোলি লেবাননের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী। উল্লেখ্য, লেবাননের ত্রিপোলি ও লিবিয়ার ত্রিপোলি উভয়টির আরবি নাম طرابلس (তারাবলুস) এবং উভয়টির ইংরেজি নাম Tripoli (ত্রিপোলি)। আরবিতে পার্থক্যকরণের জন্য প্রথমটিকে طرابلس الشام (শামের তারাবলুস) এবং দ্বিতীয়টিকে طرابلس الغرب (পশ্চিমা তারাবলুস) বলা হয়।

৫২১ হিজরি-পরবর্তী সময়ে ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় অনন্যসাধারণ ভূমিকা রাখেন সুলতান ইমাদুদ্দিন জিনকি ও তার বংশধরগণ। ঐতিহাসিক ইবনুল আছির রহ. বলেন—

> আল্লাহ তাআলা যদি শহিদ ইমাদুদ্দিন জিনকির শাসনের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর ওপর অনুগ্রহ না করতেন, তাহলে ফিরিঙ্গিরা পুরো শাম অঞ্চল দখল করে নিত।[৭২]

ইমাদুদ্দিন জিনকির পিতা হাজিব আক সুনকুর তুর্কমানির পরিচিতি

তুর্কি বংশোদ্ভূত আক সুনকুর ছিলেন তুর্কি শাখাগোত্র 'সাবয়ু'-এর সদস্য। তিনি বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্যের সুলতান মালিক শাহের প্রিয়পাত্র ছিলেন। সুলতান মালিক শাহ তার প্রতি এতটা আস্থাশীল ছিলেন যে, তিনি আক সুনকুরকে 'কাসিমুদ্দৌলা' (সাম্রাজ্যের অংশীদার) উপাধি প্রদান করেন। অর্থাৎ সুলতান মনে করতেন, সাম্রাজ্য পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আক সুনকুর তার সঙ্গে শরিক আছেন! ৪৭৯ হিজরি সনের শাওয়াল মাসে (১০৮৭ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে) আলেপ্পো নগরীতে সুলতান মালিক শাহের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি আক সুনকুরকে আলেপ্পোর প্রশাসক নিযুক্ত করেন। সুলতান তাকে আলেপ্পোর পাশাপাশি হামা, মানবিজ ও লাতাকিয়াসহ এ অঞ্চলের আরও কিছু নগরীর শাসনক্ষমতাও প্রদান করেন। হাজিব আক সুনকুর আপন প্রশাসনিক দক্ষতা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মনীতির মাধ্যমে অল্পসময়ের মধ্যে আলেপ্পোর প্রতিটি অঙ্গনে ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন এবং ভঙ্গুরপ্রায় নগরীটিকে নতুন করে দাঁড় করান। আপন কর্মগুণে তিনি সকল মানুষের আলোচনায় পরিণত হন এবং আলেপ্পোবাসীর অগাধ ভালোবাসা লাভ করেন।

৪৮৫ হিজরি সনের শাওয়াল মাসে (১০৯২ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে) সুলতান মালিক শাহ ইন্তেকাল করার পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র বারকিয়ারুক সুবিশাল সেলজুক সাম্রাজ্যের সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু মালিক শাহের ভাই তুতুশ আপন ভ্রাতুষ্পুত্র বারকিয়ারুকের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে জোরপূর্বক সালতানাতের অধিকার অর্জনের সিদ্ধান্ত নেন। ৪৮৬ হিজরি সনে তুতুশ ও বারকিয়ারুকের বাহিনী পারস্যের রায়

---

৭২. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত তারীখ*, ৯/১২।

নগরীতে মুখোমুখি হয়। আক সুনকুর শুরুতে তুতুশের বাহিনীর সঙ্গে থাকলেও যুদ্ধ শুরু হতেই তার বাহিনী নিয়ে সটকে পড়েন এবং বারকিয়ারুকের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হন। এর ফলে তুতুশের বাহিনীর শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তারা যুদ্ধে পরাজিত হয়। বিক্ষুব্ধ তুতুশ কিছুদিন পরই প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষ্যে আলেপ্পোতে হামলা চালান। ৪৮৭ হিজরি সনের জুমাদাল উলা মাসে (১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে) তুতুশের বাহিনীর হাতে আক সুনকুর বন্দি হন। দুরাচারী তুতুশ তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করেন।

ঐতিহাসিক ইবনুল আছির হাজিব আক সুনকুর সম্পর্কে বলেন—

> কাসিমুদ্দৌলা ছিলেন প্রজার প্রতি সদাচরণ ও জন-অধিকার রক্ষার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠতম রাজন্য। তার রাজ্যে ছিল পণ্যের সহজলভ্যতা, পূর্ণ ন্যায়বিচার ও বিস্তৃত নিরাপত্তা।[৭৩]

আরেক ঐতিহাসিক ইবনে কাছির বলেন—

> কাসিমুদ্দৌলা ছিলেন শ্রেষ্ঠতম সদাচারী, নিষ্কলুষ ও সত্যনিষ্ঠ শাসক। তার আমলে জনজীবনে ছিল নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও পণ্যের সুলভ ব্যবস্থা।[৭৪]

ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় ইমাদুদ্দিন জিনকি

পিতা আক সুনকুরের মৃত্যুর সময় ইমাদুদ্দিন জিনকির বয়স ছিল দশেরও কম। পিতৃবিয়োগের কিছুদিন পরই তিনি আলেপ্পো ত্যাগ করে মসুলে চলে যান। তখন মসুলের প্রশাসক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তার পিতার বন্ধু কারবুগা। কারবুগার তত্ত্বাবধানে ইমাদুদ্দিন জিনকি যুদ্ধবিদ্যা, রণকৌশল ও সেনাপরিচালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে থাকেন। ৪৯৫ হিজরি সনে (১১০২ খ্রিষ্টাব্দে) কারবুগা ইন্তেকাল করার পর মসুলের প্রশাসক নির্বাচিত হন আমির জাকারমিশ। কারবুগার মতো তিনিও কাসিমুদ্দৌলা আক সুনকুরের নিষ্ঠাবান বন্ধু ছিলেন। জাকারমিশ কারবুগার অসমাপ্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে ইমাদুদ্দিনের যথার্থ প্রতিপালন করতে থাকেন। তিনি তাকে নেতৃত্ব ও পরিচালনার সব ধরনের

---

[৭৩]. প্রাগুক্ত, ৮/৪৯৫।

[৭৪]. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১২/১৪৭।

কলাকৌশল শিক্ষা দেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাকে অন্যদের তুলনায় যোগ্য ও অগ্রগামী করে গড়ে তোলেন।

৫০৭ হিজরি সনে (১১১৩ খ্রিষ্টাব্দে) ইমাদুদ্দিন জিনকি মসুলের তৎকালীন প্রশাসক মওদুদ বিন তুনতেকিনের অধীনে সিন্নাবরার যুদ্ধে অংশ নেন এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অপূর্ব বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন। এ সময় সমগ্র মুসলিমবিশ্বে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি জনমানুষের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন।

এরপর মসুলের প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত হন আক সুনকুর আল-বুরসুকি। ইমাদুদ্দিন জিনকি তার অধীনেও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযানে পূর্ণ উদ্যমে অংশগ্রহণ করেন এবং এডেসা, সুমাইসাত ও সারুজ অবরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এর পাশাপাশি তিনি সেলজুক সুলতান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে সফলতার সঙ্গে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন।

ইমাদুদ্দিন জিনকির একের পর এক ধারাবাহিক সাফল্যে প্রীত হয়ে বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্যের সুলতান মুগিছুদ্দিন মাহমুদ তাকে ৫১৮ হিজরি সনে বসরার প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত করেন। ৫২১ হিজরি সনে সুলতান তাকে 'শিহনাতুল ইরাক' বা ইরাক অঞ্চলের নিরাপত্তা-প্রধানের দায়িত্ব প্রদান করেন। একই বছরের ৩ রমজান (১১২৭ খ্রিষ্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর) সুলতান মাহমুদ ইমাদুদ্দিন জিনকিকে মসুল, জাযিরা ও শামের বিজিত অঞ্চলের আতাবিক[৭৫] হিসেবে নিয়োগ দেন। এর মাধ্যমে ইমাদুদ্দিন

---

৭৫. 'আতাবিক' একটি তুর্কি শব্দ। তুর্কি 'আতাবিক' শব্দের অর্থ রাজপুত্রের দীক্ষক। সেলজুক সুলতানগণ শুরুতে সুলতান-পুত্রদের শিক্ষাদীক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে সম্মানসূচক পদবি হিসেবে 'আতাবিক' উপাধি প্রদান করতেন। পরবর্তী সময়ে সালতানাতের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রশাসক, সেনাপতি ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকেও উক্ত উপাধি প্রদান করা হয়। প্রথমে আতাবিক উপাধি লাভ করেন সেলজুক সুলতান মালিক শাহের উজির নিজামুল মুলক আবু আলি হাসান বিন আলি।

সেলজুক সুলতানগণ আতাবিক উপাধিধারী অনেককেই বিশাল জায়গির ভূমি প্রদান করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেলজুক সুলতানদের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়লে তাদের অনেকেই স্বাধীন রাষ্ট্রক্ষমতা ভোগ করতে থাকে। আবার অনেকে সেলজুক সুলতানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখলেও মোটামুটি স্বাধীনতা ভোগ করত। প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি সম্বন্ধ করে এসব রাষ্ট্র আতাবিকি রাষ্ট্র নামে পরিচিতি লাভ করে। সুবিশাল সেলজুক সাম্রাজ্যের ভাঙনের পেছনে আতাবিকদের আলাদা রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠাও ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল।

জিনকির হাতে সূচিত হয় ইসলামি ইতিহাসের সুপরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায় 'জিনকি রাজ্য'।

ইমাদুদ্দিন জিনকি প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আপন অত্যুচ্চ যোগ্যতা, শক্তিমত্তা ও কীর্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটান। বিশেষ করে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদে তিনি যে বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা ইসলামি ইতিহাসের পাতায় তার নাম চির অম্লান করে রাখবে। তার প্রশাসন আমলে এমন কোনো বছর অতিবাহিত হয়নি, যে বছর তিনি ফিরিঙ্গিদের হাত থেকে অধিকৃত কোনো ভূমি পুনরুদ্ধার করেননি। অথচ ইমাদুদ্দিন জিনকির শাসনামল মোটেও নিষ্কণ্টক ছিল না। অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যা সবসময় তার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে বাধা হয়ে দাঁড়াত। কখনো সমস্যা তৈরি হতো সেলজুক সুলতানদের প্রভাব দমনের চেষ্টারত আব্বাসি খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহর পক্ষ থেকে; আবার কখনো তার ক্ষমতা হুমকির মুখে পড়ে যেত সেলজুক পরিবারের সদস্যদের অন্তর্বিরোধের কারণে। মাথার ওপর চেপে বসা এই সার্বক্ষণিক হুমকি উপেক্ষা করেই তিনি লড়াই চালিয়ে যেতেন খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে।

ঐতিহাসিক ইবনে কাছির রহ.-এর নিম্নোক্ত বর্ণনায় তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির চিত্র কিছুটা হলেও আন্দাজ করা যেতে পারে। তিনি বলেন—

> ৫২১ হিজরির কথা। বছর শুরু হয় খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ ও সেলজুক সুলতান মাহমুদের পারস্পরিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। খলিফা তখন পশ্চিমাঞ্চলে তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। মুহাররমের চার তারিখ বুধবার সুলতানের একদল সৈন্য খলিফার প্রাসাদে পৌঁছায়। অস্ত্রধারী এক হাজার সৈন্যের বাহিনীটি ব্যাপক লুটতরাজ চালায়। রাজপ্রাসাদ হতে দাসীরা সাহায্যপ্রার্থনা করতে করতে উন্মুক্ত চেহারায় বের হয়ে আসে।
>
> ... এ ঘটনা জানতে পেরে খলিফা তার বাহিনী নিয়ে রওনা হন। কিছু নৌযান নিয়ে আসা হয়। বাগদাদজুড়ে হইচই ও অস্থিরতা শুরু হয়ে যায়। মনে হচ্ছিল—পৃথিবীজুড়ে প্রবল ভূকম্পন শুরু হয়েছে! খলিফার বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষুব্ধ জনসাধারণও যোগ দেয়

> এবং সকলে মিলে সুলতানের বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। সুলতানের পক্ষাবলম্বী সৈন্যদের অনেকে নিহত হয়, বন্দিও হয় অনেকে। বাগদাদজুড়ে ব্যাপক গন্ডগোল ছড়িয়ে পড়ে। জনসাধারণ সুলতান মাহমুদের নাগাল পেয়ে যায় এবং তাকে বলতে থাকে—আরে বাতিনি! ফরাসি ও রোমানদের বাদ দিয়ে তুমি লড়াই করছ খলিফার সঙ্গে?!
>
> ... আশুরার দিন পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে এবং সুলতান খলিফার কাছে নিরাপত্তা ও সন্ধি প্রার্থনা করেন।[৭৬]

একটু পর ইবনে কাছির রহ. বলেন—

> ৫২৩ হিজরি সনে ফিরিঙ্গিরা দামেশক অবরোধ করে। দামেশকের অধিবাসীরা নগরী ছেড়ে বেরিয়ে এসে ফিরিঙ্গি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই করে। এ সময় দামেশকবাসী খলিফার কাছে সাহায্যপ্রার্থনার জন্য আবদুল্লাহ ওয়ায়েয ও একদল ব্যবসায়ীকে বাগদাদে প্রেরণ করে। বিক্ষুব্ধ প্রতিনিধিদল জামে মসজিদের মিম্বর ভেঙে ফেলতে উদ্যত হলে খলিফা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, শীঘ্রই তিনি সুলতানের কাছে বার্তা পাঠিয়ে ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বাহিনী প্রেরণ করতে অনুরোধ করবেন। খলিফার প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর পরিস্থিতি শান্ত হয়। কিন্তু এরপর সুলতান দামেশকে কোনো সৈন্যদল প্রেরণ করেননি। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে দামেশকবাসী নিজেরাই ফিরিঙ্গিদের পরাজিত করতে সক্ষম হয় এবং তাদের দশ হাজার সৈন্যকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়।[৭৭]

৫৩৯ হিজরি সনে (১১৪৪ খ্রিষ্টাব্দে) সুলতান ইমাদুদ্দিন জিনকি এডেসা অবরোধ করেন এবং অর্ধ শতাব্দী ক্রুসেডারদের অধিকৃত নগরীটিকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। এডেসা নগরী জয় করার পর সুলতান ইমাদুদ্দিন জিনকি সেখানকার খ্রিষ্টান অধিবাসীদের সঙ্গে কোমল ও উদার আচরণ করেন। খ্রিষ্টান নাগরিকরা অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করে জিনকির ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা এবং ইসলামের দয়া ও উদারতা।

---

৭৬. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১২/১৮৪।

৭৭. প্রাগুক্ত, ১২/১৮৭।

ইমাদুদ্দিন জিনকি ৫৪১ হিজরি সনের ৬ রবিউস সানি (১১৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর) ফুরাত তীরবর্তী জাবার দুর্গ অবরোধকালে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। তাকে হত্যার অভিযোগের তির শিয়া ইসমাইলি (বাতিনি) সম্প্রদায়ের দিকেই তাক করা হয়। শিয়া বাতিনি সম্প্রদায় হিজরি তৃতীয় শতাব্দী থেকেই বিভিন্ন মহান মুসলিম নেতা ও সেনাপতিদের গুপ্তহত্যার মাধ্যমে ইসলামকে ধ্বংস করার মিশন শুরু করেছিল।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল আছির ইমাদুদ্দিন জিনকির গুণ ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে বলেন—

> তিনি আপন সেনাবাহিনী ও জনসাধারণের ওপর অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। সুমহান প্রশাসননীতির অধিকারী ইমাদুদ্দিনের শাসনামলে সবল দুর্বলের ওপর অত্যাচার করতে পারত না। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্বে অন্যায়-অনাচার, প্রশাসকগণের ঘন ঘন স্থানান্তর ও পাশেই খ্রিষ্টরাজ্যের অবস্থানের কারণে উক্ত অঞ্চল বিরানপ্রায় ছিল। ইমাদুদ্দিন দায়িত্ব গ্রহণ করার পর অঞ্চলটি আবাদ করেন। পুরো অঞ্চল জনসাধারণের আবাসনে মুখরিত হয়ে ওঠে। ইমাদুদ্দিন অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ছিলেন। বিশেষত সৈন্যদের স্ত্রীদের মর্যাদা রক্ষায় তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন। এককথায় তিনি ছিলেন সমকালের শ্রেষ্ঠতম বীর সেনানী।[৭৮]

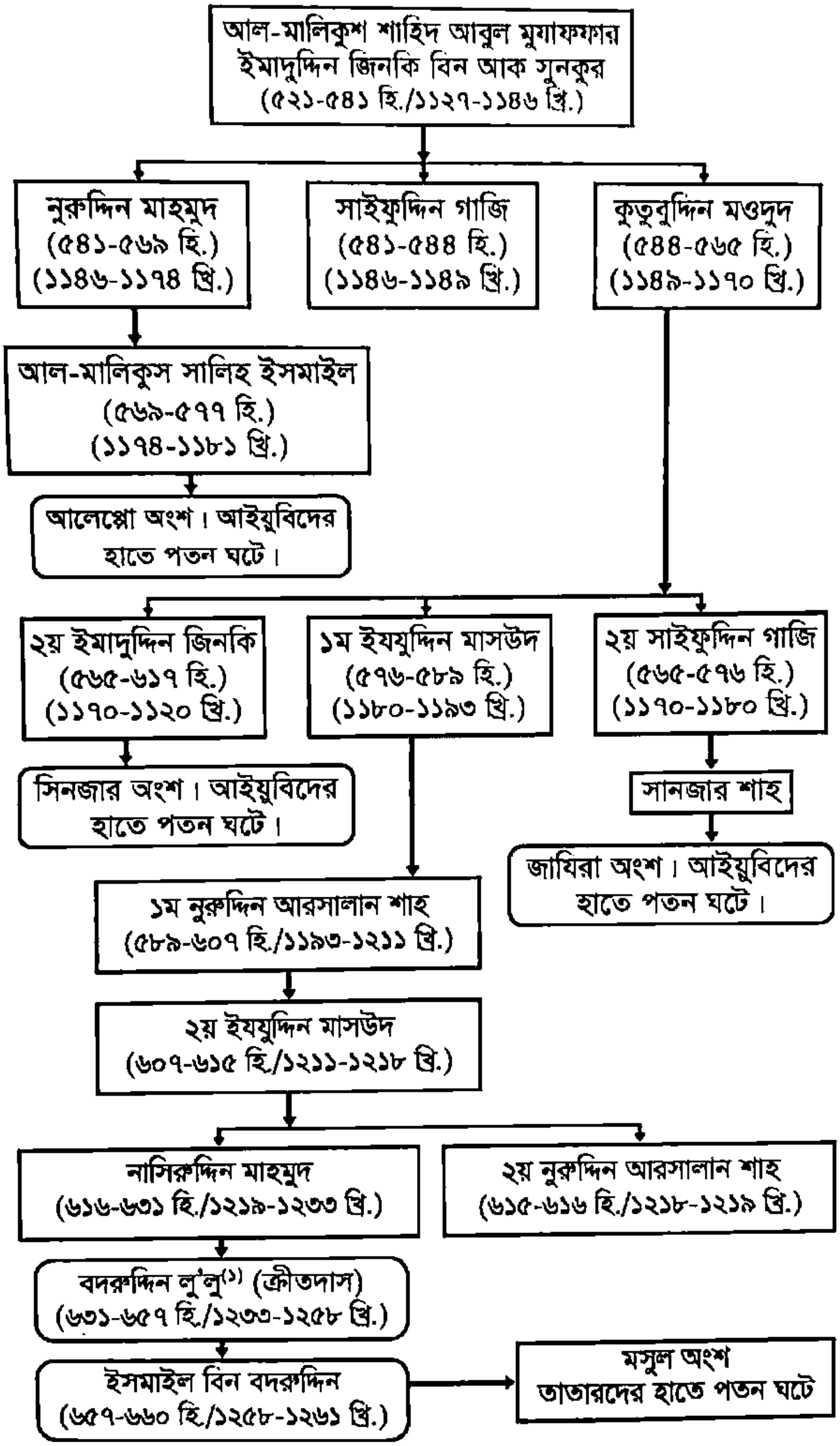
ইমাদুদ্দিনের ইন্তেকালের পর তার প্রতিষ্ঠিত জিনকি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব অংশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাইফুদ্দিন গাজি, এ অংশের কেন্দ্র ছিল মসুল; আর পশ্চিম অংশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার দ্বিতীয় পুত্র নুরুদ্দিন মাহমুদ, এ অংশের কেন্দ্র ছিল আলেপ্পো। উভয়ের রাজ্যের সীমানা ছিল জাযিরা অঞ্চলের খাবুর নদী (The Khabur River)।

---

৭৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত তারীখ*, ৯/১৪২-৪৩।

জিনকি পরিবারের আতাবিক পদবিধারীদের বংশলতিকা

[৫২১-৬৬০ হিজরি—১১২৭-১২৬১ খ্রিষ্টাব্দ]



১. বদরুদ্দিন লু'লু জিনকি বংশীয় ছিলেন না। তিনি ছিলেন ১ম নুরুদ্দিন আরসালান শাহ-এর ক্রীতদাস। মনিবপুত্র ২য় ইযযুদ্দিন মাসউদের ইন্তেকালের পর তিনি ইযযুদ্দিনের দুই পুত্রকে একে একে ক্ষমতায় বসান। অবশেষে নাসিরুদ্দিন মাহমুদের ইন্তেকালের পর তিনি নিজেই মসুলের জিনকি সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় ক্রুসেড
[৫৪০-৫৪৩ হিজরি/১১৪৫-১১৪৮ খ্রিষ্টাব্দ]

১১৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন পোপ ৩য় ইউজেন (Pope Eugene III) দ্বিতীয় ক্রুসেডের ডাক দেন। ইউরোপ থেকে পরিচালিত দ্বিতীয় ক্রুসেডের উদ্দেশ্য ছিল ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুসলমানরা এডেসাসহ যে সমস্ত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেছিল, সেখানে পুনরায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং জিনকি পরিবারের কর্তৃত্বপূর্ণ আবির্ভাবের পর পুনরায় শাম অঞ্চলে খ্রিষ্টানদের অবস্থান সুদৃঢ় করা। দ্বিতীয় ক্রুসেড অভিযানে খ্রিষ্টান বাহিনীর নেতৃত্ব দেন ফ্রান্সের রাজা ৭ম লুই (Louis VII) ও জার্মানির রাজা ৩য় কনরাড (Conrad III)।

জার্মান বাহিনী উপকূলীয় পথ ধরে বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওনা হয়। পথিমধ্যে দোরিলায়ুমে রোমান সেলজুক বাহিনী তাদের ওপর আক্রমণ করে এবং তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। সেলজুকরা এ যুদ্ধে বর্ণনাতীত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করে। সেলজুকদের আক্রমণে জার্মান বাহিনী কার্যত বিধ্বস্ত হয়ে যায়। বিশ হাজার সৈন্যের মধ্যে আঠারো হাজার সৈন্যই এ সময় নিহত হয়। ৫৪২ হিজরি সনের ২৮ জুমাদাল উলা (১১৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ অক্টোবর) সংঘটিত এ যুদ্ধ ইতিহাসে ২য় দোরিলায়ুমের যুদ্ধ নামে খ্যাত। জার্মান রাজা ৩য় কনরাড অবশিষ্ট দুই হাজার সৈন্য নিয়ে চরম নিঃস্ব-রিক্ত ও লাঞ্ছনাকর অবস্থায় নিকিয়ায় ফিরে যান এবং ফরাসি বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

ফ্রান্সের রাজা লুই যদিও তুলনামূলক নিরাপদ পথ বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু তিনিও সেলজুকদের আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি। বাধ্য হয়ে তিনি অভিযানের মূল লক্ষ্য এডেসা পুনরুদ্ধারের কথা বেমালুম ভুলে যান এবং গতিপথ পরিবর্তন করে সাগরপথে এন্টিয়ক হয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছান।

বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছার পর সুবিশাল ক্রুসেডার বাহিনী ৭ম লুই ও ৩য় কনরাডের নেতৃত্বে ৫৪৩ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসে (১১৪৮ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে) দামেশক অবরোধ করে। ক্রুসেডার বাহিনীর মোকাবিলায় দামেশকের এক লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী বেরিয়ে আসে। উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। যুদ্ধের প্রথম দিন

প্রায় দুইশ মুসলিম সৈন্য শহিদ হয়। খ্রিষ্টান পক্ষ হারায় অগণিত সৈন্য। যুদ্ধ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দীর্ঘায়ত হলে দামেশককে সংরক্ষিত মাসহাফে উসমানি জামে দামেশকের আঙিনায় উপস্থিত করা হয়। জনগণ মাসহাফে উসমানির পাশে সমবেত হয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করতে থাকে। মহিলা ও শিশুরা মাথা উন্মুক্ত করে কান্নাকাটি করে আল্লাহর তাআলার দরবারে সাহায্যপ্রার্থনা করতে থাকে। দামেশকের প্রশাসক মুজিরুদ্দিন আবিক আলেপ্পোর অধিপতি নুরুদ্দিন মাহমুদ ও তার ভাই মসুলের শাসক সাইফুদ্দিন গাজির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তারা দুজন অন্যান্য আরও সেনাপতিসহ দ্রুত সত্তর হাজার সৈন্য নিয়ে দামেশকের উদ্দেশে রওনা হয়ে হিমসে অবতরণ করেন। হিমসে পৌঁছে নুরুদ্দিন মুইনুদ্দিনের কাছে নিম্নোক্ত বার্তা প্রেরণ করেন—

> আমার অঞ্চলের অস্ত্রধারী সৈন্যদের নিয়ে আমি চলে এসেছি। আমি চাচ্ছি, আমার প্রতিনিধিগণ দামেশকে চলে যাক আর আমি খ্রিষ্টানদের মুখোমুখি হই। যদি আমি পরাজিত হই, তাহলে আমি আমার বাহিনী নিয়ে দামেশকের অভ্যন্তরে নগরীর প্রতিরক্ষার চেষ্টা করব; আর যদি বিজয়ী হই, তাহলে নগরীর কর্তৃত্ব তোমাদের হাতেই থাকবে। আমরা দামেশকের কর্তৃত্ব নিয়ে তোমাদের সঙ্গে কোনো বিরোধে জড়াব না।

কিন্তু নুরুদ্দিনের বার্তা পেয়ে দামেশকের শাসক মুজিরুদ্দিন ও সেনাপ্রধান মুইনুদ্দিন আনুর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা আশঙ্কা করে যে, নুরুদ্দিন দামেশক দখল করার মনস্থ করেছেন। তাদের নির্দেশে দামেশকের নগরদ্বার বন্ধ করে দিয়ে নুরুদ্দিন ও সাইফুদ্দিনের প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়।

এরপর মুইনুদ্দিন দুটি বার্তা তৈরি করে একটি ক্রুসেডার বাহিনীর নেতৃবৃন্দের কাছে প্রেরণ করেন, অপরটি প্রেরণ করেন ক্রুসেডার বাহিনীকে সহায়তাকারী শামের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী খ্রিষ্টান নেতৃবৃন্দের কাছে। প্রথম বার্তায় তিনি লেখেন—প্রাচ্যের অধিপতি এসে পড়েছেন। তোমরা স্বেচ্ছায় কেটে পড়ো, আর না হয় আমি তার হাতে রাজ্য ছেড়ে দেবো। তখন তোমাদের পস্তাতে হবে।

আর দ্বিতীয় বার্তায় তিনি লেখেন—তোমরা কোন বুদ্ধিতে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদের (ক্রুসেডার বাহিনীর) কাছে সাহায্য চাইলে?! তোমরা তো ভালো করেই জানো যে, তারা যদি দামেশক দখল করতে পারে, তাহলে তোমাদের কর্তৃত্বে থাকা উপকূলীয় অঞ্চলগুলোও ছিনিয়ে নেবে। অপরদিকে আমি যদি আমার রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায় দুর্বলতা বোধ করি, তাহলে সামান্য দ্বিধা না করে দামেশকের নিয়ন্ত্রণ সাইফুদ্দিনের হাতে ছেড়ে দেবো। আর তোমরা জানো, যদি তিনি দামেশকের কর্তৃত্ব লাভ করেন, তাহলে শাম অঞ্চলে তার সামনে টিকে থাকার মতো শক্তি তোমাদের নেই।

নুরুদ্দিন ও সাইফুদ্দিনের আগমনের কথা শুনে ক্রুসেডার বাহিনী পলায়ন করে। কিন্তু মুসলিম বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং অসংখ্য খ্রিষ্টান সৈন্যকে হত্যা করে। ঐতিহাসিক ইবনে কাছির রহ. বলেন—

> খ্রিষ্টান ফিরিঙ্গিরা (দামেশক) নগরী প্রায় দখল করেই ফেলেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা দামেশককে রক্ষা করেন এবং আপন কুদরত ও ক্ষমতা দ্বারা নিরাপদ রাখেন। ... কাফির শত্রুরা কখনোই দামেশক দখল করতে পারবে না, (ইনশাআল্লাহ)। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষ্যমতে দামেশক হলো সেই মহান নগরী, যা ফিতনা ও দুর্যোগকালে ইসলামের দুর্গ হবে। (কিয়ামতের পূর্বে ফিতনার যুগে) ঈসা বিন মরিয়ম দামেশকেই অবতরণ করবেন।
>
> খ্রিষ্টান ফিরিঙ্গিরা দামেশকের অনেক অধিবাসীকে হত্যা করে। নিহতদের মধ্যে দামেশকের মহান ফকিহ মালিকি মাজহাবের শায়খ হুজ্জাতুল ইসলাম আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ বিন দুনাস ফিন্দালাবিও ছিলেন।[৭৯]

৫৪৪ হিজরি সনে নুরুদ্দিন এন্টিয়ক অভিমুখে রওনা হন। এ অভিযানে তিনি ক্রুসেডার বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেন। তিনি এন্টিয়ক রাজ্যে প্রবেশ করে আছি নদীর পূর্বে অবস্থিত সকল এলাকা অধিকার করতে সক্ষম হন। এ বছরই নুরুদ্দিনের ভাই সাইফুদ্দিন গাজি ইন্তেকাল করেন।

---

৭৯. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১২/২১০।

এরপর মসুলে সাইফুদ্দিনের উত্তরাধিকারগণ প্রশাসনিক দায়িত্ব লাভ করলেও তাদের ওপর নুরুদ্দিনের প্রভাব ও কর্তৃত্ব ছিল।

জিনকি পরিবারের ঐক্য ও সুদৃঢ় সামরিক শক্তি প্রত্যক্ষ করে ক্রুসেডাররা উপলব্ধি করে যে, জিনকি পরিবারকে পরাভূত করে শাম ও ইরাকের উত্তরাঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখা দিবাস্বপ্ন ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাই এদিকে অভিযানের চিন্তা বাদ দিয়ে এবার তারা দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দক্ষিণ-পশ্চিমে উবায়দিদের অধিকৃত অঞ্চলের প্রতি।

মিশরের উবায়দি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে ৫৪৮ হিজরি সনে (১১৫৩ খ্রিষ্টাব্দে) বাইতুল মুকাদ্দাস খ্রিষ্টরাজ্যের শাসক তৃতীয় বল্ডউইন (Baldwin III) উবায়দিদের কাছ থেকে আসকালান[৮০] দখল করে নেন। এর ফলে পুরো শাম ও ফিলিস্তিনের উপকূলীয় অঞ্চলে ক্রুসেডারদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য নিশ্চিত হয়। মুসলমানরা বারবার আক্রমণ করলেও শেষ পর্যন্ত আসকালান নৌবন্দরের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়।

আসকালান ক্রুসেডারদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ায় নুরুদ্দিন জিনকি দামেশক নিয়ে নতুন করে চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ, দামেশকের কারণেই তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রসর হতে পারছিলেন না। সবদিক বিবেচনা করে তিনি এবার দামেশকে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। ৫৪৯ হিজরি সনের মুহাররম মাসে (১১৫৪ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে) নুরুদ্দিন জিনকি দামেশক অবরোধ করেন। তিনি দশদিন দামেশক অবরোধ করে রাখলেও সেখানে কোনো আক্রমণ করেননি। তিনি এ সময় বলেন, 'মুসলমানদের পরস্পর একে অপরকে হত্যা করার কোনো প্রয়োজন নেই।' নুরুদ্দিন দামেশকের প্রশাসক মুজিরুদ্দিনের কাছে বার্তা প্রেরণ করে তার দামেশকে আগমনের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। তিনি লেখেন—

---

৮০. ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন অঞ্চলের অন্যতম প্রাচীন নগরী আসকালান বর্তমানে দখলদার ইসরাইলের অধিকারে আছে। বিশিষ্ট সাহাবি আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি. আসকালান সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন—

«لكل شي ذروة، وذروة الشام عسقلان»

প্রতিটি বস্তুর একটি চূড়া থাকে; শামের চূড়া হলো আসকালান।

আমি তোমাদের সঙ্গে লড়াই করতে এখানে আগমন করিনি। আমি মুসলমানদের এই অভিযোগের কারণে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি যে, কৃষকদের সম্পদ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তাদের স্ত্রী-সন্তানদের খ্রিষ্টানদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। অথচ কেউ তাদের সাহায্য করছে না। আল্লাহর শোকর! তিনি আমাকে মুসলমানদের সাহায্য করার ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং প্রচুর সম্পদ ও সামরিক শক্তি দান করেছেন। এই নেয়ামতের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নির্যাতিত এসব মুসলমানের আহ্বান উপেক্ষা করে তাদের সাহায্য না করা আমার জন্য বৈধ হতে পারে না। অধিকন্তু আমার জানা আছে যে, তোমরা নিজেদের ভূখণ্ডের নিরাপত্তারক্ষায় অক্ষম। এই দুর্বলতার কারণেই তোমরা আমার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ফিরিঙ্গিদের সাহায্যপ্রার্থনা করেছ। তোমরা অসহায়-দুর্বল নাগরিকদের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে তা খ্রিষ্টানদের পেছনে ব্যয় করেছ। এমন গর্হিত আচরণ না আল্লাহ তাআলা পছন্দ করবেন, না কোনো মুসলমান বরদাশত করবে।

কিন্তু মুজিরুদ্দিন নুরুদ্দিনের বার্তা উপেক্ষা করে খ্রিষ্টানদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাদেরকে নুরুদ্দিনের বাহিনীর ওপর আক্রমণের প্রতি প্ররোচিত করেন। বিনিময়ে দেওয়া হয় প্রচুর অর্থসম্পদ প্রদানের পাশাপাশি বালাবাক্কু দুর্গ প্রদানের প্রস্তাব!

কিন্তু দামেশকের অধিবাসীরা তো নুরুদ্দিনেরই প্রতীক্ষা করছিল! তারা এবার অগ্রসর হয়ে নুরুদ্দিনের জন্য নগরীর প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। নুরুদ্দিন দামেশকে প্রবেশ করে সাধারণ নিরাপত্তা ঘোষণা করেন এবং জনগণের ওপর আরোপিত কর বাতিল করেন। তিনি মুজিরুদ্দিনকেও নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং তাকে হিমসে পাঠিয়ে দেন। এরপর তিনি দামেশককেই তার রাজ্যের রাজধানী নির্বাচিত করেন।

বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে, নুরুদ্দিন দামেশক অধিকার করার পর ক্রুসেডার রাজন্যবর্গ বার্তা পাঠিয়ে নুরুদ্দিনকে অভিনন্দন জানায়, তার আস্থা ও সুসম্পর্ক কামনা করে এবং তার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে। উল্লেখ্য, দামেশক ছিল আসকালান পুনরুদ্ধারের একমাত্র পথ। পূর্বেই বলা হয়েছে, ৫৪৮ হিজরি সনে ক্রুসেডাররা আসকালান দখল করে নিয়েছিল।

৫৫০ হিজরি সনকে ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর 'সম্মিলনের বর্ষ' গণ্য করা হয়। দীর্ঘদিন ক্রুসেডারদের পরোক্ষ প্রভাবে পরিচালিত দামেশক অঞ্চলকে ইতিমধ্যে নুরুদ্দিন আপন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে সমগ্র শাম অঞ্চল নুরুদ্দিনের শাসনাধীনে চলে এসেছে এবং একক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। নুরুদ্দিন এবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন মিশরের প্রতি। কারণ, শাম ও মিশর মিলে যদি একক শক্তিতে পরিণত হয়, তাহলে তা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে এক দুর্জেয় শক্তিরূপে আবির্ভূত হতে পারবে। কিন্তু এ সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং আপন লক্ষ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে বাধার সম্মুখীন হন। নুরুদ্দিনের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে ক্রুসেডাররা কয়েকটি যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করে। আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহে কিছুদিন পরই নুরুদ্দিন জিনকি সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নবোদ্যমে অগ্রসর হন। ৫৫৯ হিজরিতে (১১৬৪ খ্রিষ্টাব্দে) নুরুদ্দিন হারিম দুর্গ জয় করেন এবং দুর্গটিকে খ্রিষ্টান-দখলমুক্ত করেন। তুমুল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অত্যন্ত সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য দুর্গটি মুসলমানদের অধিকারে আসে। হারিমের বিজয়াভিযান ছিল অন্যতম মহান বিজয়াভিযান।

আমরা যদি তৎকালীন আব্বাসি খিলাফতের রাজধানী বাগদাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তাহলে দেখতে পাব—বাগদাদ তখন সেলজুক সুলতান মুহাম্মাদ বিন মুগিছুদ্দিন মাহমুদ বিন ২য় মালিক শাহ কর্তৃক অবরুদ্ধ! আব্বাসি খলিফা বাগদাদে খুতবায় সেলজুক সুলতানের নাম পাঠের নির্দেশ জারি করতে অস্বীকৃতি জানানোয় বাগদাদের এই পরিণতি!

৫৫৮ হিজরি সনে ক্রুসেডাররা বিশাল সামরিক শক্তি সহযোগে মিশর দখলের উদ্দেশে রওনা হয়। কিন্তু নুরুদ্দিন জিনকি তাদের প্রতিহত করেন।

এরপর মিশরকে কেন্দ্র করে নাটকীয় নানা ঘটনা ঘটতে থাকে এবং উবায়দি সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এর বিস্তারিত বিবরণ উবায়দি সাম্রাজ্যসংক্রান্ত স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে। অবশেষে মিশরের শাসনভার চলে আসে সালাহুদ্দিন আইয়ুবির কাছে।

৫৬৫ হিজরি সনে (১১৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) খ্রিষ্টান বাহিনী দিমইয়াত অবরোধ করলে সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। সে সময়

একদিন জনৈক হাদিসশিক্ষার্থী তাকে প্রিয় নবীজির হাদিস পাঠ করে শোনানোর সময় মৃদু হাসি পরম্পরাবিশিষ্ট একটি হাদিস[৮১] পাঠ করে। তখন উক্ত হাদিসের রীতি অনুযায়ী হাসির ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে তাকে মৃদু হাসার অনুরোধ করা হলে তিনি অসম্মতি জানিয়ে বলেন, 'দিময়য়াতের মুসলিম অধিবাসীরা খ্রিষ্টান বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে আছে। মুসলমানদের এই দুর্দিনে আল্লাহ তাআলা আমাকে হাসতে দেখবেন—এটা ভাবতেও আমার লজ্জা হচ্ছে।'

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবু শামা রহ. বর্ণনা করেন—

> যে রাতে খ্রিষ্টান বাহিনী দিময়য়াত থেকে সরে যেতে বাধ্য হলো, সে রাতে মানসুরা দুর্গের আবু দারদা মসজিদের ইমাম নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন। নবীজি স্বপ্নযোগে তাকে বললেন, 'নুরুদ্দিনকে আমার সালাম বলো এবং তাকে সুসংবাদ জানিয়ে দিয়ো যে, ফিরিঙ্গিরা দিময়য়াত থেকে চলে গেছে।' (ইমাম বলেন) আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসুল, সংবাদ প্রদানের সময় আমি প্রমাণস্বরূপ কী নিদর্শন পেশ করব?' নবীজি উত্তর দিলেন, 'হারিম দুর্গ বিজয়ের দিন সে যে সিজদা করেছিল, তা প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করবে। সিজদায় সে বলেছিল—"হে আল্লাহ, কুকুর মাহমুদ কে?! আপনি আপনার দ্বীনকে সাহায্য করুন।"'
>
> নুরুদ্দিন যখন আবু দারদা মসজিদে ফজর নামাজ আদায় করতে উপস্থিত হলেন, তখন ইমাম সাহেব তাকে সুসংবাদ জানালেন এবং নিদর্শন সম্পর্কেও অবগত করলেন। স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে যখন 'কুকুর মাহমুদ কে?!'[৮২]—কথাটির প্রসঙ্গ এলো, তখন ইমাম সাহেব তা উচ্চারণ করতে বিব্রতবোধ

---

৮১. যেসব হাদিস বর্ণনা করার সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু হেসেছিলেন এবং নবীজির অনুসরণে উক্ত হাদিসের প্রত্যেক বর্ণনাকারী হাদিসটি বর্ণনার সময় মৃদু হেসেছেন, সেসব হাদিসকে الحديث المسلسل بالتبسم (মৃদু হাসি পরম্পরাবিশিষ্ট হাদিস) বলে।

৮২. নুরুদ্দিন সিজদায় গিয়ে এ কথা বলেছিলেন। তিনি জানতেন, নিশ্চয়ই নুসরত ও সাহায্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসে, মাহমুদের পক্ষ থেকে নয়। কারণ, মহা পরাক্রমশালী সত্তা আল্লাহ তাআলার সামনে মাহমুদ তো কিছুই নয়। [মূল গ্রন্থের টীকা]

করছিলেন। নুরুদ্দিন জিনকি তাকে বললেন, 'বলুন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে যা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা বলুন।' এরপর ইমাম সাহেব বাকি বৃত্তান্তও উল্লেখ করলেন। নুরুদ্দিন বললেন, 'আপনি সত্য বলেছেন।' এরপর নুরুদ্দিন আনন্দে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।[৮৩]

৫৬৬ হিজরি সনে সুলতান নুরুদ্দিন রাক্কায় অভিযান চালিয়ে সেখানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি একে একে নুসায়বিন[৮৪], খাবুর ও সিনজারও দখল করেন। তিনি সিনজার অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্ব তার জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র ইমাদুদ্দিন বিন মওদুদকে প্রদান করেন। এরপর সুলতান নুরুদ্দিন মসুলে পৌঁছে সেখানে চব্বিশ দিন অবস্থান করেন এবং আরেক ভ্রাতুষ্পুত্র সাইফুদ্দিন গাজি বিন মওদুদকে সেখানকার দায়িত্বে বহাল রাখেন। তিনি সাইফুদ্দিনকে মসুলের পাশাপাশি জাযিরা অঞ্চলের দায়িত্বও প্রদান করেন। নুরুদ্দিন তার আরেক মেয়েকে ভ্রাতুষ্পুত্র সাইফুদ্দিনের কাছে বিয়ে দেন। নুরুদ্দিন সাইফুদ্দিনকে জামে মসুল নির্মাণের নির্দেশ দেন এবং নিজেই নির্মাণকাজের তদারকি করেন। মসুলে অবস্থানের শেষ রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, নবীজি তাকে বলছেন, 'তোমার কাছে এখন তোমার রাষ্ট্রই প্রিয় হয়ে গেছে। আর তাই তুমি জিহাদ ও শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই ছেড়ে দিয়েছ!' নুরুদ্দিন তৎক্ষণাৎ জেগে উঠে সফরের প্রস্তুতি শুরু করেন এবং সেদিন ভোরেই শাম অভিমুখে যাত্রা করেন।[৮৫]

৫৬৭ হিজরি সনের প্রথম জুমার দিন (১১৭১ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে) সুলতান নুরুদ্দিন সালাহুদ্দিন আইয়ুবিকে মিশরে আব্বাসি খলিফার নামে

---

৮৩. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১২/২৪২।

৮৪. আরবি নাম نَصِيْبِيْن (নাসীবীন), ইংরেজি নাম Nusaybin (নুসায়বিন)।

৮৫. প্রায় তিন বছর পর ৫৬৮ হিজরি সনে মসজিদটির নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। সুলতান নুরুদ্দিন ৫৬৮ হিজরি সনে দ্বিতীয়বার মসুল সফর করেন এবং উক্ত মসজিদে নামাজ আদায় করেন। পরবর্তীকালে মসজিদটি 'জামে নুরি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বিগত ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২১ জুন মসুলে আইএস দমনে আন্তর্জাতিক জোটের পরিচালিত অভিযানের সময় উপর্যুপরি বোমা হামলায় মসজিদে নুরি ধ্বংস হয়ে যায়। উভয় পক্ষই এর জন্য একে অপরকে দায়ী করে আসছে। বর্তমানে ইউনেস্কোর সহায়তায় এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থায়নে মসজিদটির পুনর্নির্মাণকাজ চলছে।

খুতবা পাঠের নির্দেশ জারি করতে বলেন। এর মাধ্যমে সালাহুদ্দিনের শিক্ষক নুরুদ্দিন পুরো বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর একক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার প্রতি আপন সুগভীর ঈমানের কথাই যেন ঘোষণা করেন। এ পদক্ষেপের মাধ্যমেই তিনি মিশরের উবায়দি সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটান। নিঃসন্দেহে তার এই পদক্ষেপ পরবর্তীকালে ক্রুসেডারদের মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

মিশরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জিনকি রাষ্ট্রসীমা নুবিয়া অঞ্চল থেকে হামাদান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই সুবিশাল ভূখণ্ডের মাঝে কেবল খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলো বাদে বাকি সব এলাকা ছিল তার কর্তৃত্ব ও শাসনাধীন।

নুরুদ্দিন-সালাহুদ্দিন মনোমালিন্য

নুরুদ্দিন এ সময় উপকূলীয় অঞ্চলের খ্রিষ্টান রাজ্যগুলোতে আক্রমণ চালিয়ে তাদের প্রচুর ক্ষতিসাধন করতে থাকেন। এরপর তিনি কারাক (Al-Karak) নগরী অবরোধ করার সংকল্প করেন এবং মিশরের গভর্নর সালাহুদ্দিনকে মিশরীয় বাহিনী নিয়ে কারাকে তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু সালাহুদ্দিন আশঙ্কা করছিলেন যে, মিশর জিনকি রাষ্ট্রের অধিভুক্ত হওয়ার একেবারে প্রাথমিক এই সময়ে তিনি যদি মিশর ছেড়ে বাইরে কোথাও যান, তাহলে মিশরে জিনকি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ হুমকির মুখে পড়তে পারে। এ কারণেই সালাহুদ্দিন মিশর থেকে বের হওয়ার পরও দ্রুত মিশরে ফিরে আসেন এবং সমস্যার কথা জানিয়ে নুরুদ্দিনের কাছে বার্তা প্রেরণ করেন। কিন্তু নুরুদ্দিন সালাহুদ্দিনের আচরণে অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হন। তিনি এবার সসৈন্য মিশরে প্রবেশ করে সালাহুদ্দিনের কাছ থেকে মিশরের দায়িত্ব কেড়ে নিয়ে অন্য কাউকে মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করার মনস্থ করেন। এ সংবাদ সালাহুদ্দিনের কাছে পৌঁছলে তিনি অপ্রসন্ন হয়ে পড়েন এবং মিশরের সেনা নেতৃবৃন্দ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সমবেত করে তাদের সামনে বিষয়টি তুলে ধরেন। মজলিসে উপস্থিত সালাহুদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র তাকিউদ্দিন উমর তখন মন্তব্য করেন—'আল্লাহর শপথ! আমরা চাইলে নুরুদ্দিনের সঙ্গে লড়াই করতে পারব।'

মজলিসে সালাহুদ্দিনের পিতা আমির নাজমুদ্দিন আইয়ুবও উপস্থিত ছিলেন। তিনি এ কথা শুনে তাকিউদ্দিনকে তিরস্কার করেন এবং চুপ করিয়ে দেন। এরপর তিনি তার পুত্রকে লক্ষ্য করে বলেন—'আমি যা

বলছি, মন দিয়ে শোনো। আল্লাহর শপথ! এই মজলিসে যারা উপস্থিত আছে, তাদের মধ্যে তোমার প্রতি সবচেয়ে স্নেহশীল হচ্ছি আমি ও তোমার এই মামা (শিহাবুদ্দিন আল-হারিমি)। আল্লাহর শপথ! আমরা দুজনও যদি নুরুদ্দিনকে দেখি, তাহলে অগ্রসর হয়ে তার সম্মুখভূমিতে চুম্বন করে তাকে সম্মান জানাব। আমার বিশ্বাস অন্যান্য সেনাপতিসহ সাধারণ সৈন্যরাও তা-ই করবে। তিনি যদি তোমাকে কোনো উটচালকের সঙ্গে তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে আমার কাছে বার্তা প্রেরণ করেন, আমি নির্দ্বিধায় তার নির্দেশ পালন করব।'

এরপর নাজমুদ্দিন আইয়ুব উপস্থিত সকলকে সেখান থেকে চলে যেতে বলেন। সবাই চলে যাওয়ার পর তিনি নিভৃতে তার পুত্র সালাহুদ্দিনকে বলেন—তোমার জ্ঞানবুদ্ধি সবই কি লোপ পেয়েছে?! তুমি এদের উপস্থিতিতে এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে কীভাবে আলোচনা তুললে! উমর সবার সামনে এমন মন্তব্য করল আর তুমি তাতে সমর্থনও জানালে! এ বিষয়ে নুরুদ্দিন যদি অবগত হন, তাহলে তো তিনি মিশরে উপস্থিত হয়ে তোমার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা এবং আমাদের ঘরবাড়ি ও বসতি বিধ্বস্ত করার চেয়ে অন্য কোনো কাজকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করবেন না। আর নুরুদ্দিন এখানে উপস্থিত হলে সেনাবাহিনীর একজন সদস্যও তোমার সঙ্গে থাকবে না, সবাই তার দলে যোগ দেবে। এসব আত্মঘাতী চিন্তা বাদ দিয়ে তুমি নমনীয় হও এবং তার কাছে দূত পাঠিয়ে তার প্রতি আপন আনুগত্য ও বিনয়ের কথা প্রকাশ করো। তুমি তাকে বলো—'আমাদের মহান অভিভাবক সুলতান! আমার মতো তুচ্ছ অধমের বিরুদ্ধে লড়াই করার কী প্রয়োজন আপনার আছে?! এর পরিবর্তে আপনি কোনো উট বা উটচালক পাঠিয়ে দিন; আমি তার সঙ্গে আপনার দরবারে হাজির হয়ে যাব।'

সালাহুদ্দিন পিতার নির্দেশনামতো নুরুদ্দিনের কাছে দূত প্রেরণ করেন। সালাহুদ্দিনের আনুগত্য ও বিনয়সূচক আচরণ-উচ্চারণের পরিচয় পেয়ে নুরুদ্দিনের মন কোমল ও প্রশান্ত হয়ে যায় এবং তিনি মিশরে অভিযান পরিচালনার সংকল্প পরিবর্তন করে অন্য দিকে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

৫৬৮ হিজরি সনে (১১৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) নুরুদ্দিন রোমান সেলজুক রাজ্যের শাসক ইযযুদ্দিন কিলিজ আরসালান বিন মাসউদের শাসিত অঞ্চলে সফর করেন এবং সেখানকার বিভিন্ন বিষয়ের সংস্কার ও সমাধান করেন। এরপর

তিনি মারআশ ও বাহাসনা নগরী জয় করেন এবং উভয় নগরীতে ব্যাপক কল্যাণমূলক কাজ করেন।

সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদের ইন্তেকাল

[৫৬৯ হিজরি/১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দ]

ইসলামি ইতিহাসের এই ক্ষণজন্মা মহান শাসক ও সেনানায়কের জীবনচরিত ও কীর্তি-অবদান সম্পর্কে খুব কম ঐতিহাসিকই আলোচনা করেছেন। তাই তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইবনে কাছির রহ. বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ *'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া'*তে যা উল্লেখ করেছেন, তার প্রায় সবটুকুই আমরা এখানে পাঠক সমীপে উপস্থাপন করছি।

ইবনে কাছির রহ. লিখেছেন—

তার পূর্ণ নাম আল-মালিকুল আদিল (ন্যায়পরায়ণ শাসক) নুরুদ্দিন আবুল কাসিম মাহমুদ। পিতার নাম আল-মালিকুল আতাবিক কাসিমুদ্দৌলা ইমাদুদ্দিন আবু সাইদ জিনকি আশ-শাহিদ। পিতামহের নাম আল-মালিক আক সুনকুর আতাবিক কাসিমুদ্দৌলা। তিনি তুর্কি বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং সেলজুক সুলতানের অধীনস্থ ছিলেন।

নুরুদ্দিন রহ. ৫১১ হিজরি সনের ১৭ শাওয়াল (১১১৮ খ্রিষ্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি) রবিবার সূর্যোদয়ের সময় আলেপ্পোতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন আলেপ্পো ও মসুলসহ সুবিস্তৃত অঞ্চলের প্রশাসক। তিনি তার পিতার তত্ত্বাবধানে লালিতপালিত হন এবং কুরআনের ইলম, অশ্বারোহণ ও তিরন্দাজির শিক্ষা অর্জন করেন। নুরুদ্দিন সমুন্নত সাহস ও মনোবল, উচ্চাভিলাষ, সৎ চিন্তা, পূর্ণ আত্মমর্যাদাবোধ ও দৃশ্যমান ধার্মিকতার অধিকারী ছিলেন।

৫৪১ হিজরিতে জাবার দুর্গ অবরোধকালে তার পিতা মৃত্যুবরণ করলে আলেপ্পোর শাসনক্ষমতা পুত্র নুরুদ্দিনের হাতে আসে আর মসুলের শাসনক্ষমতা লাভ করেন নুরুদ্দিনের ভাই সাইফুদ্দিন গাজি। নুরুদ্দিন দিনে দিনে তার রাজ্য বিস্তৃত করতে থাকেন। ৫৪৯ হিজরি সনে তিনি দামেশক জয় করেন। তিনি দামেশকবাসীর প্রতি কল্যাণ আচরণ করেন; তাদের জন্য মসজিদ, মাদরাসা ও সরাইখানা প্রতিষ্ঠা করেন, পথচারীদের

চলাচলের জন্য প্রশস্ত সড়ক ও বিশ্রামের জন্য ছাউনি ও উদ্যান নির্মাণ করেন। তিনি দামেশকের বাজারগুলোর আয়তন সম্প্রসারণ করেন এবং বকরিপাল, তরমুজ ইত্যাদির গুদামের কর রহিত করেন।

নুরুদ্দিন হানাফি মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি উলামায়ে কেরামকে কেবল ভালোবাসতেন না, বরং তাদের সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করতেন। তিনি দরিদ্র-অসহায়দের প্রতি সদাচরণ করতেন। তিনি বিচারকার্যে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতেন এবং বিশুদ্ধ শরিয়তের অনুসরণ করতেন। সুলতান নুরুদ্দিন বিচার-মজলিসের আয়োজন করতেন এবং নিজে তার তত্ত্বাবধান করতেন। তার বিচারসভায় আলিম-ফকিহ, সকল মাজহাবের মুফতি ও বিচারকগণ সমবেত হতো। মুসলিম-জিম্মি নির্বিশেষে সকলে যেন ন্যায়বিচার লাভের জন্য তার কাছে আসতে পারে, এজন্য তিনি প্রতি মঙ্গলবার কুশকের ঝুলন্ত মসজিদে বসতেন।

সুলতান নুরুদ্দিন দামেশকের ইহুদিদের বিধ্বস্ত ও ধ্বংসপ্রায় বসতির চারপাশে প্রাচীর নির্মাণ করে দেন। তিনি দামেশকের কিসান দ্বার বন্ধ করে দেন এবং আল-ফারজ দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। আল-ফারজ দ্বারের স্থানে ইতিপূর্বে পরিপূর্ণ কোনো নগরদ্বার ছিল না।

তিনি তার শাসন-অঞ্চলে সুন্নাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন, বিদআত নির্মূল করেন এবং হুদুদ আইন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আজানে 'হাইয়া আলা খাইরিল আমাল'-এর পরিবর্তে 'হাইয়া আলাস সালাহ' ও 'হাইয়া আলাল ফালাহ' উচ্চারণের নির্দেশ দেন। তার পিতা ও পিতামহের শাসনামলে এ অঞ্চলে শিয়া রাফিজিদের রীতি দৃশ্যমান ও প্রবল থাকায় আজানে 'হাইয়া আলা খাইরিল আমাল' উচ্চারণ করা হতো।

সুলতান নুরুদ্দিন বহু দুর্গ জয় করেন। বহুবার তিনি খ্রিষ্টান ফিরিঙ্গি বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দেন এবং মুসলমানদের হাত থেকে খ্রিষ্টানদের দখলকৃত সুরক্ষিত-দুর্ভেদ্য বিভিন্ন দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন। পূর্বের বিভিন্ন বছরের ধারাবিবরণীতে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি দামেশকে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। শাম অঞ্চলে এর আগে-পরে এরূপ সমৃদ্ধ হাসপাতাল কখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এতিমদের লেখাপড়া ও সুশিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য তিনি এতিমদের শিক্ষকদের জন্য প্রচুর সম্পদ ওয়াকফ করেন এবং তাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেন।

মক্কা-মদিনার প্রতিবেশীদের জন্যও তিনি প্রচুর সম্পদ ওয়াকফ করেন। বিধবা নারী ও অসহায় নাগরিকদের ভরণপোষণসহ যাবতীয় কল্যাণমূলক কাজে ব্যয়ের জন্য তিনি বিস্তৃত সম্পদ ওয়াকফ করেছিলেন।

এ সময় জামে দামেশক বিরানপ্রায় পড়ে ছিল। সুলতান নুরুদ্দিন কাজি কামালুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ শাহরাজুরি মুসিলিকে জামে দামেশকের মুতাওয়াল্লি ও দামেশকের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করেন। তিনি জামে দামেশকের সংস্কার করেন এবং চারটি হলকক্ষের[৮৬] সবগুলো উন্মুক্ত করে দেন। ৪৬১ হিজরিতে জামে দামেশকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর থেকে অর্জিত সকল অর্থ সেখানেই ছিল। তিনি জামে দামেশকের জন্য সুনির্দিষ্ট ওয়াকফ সম্পদসমূহের পাশাপাশি অজ্ঞাত ওয়াকফকারীদের সম্পদও পরিবর্ধন করে দেন। এসব সম্পদকে এক বিধানের আওতায় নিয়ে আসা হয় এবং এর নামকরণ করা হয় 'জনকল্যাণ সম্পদ'। দামেশকের অসহায়, দরিদ্র, বিধবা ও এতিম নাগরিকদের জন্য সেখান থেকে ভাতা চালু করে দেওয়া হয়।

নুরুদ্দিন রহিমাহুল্লাহ সুন্দর হস্তলিপির অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রচুর দ্বীনি কিতাবাদি অধ্যয়ন করতেন, নববি নির্দেশনাবলি অনুসরণ করতেন। তিনি জামাতে নামাজ আদায়ে যত্নবান ছিলেন। তিনি অধিক পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করতেন, কল্যাণমূলক কাজ ভালোবাসতেন।

---

৮৬. জামে দামেশকের সুবিস্তৃত অংশে চারটি প্রশস্ত হলকক্ষ রয়েছে। খোলাফায়ে রাশিদিনের চার মহান সদস্যের নামে হলগুলোর নামকরণ করা হয়। বিভিন্ন যুগে হলকক্ষগুলো বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে আবু বকর রাযি. মিলনায়তনটি মসজিদের জাদুঘর হিসেবে, উমর রাযি. মিলনায়তনটি মসজিদের প্রশাসনিক দপ্তর হিসেবে এবং উসমান রাযি. মিলনায়তনটি বিশেষ অতিথিদের অভ্যর্থনাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর আলি রাযি. মিলনায়তনটিতে হজরত হুসাইন রাযি.-এর মাজার আছে। শেষোক্ত হলকক্ষটি বর্তমানে হুসাইন মিলনায়তন নামে অধিক প্রসিদ্ধ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ঐতিহাসিকভাবে দামেশকের জামে উমাবিতে হজরত হুসাইন রাযি.-এর মাজার থাকা প্রমাণিত নয়। হজরত হুসাইন রাযি.-এর মাজার সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। সুনিশ্চিতভাবে কোনো স্থানেই তার মাজার প্রমাণিত নয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর অনেক আলিমের মতে হুসাইন রাযি.-এর কর্তিত মস্তক মদিনায় জান্নাতুল বাকিতে ফাতিমা রাযি.-এর কবরের পাশে দাফন করা হয়। অপরদিকে শিয়াদের প্রসিদ্ধ বিশ্বাসমতে তাকে কারবালাতেই দাফন করা হয়।

সুলতান নুরুদ্দিন মিতাহারী ও সংযমী ছিলেন। নিজের ও পরিবারের পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন। এমনকি কথিত আছে যে, তার শাসনামলের সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তির খরচও তার চেয়ে বেশি ছিল। তিনি সম্পদ সঞ্চয় করতেন না, পার্থিব চাহিদাকে প্রাধান্য দিতেন না। স্বাভাবিক ও রাগান্বিত—কোনো অবস্থায়ই তার মুখ থেকে কোনো অশ্লীল বা অশোভনীয় উচ্চারণ শোনা যায়নি। তিনি গম্ভীর ও মৌনতাপ্রিয় ছিলেন। ইবনুল আছির বলেন, 'উমর ইবনে আবদুল আজিজের পর নুরুদ্দিনের চেয়ে অধিক ন্যায়পরায়ণ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট অন্য কেউ ছিল না।'

তিনি গনিমত সম্পদ হতে প্রাপ্ত ব্যক্তিগত অংশের অর্থ দিয়ে হিমসে কয়েকটি দোকান ক্রয় করেছিলেন। দোকানগুলোর আয় দিয়েই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। স্ত্রীর ভরণপোষণের খরচও সেখান থেকেই দিতেন, অবশ্য স্ত্রীকে কিছুটা বেশি দিতেন। বাইতুল মাল ও রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তার কতটুকু অর্থ গ্রহণ করা বৈধ হবে—এ বিষয়ে তিনি উলামায়ে কেরামের কাছে ফতোয়া চেয়েছিলেন। উলামায়ে কেরাম যে পরিমাণের কথা উল্লেখ করেন, তিনি ক্ষুধায় মৃত্যুর উপক্রম হলেও তার চেয়ে বেশি গ্রহণ করতেন না।

সুলতান নুরুদ্দিন প্রচুর পোলো খেলতেন। জনৈক বুজুর্গ তাকে এ বিষয়ে তিরস্কার করলে তিনি উত্তর দেন, 'নিঃসন্দেহে প্রত্যেক কাজের ভালো-মন্দ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আমার এই খেলার উদ্দেশ্য হলো ঘোড়াকে আক্রমণ করেই পিছু হটার (Hit-and-Run) কৌশল শিক্ষা দেওয়া ও অনুশীলন করানো। কারণ, আমরা তো কখনোই জিহাদ পরিত্যাগ করব না।'

তিনি রেশমি কাপড় পরিধান করতেন না, তরবারি ও বর্শার মাধ্যমে নিজ হাতে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

একদিন তিনি তার জনৈক সঙ্গীকে নিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করে কোথাও যাচ্ছিলেন। সূর্য ছিল তাদের পেছনে, ছায়া ছিল সামনে। তারা দ্রুত ছুটেও ছায়ার নাগাল পাচ্ছিলেন না। ফিরতি পথে ছায়া পেছনে চলে যায় (কারণ, সূর্যের অবস্থান তখন সামনে)। নুরুদ্দিন তার ঘোড়াকে খুব দ্রুতগতিতে পরিচালিত করেন, ছায়াও দ্রুত পিছু পিছু চলতে থাকে!

তখন তিনি তার সঙ্গীকে বলেন, 'জানো, আমাদের এই পরিস্থিতির সঙ্গে কীসের তুলনা হতে পারে? আমি একে তুলনা করছি দুনিয়ার সঙ্গে। যে দুনিয়ার নাগাল পেতে পিছু ছুটে বেড়ায়, দুনিয়া তার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়। আর যে দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে পালাতে চায়, দুনিয়া তার পিছু ছুটতে থাকে।' এই হাকিকত ও অকাট্য বাস্তবতাই ফুটে উঠেছে জনৈক কবির নিম্নোক্ত কাব্যপঙ্ক্তিতে—

مَثَلُ الـرِّزْقِ الَّـذِيْ تَـطْلُبُه ❋ مَثَلُ الظِّلِّ الَّذِيْ يَمْشِيْ مَعَكَ

أَنْتَ لَا تُدْرِكُـه مُسْتَعْجِـلًا ❋ فَـإِذَا وَلَّـيْـتَ عَـنْـهُ تَـبِعَـكَ

যে জীবন-জীবিকার খোঁজে তুমি হয়রান-পেরেশান, দৃষ্টান্ত তার সঙ্গে তোমার ওই ছায়া চলমান।

হাজারো চেষ্টায় বৃথা প্রচেষ্টায় পাবে নাকো তার নাগাল, নাও ফিরিয়ে দৃষ্টি তোমার, হবে সে তোমার কাঙাল।

সুলতান নুরুদ্দিন হানাফি মাজহাবের ফকিহ ছিলেন। তিনি হাদিসের শিক্ষাগ্রহণ করেছেন, হাদিস রেওয়ায়েতও করেছেন। হাদিস শ্রবণ করেছেন এবং শুনিয়েছেন। রাতভর প্রচুর নামাজ পড়তেন, সাহরির সময় হতে দিবসে ঘোড়ায় আরোহণের পূর্ব পর্যন্ত সময় নামাজে কাটিয়ে দিতেন। কবির ভাষায়—

جَمَعَ الشَّجَاعَةَ وَالْخُشُوعَ لَدَيْهِ ❋ مَا أَحْسَنَ الشُّجْعَانَ فِي الْمَحَارِبِ

তার মাঝে দেখি অবাক সমাবেশ বীরত্ব ও খোদাভীতির, মিম্বরে শুনি খতিব-কণ্ঠে—চির উন্নত মম শির!

তার সহধর্মিণী (দামেশকের আতাবিক মুইনুদ্দিনের কন্যা) ইসমাতুদ্দিন খাতুনও তার ন্যায় অধিক ইবাদতগোজার ছিলেন। তিনিও রাত্রিকালে অধিক ইবাদত করতেন। একরাতে ঘুম থেকে জাগতে না পারায় তার নির্ধারিত অজিফা ছুটে যায়। সকালে তিনি খুব বিষণ্ন হয়ে পড়েন। সুলতান নুরুদ্দিন স্ত্রীকে বিষণ্নতার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান যে, গত রাতে ঘুমের কারণে তিনি আপন অজিফা আদায় করতে পারেননি। তখন নুরুদ্দিন তার দুর্গে যারা শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করতে চায়, তাদের জাগ্রত হওয়ার সুবিধার্থে প্রতিদিন সাহরির ওয়াক্তে দামামা

বাজানোর নির্দেশ দেন। তিনি দামামা-বাদককে এর বিনিময়ে প্রচুর হাদিয়া-তোহফা প্রদান করেন। কবি যেন এমন মহান ব্যক্তিদের সম্পর্কেই বলেছেন—

> فَأَلْبَسَ اللهُ هَاتِيْكَ الْعِظَامَ وَإِنْ ❋ بَلِيْنَ تَحْتَ الثَّرَى عَفْوًاوَغُفْرَانًا
>
> سَقَى ثَرًى أُوْدِعُوْهُ رَحْمَةً مَلَأَتْ ❋ مَثْوَى قُبُورِهِم رَوْحًا وَرَيْحَانًا

> কবর-দেশের ছোঁয়ায় যদিও হয়ে পড়েছে জীর্ণ-শীর্ণ, আল্লাহ সেই অস্থি-মজ্জাকেই পরিয়ে দিয়েছেন ক্ষমা ও মার্জনার পোশাক!
>
> আল্লাহ তাদের সমাধিকে রহমতে সিক্ত করুন, দান করুন আনন্দ ও সুবাস।

ইবনুল আছির উল্লেখ করেন, একদিন নুরুদ্দিন পোলো খেলছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, জনৈক ব্যক্তি মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে কারও সঙ্গে কথা বলছে এবং তার দিকে ইঙ্গিত করছে। তখন নুরুদ্দিন তার প্রহরীকে লোকটির কাছে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানার জন্য পাঠালেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, লোকটি একজন মধ্যস্থতাকারীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। সে দাবি করছে যে, নুরুদ্দিনের কাছে তার কিছু পাওনা আছে এবং পাওনা আদায়ের জন্য সে বিচারকের শরণাপন্ন হতে চায়। প্রহরী ফিরে এসে নুরুদ্দিনকে এ কথা জানালে তিনি তার হাতের পোলো খেলার মুগুর (Mallet) রেখে দিয়ে তৎক্ষণাৎ অভিযোগকারীকে সঙ্গে নিয়ে কাজি শাহরাজুরির উদ্দেশে পায়ে হেঁটে রওনা হন। পাশাপাশি তিনি দূত মারফত আগেই কাজি সাহেবের কাছে সংবাদ পাঠান যে, তার সঙ্গে যেন অন্যান্য বাদী-বিবাদীর মতোই আচরণ করা হয়। উভয়ে কাজির দরবারে পৌঁছলে নুরুদ্দিন বাদীকে সঙ্গে নিয়ে কাজির সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। অবশেষে সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ ও তর্কবিতর্ক শেষ হয়। বিচারকের যাচাইয়ে নুরুদ্দিনের কাছে লোকটির কোনো পাওনা প্রমাণিত হওয়া দূরে থাক, উল্টো লোকটির কাছে সুলতান নুরুদ্দিনের পাওনা প্রমাণিত হয়। পুরো বিচার-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর সুলতান নুরুদ্দিন বলেন, 'আমি তার সঙ্গে এ জন্যই বিচারকের দরবারে উপস্থিত হয়েছি, যেন কাউকে শরিয়তের বিধানের প্রতি আহ্বান করা হলে সে অনুপস্থিত না থাকতে পারে। আমরা যারা প্রশাসনের ছোট-বড় যেকোনো দায়িত্ব পালন করছি, সকলেই প্রিয়

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার শরিয়তের খাদিম ও প্রহরী। সুতরাং আমরা নবীজির নির্দেশনা এবং দ্বীন ও শরিয়তের দাবির সামনে অনুগত শিরে দণ্ডায়মান হব। নবীজি যা করতে আদেশ করেছেন, আমরা তা মান্য করব; যা করতে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকব। আমি ভালো করেই জানি যে, এই লোকটির আমার কাছে কোনো পাওনা নেই। তা সত্ত্বেও আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, সে যা দাবি করেছে, আমি তাকে তা দিয়ে দিলাম এবং হাদিয়া হিসেবে দিলাম।'

ইবনুল আছির বলেন, নুরুদ্দিনই প্রথম শাসক, যিনি 'দারুল আদল' (ন্যায়বিচার কক্ষ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সপ্তাহে দু-বার, মতান্তরে চারবার বা পাঁচবার তার বিচারকক্ষে বসতেন। মজলিসে বিচারক ও সকল মাজহাবের আলিম ও ফকিহগণ উপস্থিত থাকতেন। সেদিন বিচারকক্ষের দ্বারে কোনো প্রহরী থাকত না। সবল-দুর্বল নির্বিশেষে সকলে সেখানে উপস্থিত হতে পারত। তিনি নিজে মানুষের সঙ্গে কথা বলতেন, জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। তিনি অন্যায়-অত্যাচারের মূলোৎপাটন করতেন এবং অত্যাচারীর কাছ থেকে অত্যাচারিতের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতেন। এর কারণ হলো, সুলতান নুরুদ্দিনের কাছে সেনাপতি আসাদুদ্দিন শিরকুহের যথেষ্ট মূল্যায়ন ছিল। তিনি সুলতানের এত বেশি আস্থাভাজন ছিলেন যে, মনে হতো—তিনিও নুরুদ্দিনের ক্ষমতার অংশীদার! রাষ্ট্রের মহান সেনাপতি হিসেবে শিরকুহ প্রচুর সম্পদ, জায়গির ভূমি ও শস্যক্ষেত্রের মালিক ছিলেন। তার প্রতিনিধিরা সেগুলোর দেখাশোনা করত এবং কখনো কখনো জায়গিরভূমির প্রতিবেশীদের ওপর জুলুম করে ফেলত। কোনো সেনাপতি বা আমির কারও প্রতি জুলুম করলে কাজি কামালুদ্দিন শাহরাজুরি তাকে ছাড় দিতেন না; বরং ন্যায়বিচার করতেন। তবে আসাদুদ্দিন শিরকুহের ওপর তিনি কখনো প্রভাব খাটাতেন না। নুরুদ্দিন যখন দারুল আদল প্রতিষ্ঠা করেন, তখন আসাদুদ্দিন তার প্রতিনিধিদের কাছে গিয়ে বলেন, 'আমার সম্পদের যত বড় ক্ষতিই হোক না কেন, তোমরা কারও সঙ্গে এমন কোনো আচরণ করবে না, যার কারণে সে জুলুমের দাবি করতে পারে। কারণ, নুরুদ্দিনের কাছে অত্যাচারী বিবেচিত হওয়ার চেয়ে বা সাধারণ কোনো প্রজার সঙ্গে বিবাদী হিসেবে নুরুদ্দিনের সামনে দাঁড়ানোর চেয়ে আমার সম্পদ নষ্ট হওয়া আমার কাছে শতগুণ প্রিয়।' তখন থেকে তার প্রতিনিধিরা কর্মক্ষেত্রে

অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে থাকে। নুরুদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ করেন যে, দারুল আদলে কেউ আসাদুদ্দিনের নামে অভিযোগ জানাতে আসে না। তিনি কাজি কামালুদ্দিন শাহরাজুরিকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে পুরো বিষয়টি অবগত করেন। সবকিছু জেনে নুরুদ্দিন কৃতজ্ঞতায় সিজদাবনত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমার সঙ্গীদেরকে নিজ থেকে ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী বানিয়েছেন।'

সুলতান নুরুদ্দিনের বীরত্ব ও সাহসিকতা সম্পর্কে বলা হয়, তার চেয়ে অধিক দুঃসাহসী ও অশ্বপৃষ্ঠে অবিচল কোনো অশ্বারোহী পাওয়া যায় না। তিনি পোলো খেলায় দক্ষ ছিলেন। অনেক সময় তিনি মুগুরের আঘাতে বল ছুড়ে মারতেন, তারপর দ্রুত বলের পেছনে ছুটে শূন্য থেকেই বলটি ধরে ফেলতেন। এরপর ছুড়ে মারতেন ময়দানের অপর প্রান্তে। বলে আঘাত করার সময় কখনো তার হাতের মুগুর মাথার ওপর উঠত না। খেলার প্রতি তুচ্ছতা প্রদর্শনের জন্য তিনি হাতের মুগুর জামার আস্তিন দিয়ে ঢেকে রাখতেন। তাই তার হাতে মুগুরও দৃশ্যমান হতো না। যুদ্ধের ময়দানে তিনি ছিলেন অটল-অবিচল-প্রত্যয়ী ও দুঃসাহসী এক বীর যোদ্ধা। বীরত্বের উপমা হিসেবে তার নাম উল্লেখ করা হতো। তিনি বলতেন, 'আমি একাধিকবার শাহাদাতের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম, কিন্তু শাহাদাত-সৌভাগ্য নসিব হয়নি। যদি আমার মাঝে কোনো কল্যাণ-গুণ থাকত এবং আল্লাহ তাআলার কাছে আমার সামান্য মূল্যও থাকত, তাহলে তিনি অবশ্যই আমাকে শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করতেন। অবশ্য আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।'

কুতুবুদ্দিন নিশাপুরি একদিন তাকে বললেন, 'হে আমাদের মহান মনিব সুলতান! আল্লাহর শপথ করে বলছি—নিজেকে কখনো ঝুঁকির মুখে ফেলবেন না। আপনি নিহত হলে তো পুরো জাতিই ধ্বংসের শিকার হবে, রাষ্ট্র বেদখল হয়ে যাবে এবং মুসলমানরা অসহায় হয়ে যাবে।' তার কথা শুনে নুরুদ্দিন উত্তর দিলেন, 'কুতুবুদ্দিন! চুপ করো; আল্লাহ তাআলার শানে গোস্তাখি করছ! আরে! মাহমুদ কে? আমার জন্মের পূর্বে আল্লাহর দ্বীন ও মুসলমানদের ভূখণ্ড কে রক্ষা করত? এক ও অদ্বিতীয় উপাস্য আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কেউ? বলো, মাহমুদ কে?' (বর্ণনাকারী বলেন,) তার কথা শুনে উপস্থিত সবাই কাঁদতে লাগল।

এক যুদ্ধে তিনি জনৈক খ্রিষ্টান রাজাকে বন্দি করেন। এরপর তিনি তার উপদেষ্টাপর্ষদ ও সেনাপতিদের কাছে পরামর্শ চান যে, তাকে কি হত্যা করা হবে, না মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে? করণীয় নির্ধারণে সেনাপতিগণ মতানৈক্যে জড়িয়ে পড়ে। অবশ্য শেষপর্যন্ত নুরুদ্দিন তাকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয় মনে করেন। তিনি বন্দি রাজার জনৈক অনুচরকে তার রাজ্যে পাঠিয়ে মুক্তিপণ নিয়ে আসতে বলেন। সে খুব শীঘ্রই মুক্তিপণ নিয়ে ফিরলে নুরুদ্দিন রাজাকে মুক্ত করে দেন। সেই খ্রিষ্টান রাজা আপন রাজ্যে পৌঁছেই মৃত্যুবরণ করেন। এতে নুরুদ্দিন ও তার সঙ্গীরা অত্যন্ত বিস্মিত হন। নুরুদ্দিন মুক্তিপণের অর্থ দিয়ে দামেশকের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।[৮৭] পুরো রাজ্যে এ হাসপাতালের

---

৮৭. সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি রহ. ৫৪৮ হিজরি সনে (১১৫৪ খ্রিষ্টাব্দে) জামে দামেশকের পশ্চিমে হারিকা (Al-Hariqa) এলাকায় তেরোশ শয্যাধারণে সক্ষম হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমদিকে হাসপাতালটি দরিদ্র-অসহায়দের জন্য একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও অল্পদিনের মধ্যেই ইসলামি বিশ্বের অন্যতম প্রসিদ্ধ চিকিৎসাকেন্দ্র, মেডিকেল কলেজ ও ফার্মাসি গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠাতা নুরুদ্দিন রহ.-এর প্রতি সম্বন্ধ করে হাসপাতালটি البيمارستان النوري (আন-নুরি হাসপাতাল) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইবনে সিনা ও যাহরাবির ন্যায় জগদ্বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ এখানে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। ইবনুন নাফিস ও ইবনে আবি উসায়বার ন্যায় খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ এখানে শিক্ষাগ্রহণের পাশাপাশি অধ্যাপনা করেছেন। ইবনে আবুল হাকাম নামে খ্যাত মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ আল-বাহিলি (মৃত্যু : ৫৭০ হিজরি/ ১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন হাসপাতালটির প্রথম চিকিৎসক।

ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে আন-নুরি হাসপাতাল যেমন সংস্কার-পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণে সমৃদ্ধ হয়, তেমনই একবার তাতারি শাসক তৈমুর লং কর্তৃক ধ্বংসযজ্ঞেরও শিকার হয়। উসমানি খিলাফতের শেষদিকে দামেশকের নতুন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হলে আন-নুরি হাসপাতালের চিকিৎসকরা সেখানে চলে যায় এবং হাসপাতালটি অনেকটা বন্ধ হয়ে যায়। ১৩১৮ হিজরি সনে উসমানি খলিফা ২য় আবদুল হামিদের শাসনামলে আন-নুরি হাসপাতাল কমপ্লেক্স বালিকা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। এরপর ১৩৫৮ হিজরিতে একে বাণিজ্যিক বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়। সবশেষে ১৩৯৬ হিজরি সনে একে চিকিৎসা ও বিজ্ঞান জাদুঘরে পরিণত করা হয়। আন-নুরি হাসপাতাল ভবনকে দামেশকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থাপত্য বিবেচনা করা হয়।

হাসপাতালটির প্রধান পরিচালকের উদ্দেশে লিখিত অসিয়তনামায় অন্যান্য নির্দেশনার সঙ্গে নিম্নোক্ত নির্দেশনাও উল্লেখ ছিল—

> প্রধান পরিচালক যেন হাসপাতালের প্রশাসনিক দায়িত্বশীল ও সেবকদেরকে অসুস্থ-পীড়িত ব্যক্তিদের সুন্দর সেবাদানে উদ্বুদ্ধ করেন, রোগীদের সঙ্গে কঠোর আচরণের পরিবর্তে কোমল স্বরে কথা বলার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।=

সঙ্গে তুল্য কোনো হাসপাতাল ছিল না। হাসপাতালটি কেবল দরিদ্র ও অসহায় নাগরিকদের জন্য নির্ধারিত ছিল। অবশ্য দুর্লভ কোনো ওষুধ যদি সেখানে ছাড়া অন্য কোথাও না পাওয়া যেত, তাহলে ধনীরাও সেখানে চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারত। তা ছাড়া ধনী-দরিদ্র যে কেউ যখনই হাসপাতালে উপস্থিত হতো, তাকে হাসপাতালের বিশেষ (শক্তিবর্ধক ও রোগপ্রতিরোধক) পানীয় পান করানো হতো। স্বয়ং নুরুদ্দিন রহ.-ও হাসপাতালে এসে উক্ত পানীয় সেবন করেছেন।[৮৮]

(ইবনে কাছির রহ. বলেন,) অনেক বলে—হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এর প্রজ্বলিত অগ্নি কখনো নির্বাপিত হয়নি। বাস্তব বিষয়ে আল্লাহই অবগত আছেন।

সুলতান নুরুদ্দিন বিভিন্ন সড়ক ও পথের পাশে অনেক ছাউনি ও সরাইখানা নির্মাণ করেন। তিনি দুর্গম ও ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলোতে নিরাপত্তারক্ষী নিয়োজিত করেন এবং তাদের কাছ থেকে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে পাওয়ার জন্য বার্তাবাহী কবুতরের ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রচুর খানকাও প্রতিষ্ঠা করেন।

> =হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকে যেন মনে রাখে যে, অদৃশ্য হতে সেই মহান সত্তা তাদের প্রতিটি আচরণ-উচ্চারণ পর্যবেক্ষণ করছেন, যিনি তাদের প্রতিটি অবহেলার হিসাব নেবেন।

বলাই বাহুল্য, প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই এ নির্দেশনা যথাযথভাবে পালিত হয়েছিল। আন্দালুসের বিখ্যাত সাহিত্যিক, ভূগোলবিশারদ ও পরিব্রাজক ইবনে জুবায়র (৫৪০-৬১৪ হি./১১৪৫-১২১৭ খ্রি.) আন-নুরি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার বছর-ত্রিশ পর ৫৮০ হিজরি সনে (১১৮৪ খ্রিষ্টাব্দে) দামেশক ভ্রমণের সময় হাসপাতালটি পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন—

> হাসপাতালের পরিচালকদের হাতে রেজিস্টার ছিল। তাতে সকল রোগীর নাম লেখা ছিল এবং প্রত্যেকের নামের পাশে তার কী ওষুধপথ্য ও খাবারদাবার প্রয়োজন, তা-ও উল্লেখ ছিল। চিকিৎসকগণ প্রতিদিন সকালে আসেন, রোগীদের খোঁজখবর নেন এবং প্রত্যেক রোগীর জন্য তার উপযোগী ওষুধপত্র ও খাবারদাবারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। হাসপাতালটিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ উন্মাদ রোগীদের জন্যও আলাদা চিকিৎসাব্যবস্থা আছে।

৮৮. সুলতান নুরুদ্দিন তখন বলেন, 'এ পানীয় আমার জন্য এবং সকল মুসলমানের জন্য হালাল।' অর্থাৎ তিনি হাসপাতালটি কেবল দরিদ্রদের জন্য ওয়াকফ করলেও উক্ত পানীয়সহ যেসব ওষুধ রাষ্ট্রের অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, সেগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত রেখেছিলেন।

সুলতান নুরুদ্দিন তার কাছে ফুকাহায়ে কেরাম, উলামা-মাশায়েখ ও সুফি-বুজুর্গদের সমবেত করতেন এবং তাদের সম্মান করতেন। তিনি সৎ লোকদের ভালোবাসতেন। একবার কুতুবউদ্দিন নিশাপুরি নামক তার এক সেনাপতি তার কাছে জনৈক আলিমের বিষয়ে অভিযোগ করলে নুরুদ্দিন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বলেন, 'ধিক তোমাকে! তোমার অভিযোগ যদি সত্যিও হয়, তারপরও তার এত অধিক পরিমাণ নেক আমল আছে, যা তার উক্ত অপরাধ মোচন করে দেবে। তোমার অভিযোগ যদি সত্যিও হয়, তারপরও (একজন আলিমের প্রতি অভিযোগ আনায়) তোমার যে অপরাধ হয়েছে, তার কাফফারা হওয়ার মতো নেক আমল তোমার নেই। অধিকন্তু আল্লাহর শপথ! আমি তোমার অভিযোগ সত্যায়নই করছি না। তুমি যদি ভবিষ্যতে কখনো আমার কাছে তার বিষয়ে বা অন্য কারও বিষয়ে অভিযোগ করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে শাস্তি দেবো।' এরপর কুতুবুদ্দিন নিশাপুরি কখনো আর এরূপ অভিযোগ করেননি।

তিনি হাদিসে নববির পাঠদানের জন্য দামেশকে একটি দারুল হাদিস প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনুল আছিরের ভাষ্যমতে তিনিই প্রথম দারুল হাদিস (নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) প্রতিষ্ঠা করেন।[৮৯]

সুলতান নুরুদ্দিন অত্যন্ত গম্ভীর ও প্রতাপসম্পন্ন ছিলেন। প্রশাসক ও সেনাপতিদের অন্তরে তার ব্যক্তিত্বের প্রবল ভীতি ও প্রতাপ কাজ করত। তার অনুমতি ব্যতীত কেউ তার সামনে বসার সাহস করত না। আমির

---

৮৯. প্রতিষ্ঠাতা সুলতান নুরুদ্দিন রহ.-এর প্রতি সম্বন্ধ করে দারুল হাদিসটি 'দারুল হাদিস আন-নুরিয়া' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সুলতান নুরুদ্দিন সে যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেজ ইবনে আসাকির রহ.-কে উক্ত দারুল হাদিসের প্রথম শায়খুল হাদিস নির্বাচিত করেছিলেন এবং দারুল হাদিস ও তার শিক্ষার্থীদের জন্য প্রচুর সম্পদ ওয়াকফ করেছিলেন। অনেক সময় স্বয়ং সুলতান ইবনে আসাকিরের হাদিসের দরসে শরিক হতেন। কথিত আছে, হাফেজ ইবনে আসাকির তার সুবিখ্যাত ও সুবিশাল ইতিহাসগ্রন্থ 'তারিখে দামেশক' এই দারুল হাদিসে বসেই সংকলন করেন। হাফেজ ইযযুদ্দিন বিন আবদুস সালাম, ইমাম যাহাবি ও বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল আছিরের ন্যায় খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ এখান থেকে হাদিসের পাঠ গ্রহণ করেছেন। আল্লামা নববি রহ.-এর প্রসিদ্ধ শাগরিদ আলাউদ্দিন ইবনুল আত্তার এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও হাফেজে হাদিস আল্লামা আলামুদ্দিন বিরযালি এখানে শায়খুল হাদিসের দায়িত্ব পালন করেছেন। আরেক প্রসিদ্ধ আলিম ও ঐতিহাসিক ইবনে কাছির রহ. দারুল হাদিস আন-নুরিয়ার তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। এমন হাজারও প্রথিতযশা মনীষীর স্মৃতিধন্য দারুল হাদিস আন-নুরিয়া বর্তমানে বিরান পড়ে আছে।

নাজমুদ্দিন আইয়ুব ব্যতীত অন্য কেউ অনুমতি ছাড়া তার সামনে বসত না। সেনাপতি আসাদুদ্দিন শিরকুহ, আলেপ্পোর নায়েব (প্রশাসক) মাজদুদ্দিন বিন দায়ার ন্যায় রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ও জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তিবর্গও তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকত। কিন্তু কোনো আলিম বা ফকিহ আগমন করলে নুরুদ্দিন তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং কয়েক কদম এগিয়ে আসতেন; এরপর তাকে প্রশান্তি ও ধীরস্থিরতার সঙ্গে নিজের সঙ্গে গালিচায় বসাতেন। কোনো আলিমকে প্রচুর পরিমাণ হাদিয়া প্রদান করার পর তিনি বলতেন, 'তারা হচ্ছেন আল্লাহর সৈনিক। তাদের দোয়ার বরকতেই আমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করি। আমি যে হাদিয়া প্রদান করি, তার চেয়ে বাইতুল মালে অনেক গুণ বেশি অধিকার তাদের আছে। সুতরাং, তারা যদি তাদের অধিকারের এই যৎসামান্য প্রাপ্তিতেই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাহলে তো আমাদের প্রতি তাদের অপার অনুগ্রহ।'

একবার তার সম্মুখে একটি হাদিস পাঠ করা হয়, যাতে উল্লেখ ছিল—'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তরবারি গলায় ঝুলিয়ে বের হলেন।' হাদিসটি শ্রবণ করে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কী আমল প্রমাণিত আর আজ মানুষের রীতি কেমন বদলে গেছে! এখন সেনাপতি ও সাধারণ সৈন্য সকলে নবীজির সুন্নাত বাদ দিয়ে কোমরে তরবারি ঝুলিয়ে বের হয়।'

এরপর তিনি তার সৈন্যদের তখন থেকে তরবারি গলায় ঝুলিয়ে বের হওয়ার নির্দেশ দেন। পরবর্তী দিন তিনি নিজে ও পুরো সেনাবাহিনী গলায় তরবারি ঝুলিয়ে শোভাযাত্রায় বের হন। এভাবেই তিনি প্রিয় নবীজির আনুগত্যে সচেষ্ট ছিলেন। আল্লাহ তার প্রতি দয়ার আচরণ করুন।

একদিন তার উজির কবি মুওয়াফফাকুদ্দিন খালিদ বিন মুহাম্মাদ বিন নাসর কায়সারানি তাকে জানান যে, তিনি স্বপ্নে নিজেকে নুরুদ্দিনের পরিধেয় বস্ত্র ধৌতরত অবস্থায় দেখেছেন। এ কথা শোনামাত্র সুলতান নুরুদ্দিন তাকে পুরো রাষ্ট্র থেকে যাবতীয় কর রহিত করার প্রজ্ঞাপন জারি করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'এটাই হচ্ছে তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা।' এরপর তিনি জনসাধারণের কাছে বার্তা পাঠিয়ে ইতিপূর্বে তাদের কাছ থেকে গ্রহণকৃত করের ব্যাপারে তাকে দায়মুক্ত করে দেওয়ার অনুরোধ করেন। তিনি তাদেরকে জানান, পূর্বে গ্রহণকৃত যাবতীয় অর্থ ব্যয় করা হয়েছে আপনাদের শত্রু বিধর্মীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবং আপনাদের রাজ্য ও

পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তা রক্ষায়। তিনি তার রাজ্যের সকল অঞ্চলে উক্ত বার্তা প্রেরণ করেন। সুলতান সরকারি ঘোষক ও দ্বীনি নসিহতকারীদের নির্দেশ দেন যে, তারা যেন কেবল ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কর-গ্রহণের বৈধতা ঘোষণা করে। তিনি সিজদাবনত হয়ে দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ, আপনি উশর উসুলকারী ও কর আদায়কারী অত্যাচারী কুকুর মাহমুদের প্রতি দয়া করুন।'

কথিত আছে, সুলতান নুরুদ্দিন কর খাতে অর্জিত অর্থ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করায় বুরহানুদ্দিন বলখি আপত্তি প্রকাশ করেন। একবার তিনি সুলতান নুরুদ্দিনকে বলেন, 'আপনার বাহিনীতে ঢোল-দামামা ও পানীয়ের প্রচলন আছে। এরপরও কীভাবে আপনারা নুসরত ও বিজয় লাভের আশা করেন?'

সুলতান নুরুদ্দিনের রাজ্য থেকে কর রহিত করে দেওয়ার কারণ সম্পর্কে আরেকটি ঘটনা বর্ণিত আছে। তার আমলের একজন বিখ্যাত বুজুর্গ ছিলেন আবু উসমান মুনতাখাব বিন আবু মুহাম্মাদ ওয়াসিতি। তার কোনো সম্পদ ছিল না; তিনি কারও কাছ থেকে কিছু গ্রহণও করতেন না। তার শুধু একটি জুব্বা ছিল। ওয়াজের মজলিসের উদ্দেশে বের হওয়ার সময় তিনি তা পরিধান করতেন। তার নসিহতের মজলিসে হাজার হাজার লোক সমবেত হতো। তিনি একবার সুলতান নুরুদ্দিনকে কয়েকটি কাব্যপঙ্ক্তি শোনান। পঙ্ক্তিগুলোতে তার রাজ্যের বিভিন্ন অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে এবং সুলতানকে কঠিনভাবে ভীতি প্রদর্শন ও সতর্ক করা হয়েছে। পঙ্ক্তিগুলো হলো—

مَـثِّـلْ وُقُـوْفَـكَ أَيُّهَـا الْمَغْـرُورُ ❋ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَـاءُ تَمُـوْرُ

إِنْ قِيلَ نُورُ الدِّيْنِ رُحْتَ مُسْلِمًا ❋ فَاحْذَرْ بِأَنْ تَبْقَى وَمَا لَكَ نُوْرٌ

ওহে প্রবঞ্চিত! কিয়ামত দিবসে আকাশ যখন আন্দোলিত হবে,

ভেবেছ কি তখন বিচার-দরবারে কীভাবে দাঁড়িয়ে রবে?!

যদি বলা হয়—নুরুদ্দিন! তুমি তো মুসলমান অবস্থায় মারা গেছ;
সাবধান! থাকবে না নুর, তোমাকে সেদিন জাগতে হবে।

أَنُهِيْتَ عَنْ شُرْبِ الْخُمُوْرِ وَأَنْتَ فِيْ ❋ كَأْسِ الْمَظَالِمِ طَائِشٌ مَخْمُوْرٌ

عَطَّلْتَ كَاسَاتِ الْمُدَامِ تَعَفُّفًا ❋ وَعَلَيْكَ كَاسَاتُ الْحَرَامِ تَدُوْرُ

পরের তরে হারাম করেছ মদের আসর; নিজেই বেহুঁশ জুলুম নেশায় তন্দ্রা বিভোর!

সেজেছ সাধু, সুরার পেয়ালা ফেলেছ ছুড়ে; অথচ হাজার হারাম পাত্র চারিপাশে ঘোরে!

مَاذَا تَقُوْلُ إِذَا نُقِلْتَ إِلَى الْبِلٰى ❋ فَرْدًا وَجَاءَكَ مُنْكَرٌ وَنَكِيْرٌ؟

مَاذَا تَقُوْلُ إِذَا وَقَفْتَ بِمَوْقِفٍ ❋ فَرْدًا ذَلِيْلًا وَالْحِسَابُ عَسِيْرٌ؟

থাকবে যখন একাকী কবরে ভেবেছ কি? মুনকার-নাকিরের প্রশ্নবানে বলবে কী?

বিচারের দিন হয়ে হীনবল কী দেবে জবাব? ভয়াবহ দিন, হিসাবও তো বড় কঠিন হিসাব!

وَتَعَلَّقَتْ فِيْكَ الْخُصُوْمُ وَأَنْتَ فِيْ ❋ يَوْمِ الْحِسَابِ مُسَلْسَلٌ مَجْرُوْرٌ

وَتَفَرَّقَتْ عَنْكَ الْجُنُوْدُ وَأَنْتَ فِيْ ❋ ضِيْقِ الْقُبُوْرِ مُوَسَّدٌ مَقْبُوْرٌ

হাতে-পায়ে বেঁধে শেকল-বেড়ি টানবে তোমায় নরক পানে, তখনো শত্রু পেছনে তোমার থাকবে লেগে পাওনা টানে।

এত জনবল, সৈন্যসকল তোমায় যাবে একলা ফেলে, একাকী থাকবে শুয়ে চোখের জলে বিঘত সাতেক মাটির কোলে।

وَوَدِدْتَ أَنَّكَ مَا وَلِيْتَ وِلَايَةً ❋ يَوْمًا وَلَا قَالَ الْأَنَامُ أَمِيْرٌ

وَبَقِيْتَ بَعْدَ الْعِزِّ رَهْنَ حُفَيْرَةٍ ❋ فِيْ عَالَمِ الْمَوْتٰى وَأَنْتَ حَقِيْرٌ

কামনা করবে তুমি জীবন যদি হতো তোমার ঝঞ্ঝামুখর রণাঙ্গনা; যদি না থাকত শাসন, বলত না কেউ—জি হুজুর আর জাহাঁপনা!

হারিয়ে যশ-ক্ষমতা জগৎজোড়া খ্যাতির মায়া, কবরে থাকবে শুয়ে বন্দি হয়ে জীর্ণ কায়া!

وَحُشِرْتَ عُرْيَانًا حَزِيْنًا بَاكِيًا ❋ قَلِقًا وَمَالَكَ فِي الْأَنَامِ مُجِيْرٌ

أَ رَضِيْتَ أَنْ تَحْيَا وَقَلْبُكَ دَارِسٌ ❋ عَافِي الْخَرَابِ وَجِسْمُكَ الْمَعْمُوْرُ

উঠবে রোজ হাশরে নগ্নদেহে, চোখের জলে পাগলপারা; রবে না তোমার পাশে আপন-স্বজন, সবাই যেন বাঁধনহারা!

আবারও ঘটবে যখন হৃদয় তরে দেহের মিলন, চাও কি তুমি; আবাদ ওই দেহের মাঝে হৃদয় তোমার রইবে পড়ে বিরানভূমি?

أَ رَضِيْتَ أَنْ يَحْظَى سِوَاكَ بِقُرْبِهِ ❋ أَبَدًا وَأَنْتَ مُعَذَّبٌ مَهْجُوْرٌ

مَهِّدْ لِنَفْسِكَ حُجَّةً تَنْجُوْ بِهَا ❋ يَوْمَ الْمَعَادِ وَيَوْمَ تَبْدُو الْعُوْرُ

তবে কি চাও কি তুমি, সবাই যখন করবে গ্রহণ তাহার শরণ; অসহায় করবে তুমি আর্তনাদে-যন্ত্রণাতে শাস্তিবরণ?

এখনো যায়নি বেলা অস্তাচলে, নাও গুছিয়ে নাজাত-ওজর; পরকাল বড়ই কঠিন করবে প্রকাশ সকল জনের গোপন খবর!

আবু উসমান ওয়াসিতির পঙ্‌ক্তিগুলো শুনে নুরুদ্দিন খুব ক্রন্দন করেন এবং পুরো রাজ্যের সব ধরনের কর রহিত করার নির্দেশ দেন।

মসুলের শায়খ উমর মাল্লা সে যুগের একজন দুনিয়াবিমুখ বুজুর্গ ছিলেন। সুলতান নুরুদ্দিন মসুলের প্রশাসক ও সেনাপতিদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা যেন উমর মাল্লাকে না জানিয়ে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে। এ কারণে তিনি তাদেরকে যা আদেশ করতেন, সকলে তা মানত। সুলতান নুরুদ্দিন প্রত্যেক রমজানে তার কাছ থেকে ইফতার-দ্রব্য ধার করতেন। তিনি সুলতানের জন্য ফিতিত (শুকনো রুটির টুকরা) ও রিকাক (পাতলা রুটি) প্রেরণ করতেন। সুলতান পুরো রমজান তা দিয়েই ইফতার করতেন। উমর মাল্লা একবার সুলতান নুরুদ্দিনের উদ্দেশে লেখেন, 'বিশৃঙ্খলাকারীদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। তাদের ব্যাপারে প্রশাসননীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। আর হত্যা, প্রহার ও শূলে চড়ানো ব্যতীত কোনো নীতি কার্যকর হবে না। কাউকে যদি নির্জন স্থানে হত্যা করা হয়, তাহলে কে আসবে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে?' প্রত্যুত্তরে সুলতান নুরুদ্দিন পত্রের অপর পিঠে লেখেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাদের জন্য শরিয়ত প্রণয়ন করেছেন এবং মানুষের কল্যাণক্ষেত্র সম্পর্কে তিনিই সর্বাধিক অবগত। আল্লাহ তাআলা যদি মাসলাহাত ও কল্যাণদাবির মাঝে শরিয়তের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রাখতেন, তাহলে মাসলাহাতকেই আমাদের শরিয়ত নির্ধারণ করতেন।

সুতরাং আল্লাহ-নির্ধারিত শরিয়তের সঙ্গে আমাদের পক্ষ থেকে কোনো সংযোজনের প্রয়োজন নেই। শরিয়তে কোনো কিছু সংযোজনের দাবি করার অর্থ হলো, শরিয়ত অসম্পূর্ণ, বান্দা সংযোজনের মাধ্যমে তার পূর্ণতা সাধন করছে! নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহ তাআলা ও তার শরিয়তের প্রতি চরম দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন। আর অন্ধ হৃদয় ও ভ্রষ্ট বিবেকধারীকে হিদায়াত দেওয়া হয় না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ও আপনাকে সিরাতে মুসতাকিম ও সঠিক পথের নির্দেশনা দান করুন।'

সুলতানের উত্তর উমর মাল্লার কাছে পৌঁছলে তিনি মসুলের জনসাধারণকে জড়ো করে তাদের সামনে পত্রটি পাঠ করেন এবং বলতে থাকেন, 'দেখো! একজন দুনিয়াবিরাগী যাহিদ শাসকের উদ্দেশে কী বার্তা পাঠিয়েছেন আর শাসক প্রত্যুত্তরে কী লিখেছেন!'

একবার শায়খ আবুল বায়ানের এক ভাই সুলতান নুরুদ্দিনের কাছে এসে জনৈক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ জানাতে লাগল যে, সে আমাকে গালিগালাজ করেছে, আমাকে কপট ও প্রতারক বলে অপবাদ দিয়েছে, আমাকে ..., আমাকে ....। এভাবে সে একের পর এক নানা অভিযোগ উল্লেখ করতে লাগল। তখন সুলতান নুরুদ্দিন তাকে বললেন, আল্লাহ তাআলা কি কুরআনে বলেননি—

﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَٰهِلُونَ قَالُوا سَلَٰمًا﴾

> এবং অজ্ঞ লোক যখন তাদেরকে লক্ষ করে (অজ্ঞতাসুলভ) কথা বলে, তখন তারা শান্তিপূর্ণ কথা বলে। [সুরা ফুরকান : ৬৩]

﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَٰهِلِينَ﴾

আর অজ্ঞদের উপেক্ষা করো। [সুরা আরাফ : ১৯৯]

এ কথা শুনে লোকটি চুপ হয়ে গেল এবং উপযুক্ত কোনো জবাব খুঁজে পেল না।

ফকিহ আবুল ফাতহ আশরি বলেন, সুলতান নুরুদ্দিন যথাসময়ে জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায়ে পূর্ণ যত্নবান ছিলেন। তিনি নামাজের যাবতীয় শর্ত বজায় রেখে ধীরস্থির ও প্রশান্ত চিত্তে রুকু-সিজদাসহ নামাজের প্রতিটি রোকন আদায় করতেন। তিনি রাতে অধিক নামাজ আদায় করতেন,

প্রতিটি কাজের জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে কাকুতিমিনতি করে দোয়া করতেন।

তিনি আরও বলেন, নির্ভরযোগ্য একদল বুজুর্গের কাছে আমি জানতে পেরেছি যে, ফিরিঙ্গিরা বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করার পর তারা সেখানে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করেছিল। তারা সেখানে বসবাসকারী খ্রিষ্টানদের বলতে শুনেছে—'নিশ্চয়ই কাসিম ইবনে কাসিমের (তারা এর দ্বারা নুরুদ্দিনকে বোঝাচ্ছিল) আল্লাহ তাআলার সঙ্গে গোপন সম্পর্ক রয়েছে। সে সৈন্যবলে আমাদের বিরুদ্ধে জয়ী হয় না; জয়ী হয় দোয়া ও রাতের নামাজের মাধ্যমে। সে রাতে নামাজ পড়ে আল্লাহর দরবারে হাত উত্তোলন করে দোয়া করে; আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন এবং তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু দান করেন। এভাবেই সে আমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়।' তিনি বলেন, এমনই ছিল সুলতান নুরুদ্দিনের প্রতি কাফিরদের ধারণা।

শায়খ আবু শামা বর্ণনা করেন, নুরুদ্দিন (দামেশকের) মায়দান এলাকার (সংলগ্ন জঙ্গলভূমি বাদে) বাগানগুলো ওয়াকফ করে দেন। তিনি পুরো সম্পদের অর্ধেক ওয়াকফ করেন জামে দামেশকের উন্নয়নের জন্য, বাকি অর্ধেকের দুই-দশমাংশ ওয়াকফ করেন হানাফিদের জন্য প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার উন্নয়নের জন্য আর বাকি আট-দশমাংশ ওয়াকফ করেন নয়টি মসজিদের উন্নয়নের জন্য। মসজিদগুলো হলো—কাসিয়ুন পর্বতের মসজিদে সালিহিন, জামে কেল্লা, মসজিদে আতিয়া, আসকারের মসজিদে ইবনে লাবিদ, ঝুলন্ত রামাহিনের মসজিদ, সালিহিয়ার মসজিদে আব্বাস, দারুল বিতিতিখ (ফলপট্টি) এর ঝুলন্ত মসজিদ, এবং ইহুদিদের গির্জার পাশে সুলতান নুরুদ্দিন কর্তৃক সংস্কারকৃত মসজিদ। উল্লিখিত প্রতিটি মসজিদের জন্য মোট সম্পদের বাইশ ভাগের এক ভাগ করে বরাদ্দ করা হয়।[৯০]

সুলতান নুরুদ্দিনের কীর্তি-অবদান ও গুণ-বৈশিষ্ট্যের বিবরণ তো অনেক দীর্ঘ। আমরা এখানে সেগুলোর সামান্য কিছু উল্লেখ করেছি, যেন পাঠকবৃন্দ তার সমৃদ্ধ ও কর্মময় জীবনের বাকি দিকগুলো সম্পর্কেও ধারণা করতে পারেন।

---

৯০. সূক্ষ্ম হিসাবে প্রতিটি মসজিদের জন্য বরাদ্দকৃত অংশ ছিল ওয়াকফভূমির সাড়ে বাইশ ভাগের এক ভাগ বা পঁয়তাল্লিশ ভাগের দু-ভাগ ($\frac{২}{৪৫}$)।

শায়খ শিহাবুদ্দিন আবু শামা আল-মাকদিসি তার '*আর-রাওয়াতাইন ফি তারিখিদ দাওলাতাইন*' গ্রন্থের শুরুতে সুলতান নুরুদ্দিনের বিভিন্ন কীর্তি ও গুণের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তার প্রশংসায় কাসিদা রচনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, আসাদুদ্দিন মিশর জয় করার কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করলে সালাহুদ্দিন মিশরের গভর্নর নিযুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে সুলতান নুরুদ্দিন একাধিকবার সালাহুদ্দিনকে অপসারণ করে অন্য কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি লড়াইয়ের ব্যস্ততার কারণে তিনি তার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে পারছিলেন না। এরইমধ্যে তার মৃত্যুর নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে আসে।

অবশেষে শুরু হয় ৫৬৯ হিজরি সন, তার জীবনের শেষ বছর। এ বছর তিনি মিশরে প্রবেশ করার দৃঢ় সংকল্প করেন। তিনি মসুল ও অন্যান্য অঞ্চলের সেনাপতিদের কাছে বার্তা পাঠিয়ে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন তার অনুপস্থিতিতে খ্রিষ্টানদের সম্ভাব্য হামলা থেকে শাম অঞ্চলের নিরাপত্তারক্ষায় মনোযোগী থাকে। তিনি নিজে মূল বাহিনী নিয়ে মিশর অভিমুখে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সালাহুদ্দিন এ খবর শুনে খুবই ভীত হয়ে পড়েন।

ঈদুল ফিতরের দিন সুলতান নুরুদ্দিন দামেশকের ময়দানে আখযারের (সবুজ প্রাঙ্গণ) সম্মুখভাগে ঈদের নামাজ আদায় করেন। সেদিন ছিল রবিবার। এরপর তিনি ময়দানের উত্তর প্রান্তে লক্ষ্যভেদের অনুশীলন করেন। তাকদির যেন অদৃশ্য থেকে তাকে বলছিল, এটাই তোমার জীবনের শেষ ঈদ! এরপর তিনি বিশাল দস্তরখানের আয়োজন করেন এবং সবাইকে তৃপ্তির সঙ্গে আপ্যায়ন গ্রহণ করতে বলেন। ঈদের দিনই সুলতানের পুত্র সালিহ ইসমাইলের খতনা করানো হয়। ঈদ ও খতনাকে উপলক্ষ্য করে পুরো নগরী সজ্জিত করা হয় এবং দামামা বাজানো হয়।

সোমবার তিনি অভ্যাস অনুযায়ী অশ্বারোহণ করেন, পোলো অনুশীলনও করেন। এরপর তিনি হঠাৎ করেই স্বভাববিরোধী এক আচরণ করেন এবং জনৈক সেনাপতির ওপর ক্রুদ্ধ হন। তিনি প্রচণ্ড রাগান্বিত অবস্থায়ই দ্রুত দুর্গে চলে যান। সুলতানের মনমেজাজ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, দেহ-মন অস্বাভাবিক হয়ে যায়। তিনি আশেপাশের সবকিছু উপেক্ষা করে বিষণ্ন মনে নিজের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েন। দীর্ঘ এক সপ্তাহ সুলতান সবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন। এদিকে সুলতানের অবস্থা শঙ্কাপূর্ণ, ওদিকে জনগণ

ব্যস্ত তার পুত্রের খতনা উপলক্ষ্যে আয়োজিত আনন্দ উৎসবে। সকলের আনন্দ একসময় বিষাদে রূপ নেয়; নির্মম বাস্তবতা মুছে দেয় হাসি-আনন্দ। সুলতান কণ্ঠনালিতে ডিপথেরিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ায় কথা বলতেও অক্ষম হয়ে পড়েন। সুলতানকে শিঙ্গা লাগানো ও দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণের অনুরোধ করা হলে তিনি ইঙ্গিতে অসম্মতি জানান। আল্লাহ তাআলার ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত তো সুনির্ধারিত ও অবধারিত। এ বছরেরই ১১ শাওয়াল (১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ মে) বুধবার আটান্ন বছর বয়সে তিনি আপন প্রভুর ডাকে সাড়া দেন। জীবনের আটাশটি বছর তিনি শাসন দায়িত্ব পালন করেছেন। দামেশকের দুর্গের মসজিদে তার জানাজার নামাজ আদায় করা হয়। তিনি নিজেই দারবের বাবুল খাওয়াছিন ও বাবুল খামিইয়িনের মধ্যবর্তী স্থানে[৯১] নিজের কবরের স্থান নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। তার মৃতদেহ সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দাফন করা হয়। প্রত্যেক পথিক সুলতান নুরুদ্দিনের সমাধি জিয়ারত করে, কবরের জানালার সঙ্গে গলা লাগিয়ে বরকত গ্রহণ করে। যেহেতু তিনি কণ্ঠনালির রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাই মানুষ বলে, এটি 'শহিদ' নুরুদ্দিনের সমাধি। তার পুত্রকেও শহিদ বলা হতো। সুলতান নুরুদ্দিনের উপাধি ছিল 'কাসিম'। খ্রিষ্টানরা তাকে কাসিম ইবনুল কাসিম বলে অভিহিত করত।[৯২]

সুলতান নুরুদ্দিনের ইন্তেকাল-পরবর্তী পরিস্থিতি

নুরুদ্দিনের মৃত্যুর পর তার পুত্র সালিহ ইসমাইলের নামে বায়আত গ্রহণ করা হয়। সালিহ তখন বয়সের বিবেচনায় একেবারেই নবীন ও অল্পবয়স্ক ছিলেন। তাই সেনাপতি শামসুদ্দিন ইবনে মুকাদ্দিমকে তার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। এ সময় জিনকি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসক ও সেনাপতিরা বিরোধে জড়িয়ে পড়ে এবং মতবিরোধকে কেন্দ্র করে পুরো রাষ্ট্রে অস্থিরতা-অরাজকতা শুরু হয়। রাজ্যজুড়ে মদের অবাধ ব্যবহার শুরু হয়; অথচ সুলতান নুরুদ্দিনের জীবদ্দশায় কেউ এর সাহসও করতে পারত না। চতুর্দিক থেকে ইসলামের শত্রুরা মুসলমান ও ইসলামি ভূখণ্ডের প্রতি

---

[৯১]. সুলতান নুরুদ্দিনের সমাধি দামেশকে তার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা আন-নুরিয়ার সন্নিকটে অবস্থিত।

[৯২]. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১২/২৫৮-২৬৪।

লোলুপ দৃষ্টি ফেলতে থাকে। ফিরিঙ্গিরা মুসলমানদের হাত থেকে দামেশক নগরীর কর্তৃত্ব কেড়ে নেওয়ার সংকল্প করে। তখন শামসুদ্দিন ইবনে মুকাদ্দিম ফিরিঙ্গিদের প্রতিরোধে অগ্রসর হন এবং বানিয়াসের কাছে তাদের মুখোমুখি হন। কিন্তু তিনি তাদের প্রতিরোধে দৃঢ়তার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হন এবং শেষপর্যন্ত প্রচুর সম্পদ প্রদান করে তাদের সঙ্গে সন্ধি করেন। অবশ্য তিনি যদি ফিরিঙ্গিদের (মিশরের প্রশাসক) আল-মালিকুন নাসির সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির আগমনের ভয় না দেখাতেন, তাহলে তারা সন্ধিপ্রস্তাবেও রাজি হতো না। সালাহুদ্দিনের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং সংখ্যায় স্বল্প ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে আপস করায় ও তাদেরকে অর্থ প্রদান করায় ইবনে মুকাদ্দিম আতাবিকসহ শামের বিভিন্ন অঞ্চলের সেনাপতি ও প্রশাসকদের কাছে পত্র পাঠিয়ে তাদেরকে ভর্ৎসনা করেন। সালাহুদ্দিনের পত্র পেয়ে অনুতপ্ত হওয়া দূরে থাক, সেনাপতি ও প্রশাসকগণ উল্টো কঠোর ভাষায় জবাবি পত্র প্রেরণ করে। তখন সুলতান সালাহুদ্দিন শাম অভিমুখে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন।

কিন্তু এরইমধ্যে ৫৭০ হিজরি সনে ফিরিঙ্গিরা মিশরে হামলা চালায়। এদিকে উবায়দিরাও সালাহুদ্দিনকে হটিয়ে ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করার জন্য সার্বক্ষণিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। বাধ্য হয়ে সালাহুদ্দিন শাম অভিযানের পরিকল্পনা আপাতত মুলতবি রাখেন।

এ সময় সিসিলি থেকে ক্রুসেডারদের বিশাল এক নৌবহর মিশরে আক্রমণ চালানোর লক্ষ্যে রওনা হয়। ইতিপূর্বে ইতিহাসে এত বিশাল নৌবহরের কোনো দৃষ্টান্ত নেই। নৌবহরটিতে ছিল সৈন্যবহনকারী দুইশ জাহাজ, অশ্ববহনকারী ছত্রিশটি জাহাজ, যুদ্ধাস্ত্রে পূর্ণ ছয়টি বিশাল জাহাজ এবং রসদসামগ্রীতে পূর্ণ চল্লিশটি বড় জাহাজ। নৌবহরটিতে পঞ্চাশ হাজার পদাতিক সৈন্য এবং দেড় হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। ক্রুসেডার বাহিনী আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছেই কামান ও মিনজানিক স্থাপন করে আক্রমণ শুরু করে। এ সময় আলেকজান্দ্রিয়াবাসী বীরত্বের সঙ্গে তাদের প্রতিরোধ করে। দ্বিতীয় দিন অন্যান্য অঞ্চল থেকেও মুসলিম সৈন্যগণ ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে যায়। তৃতীয় দিনই মুসলিম সৈন্যদের প্রচণ্ড আক্রমণে ক্রুসেডাররা পিছু হটে এবং পলায়নের পথ ধরে। মুসলমানরা ক্রুসেডারদের কামানগুলো জ্বালিয়ে দেয় এবং পলায়নরত

ক্রুসেডারদের তাড়া করে। অসংখ্য খ্রিষ্টান সৈন্য নিহত হয়, অনেকে পানিতে ডুবে মারা যায়। এভাবে ক্রুসেডারদের মিশর দখলের চেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যায়।

ওদিকে সুলতান সালাহুদ্দিন উবায়দিদের সব চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র সফলতার সঙ্গে দমন করেন। অবশেষে মিশরের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়ার পর সুলতান সালাহুদ্দিন শাম অভিমুখে রওনা হন। তার এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল এ অঞ্চলের ইসলামি শক্তিকে ঐক্যবদ্ধকরণ, শামবাসীর প্রতি সদাচরণ, শামের সমতল ও পাহাড়ি ভূমিতে নিরাপত্তাপ্রতিষ্ঠা, অবাধ্যদের দমন করে ইসলামের সহায়তাকরণ এবং কুরআনের প্রচার-প্রসার ও সকল ভ্রান্ত ধর্মের অপনোদন।

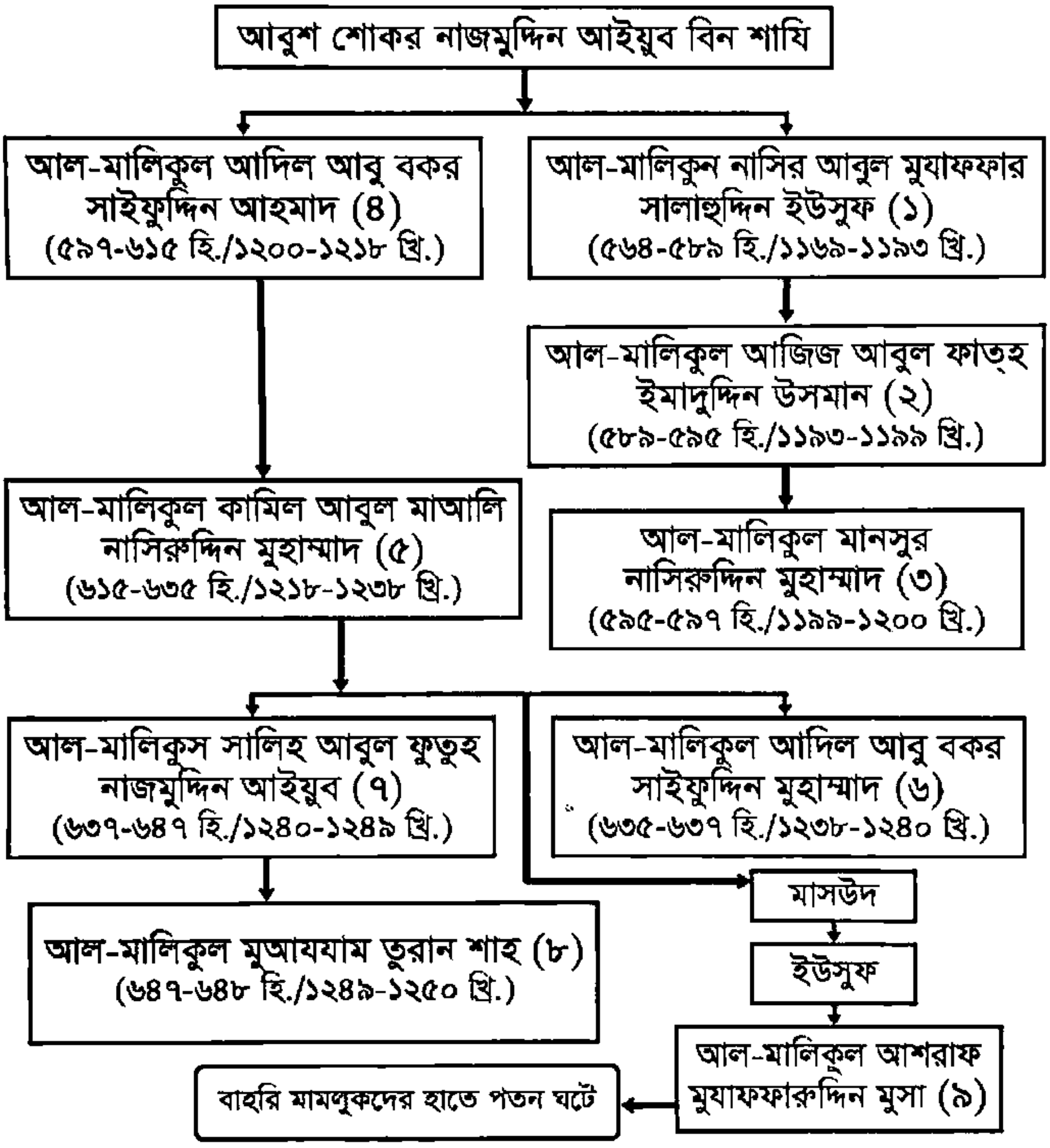
৫৭০ হিজরি সনেই সুলতান সালাহুদ্দিন তার ভাই আবু বকরকে মিশরে অস্থায়ী নায়েব নিযুক্ত করে দামেশক অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি কোনো ধরনের রক্তপাত ছাড়াই দামেশকে প্রবেশ করেন এবং নুরুদ্দিনের মৃত্যুপরবর্তী সময়ে সেখানে সৃষ্ট সকল বিশৃঙ্খলা দূর করেন। এরপর তিনি তার আরেক ভাই সাইফুল ইসলাম তুগতেকিনকে দামেশকের প্রশাসক নিযুক্ত করে আলেপ্পো অভিমুখে রওনা হন। এ সময় আলেপ্পোর সেনাপতিগণ ও একদল উবায়দি মিলে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলেও আল্লাহ তাআলা ইসলামের এই মহান সৈনিককে রক্ষা করেন এবং তিনি তাদের সকলকে হত্যা করেন।

সুন্নিদের কাছে মিশরের কর্তৃত্ব হারানো শিয়া উবায়দিরা কিন্তু নিশ্চুপ বসে ছিল না। তারা এবার খ্রিষ্টরাজ্য ত্রিপোলির খ্রিষ্টান শাসক কুমাছের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং সালাহুদ্দিনের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহায়তা করলে বিপুল পরিমাণ সম্পদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দিন ছিলেন চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্ক ও দূরদর্শী। তিনি তাদের সকল চক্রান্ত প্রতিহত করেন এবং হিমস, আলেপ্পো ও হামা অঞ্চল পুনরুদ্ধার করে ইসলামি ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন। সালাহুদ্দিন মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে তার চেষ্টা জারি রাখেন। এভাবে এ অঞ্চলের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সালাহুদ্দিন এমন এক সুবিশাল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, যার ব্যাপ্তি ছিল উত্তর ইরাক (কুর্দিস্তান), শাম, মিশর ও বারকা (Cyrenaica) অঞ্চলজুড়ে। সুলতান

সালাহুদ্দিন আইয়ুবির প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্র পরিচিতি লাভ করে আইয়ুবি রাষ্ট্র নামে।

আইয়ুবি রাষ্ট্রের সুলতানদের বংশলতিকা

[নামের পাশে বন্ধনীতে উল্লেখিত নাম্বার দ্বারা সুলতানদের ক্রমধারা বোঝানো হয়েছে]



সালাহুদ্দিন আইয়ুবির পিতা নাজমুদ্দিন আইয়ুব বিন শাযির পরিচিতি

নাজমুদ্দিন আইয়ুব ছিলেন ইসলামি ইতিহাসের অন্যতম মহান বীর যোদ্ধা। তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সেলজুক সুলতান মুহাম্মাদ বিন মালিক শাহের সেবক ছিলেন। নাজমুদ্দিনের সততা, বিশ্বস্ততা এবং বীরত্ব ও সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে সুলতান মুহাম্মাদ তাকে

তিকরিত দুর্গের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। নাজমুদ্দিন সেখানে ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় একদিন মসুলের প্রশাসক সুলতান ইমাদুদ্দিন জিনকি এক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিকরিতে আগমন করেন। নাজমুদ্দিন তাকে আশ্রয় দেন, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং তার পূর্ণ সেবা-শুশ্রূষা করেন। পনেরো দিন তার কাছে অবস্থান করার পর ইমাদুদ্দিন মসুলে ফিরে যান। নাজমুদ্দিনের এই নিষ্ঠাপূর্ণ আচরণ সুলতান ইমাদুদ্দিনের হৃদয়ে দাগ কাটতে সক্ষম হয়। পরবর্তীকালে সেলজুক সুলতান গিয়াসুদ্দিন মাসউদ বিন মুহাম্মাদ তাকে সরিয়ে ইরাকের পুলিশ বিভাগের প্রধান মুজাহিদুদ্দিন নাহরুযকে তিকরিত দুর্গের দায়িত্ব প্রদান করেন। নাজমুদ্দিনও তিকরিতেই বসবাস করতে থাকেন। এর কিছুদিন পর কোনো কারণে নাহরুয নাজমুদ্দিনের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে দুর্গ থেকে বের করে দেন। যে রাতে নাজমুদ্দিন তিকরিত দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, সে রাতেই তার পুত্র সালাহুদ্দিন ইউসুফ ভূমিষ্ঠ হন। বাসস্থান থেকে বিতাড়িত হওয়ার দিন পুত্র সালাহুদ্দিনের আগমনকে তিনি অশুভ মনে করেছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তাকে বলে, 'আপনি আজ এই নবজাতককে অশুভ মনে করছেন! এমনকি হতে পারে না যে, একদিন এই নবজাতকের হাতেই এক সুবিশাল ও সুবিখ্যাত রাজত্বের ক্ষমতা থাকবে?!' ইতিহাস সাক্ষী, সেদিনের সেই অজ্ঞাত ব্যক্তিটির আশাবাদ ও শুভকামনা একদিন অক্ষরে অক্ষরে বাস্তব হয়েছিল। তিকরিত ছেড়ে নাজমুদ্দিন আইয়ুব ও তার ভাই আসাদুদ্দিন শিরকুহ মসুলে সুলতান ইমাদুদ্দিনের খেদমতে হাজির হন এবং নিজেদের যোগ্যতা ও নিষ্ঠাপূর্ণ কর্মদক্ষতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে জিনকি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হন। পরবর্তী সময়ে সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি নাজমুদ্দিন আইয়ুবকে বালাবাক্কুর গভর্নর নিযুক্ত করেন আর তার ভাই আসাদুদ্দিন শিরকুহ পরিণত হন জিনকি সেনাবাহিনীর অন্যতম জ্যেষ্ঠ সেনাপতিতে।

৫৮২ হিজরি সনে বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের অধীনস্থ কারাক অঞ্চলের প্রশাসক রেনাল্ড (Reynald) মুসলমানদের একটি বাণিজ্য কাফেলার ওপর আক্রমণ করে। অথচ বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের সঙ্গে তখন সুলতান সালাহুদ্দিনের শান্তিচুক্তি কার্যকর ছিল এবং চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল, যেকোনো মুসলিম কাফেলা নির্বিঘ্নে মিশর থেকে শামে আসা-যাওয়া করতে পারবে; ক্রুসেডাররা তাতে কোনোপ্রকার বাধা সৃষ্টি করবে

না। কিন্তু কারাকের প্রশাসক চুক্তিভঙ্গ করে কাফেলার সদস্যদের বন্দি করে এবং ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বন্দিদেরকে বলে, 'তোমরা যদি মুহাম্মাদের ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে থাকো, তাহলে এখন তাকে ডাকো, সে এসে তোমাদের মুক্ত করুক এবং এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুক!' সালাহুদ্দিনের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি রেনাল্ডকে বন্দি করতে পারলে নিজ হাতে হত্যা করার শপথ করেন।

খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের এই চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের পর সুলতান সালাহুদ্দিন দ্রুত যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সময়টি ছিল মুসলিম হাজিদের হজ শেষে হিজায ভূমি থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়। কারাকের প্রশাসক রেনাল্ড প্রত্যাবর্তনরত হজ কাফেলার ওপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছিল। সালাহুদ্দিন তাদের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে মুসলিম বাহিনী নিয়ে রওনা হন এবং পুরো খ্রিষ্টান বিশ্বের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। সুলতান সালাহুদ্দিন বুছরার সন্নিকটে কাসরুস সালামায় শিবির স্থাপন করেন। মুসলিম হজ কাফেলা নিরাপদে পথ অতিক্রম করা পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। হাজি সাহেবরা এ সময় সালাহুদ্দিনের জন্য নুসরত ও বিজয়লাভের দোয়া করে।

হিত্তিনের যুদ্ধ

[রবিউস সানি ৫৮৩ হিজরি]

[জুলাই ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দ]

৫৮৩ হিজরি সনের ১৭ রবিউল আউয়াল সুলতান সালাহুদ্দিন দামেশক থেকে বেরিয়ে আসেন। রা'সুল-মা' নামক স্থানে পৌঁছার পর তিনি এলাকাটিকে তার বাহিনীর সৈন্যদের সমবেত হওয়ার কেন্দ্র নির্বাচন করেন। এরপর তিনি তার পুত্র আল-মালিকুল আফজালকে সেখানে রেখে নিজে বুছরা অভিমুখে রওনা হন। অপরদিকে মুযাফফারুদ্দিন কুকুবুরি চলে যান আক্কায়। সালাহুদ্দিন এরপর বুছরা থেকে কারাক ও শাওবাকের (Shoubak) দুর্গের উদ্দেশে গমন করেন; তারপর ফিরে যান তাবারিয়ায় (Tiberias)।

এ সময় এবং পূর্ববর্তী সময়গুলোতে যখনই কেউ সুলতান সালাহুদ্দিনের দিকে তাকাত, তাকে বিষণ্ন, চিন্তিত ও ভারাক্রান্ত দেখতে পেত। এ সময়

তিনি পানাহারের প্রতিও নিরাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন; একান্ত বাধ্য হলে সামান্য কিছু খাবার গ্রহণ করতেন। তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন, 'বাইতুল মুকাদ্দাস ক্রুসেডারদের হাতে; আমি কীভাবে পানাহার, নিদ্রা আর আনন্দে ডুবে থাকি?' সুলতান সালাহুদ্দিনের বন্ধু ও সঙ্গী কাজি বাহাউদ্দিন ইবনে শাদ্দাদ ক্রুসেড যুদ্ধ চলাকালে সালাহুদ্দিনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'তার কাছে আল-কুদসের বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ ও ভারবাহী ছিল যে, পাহাড়ও তা বহন করতে পারবে না।'

সুলতান সালাহুদ্দিনের বিস্তৃত পরিকল্পনা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সমকালীন খ্রিষ্টান নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সৈন্যসমাবেশ শুরু করে। এরপর তারাও তাবারিয়া অভিমুখে রওনা হয়। উভয় বাহিনী হিত্তিন নামক স্থানে পরস্পর মুখোমুখি হয়। মুসলিম বাহিনী পূর্বেই যুদ্ধক্ষেত্রের আশেপাশের পানির উৎসগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করায় ক্রুসেডার বাহিনী এ সময় প্রচণ্ড পানিস্বল্পতার সম্মুখীন হয়।

উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধের পর সুলতান সালাহুদ্দিন নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেন। চরমভাবে পরাজিত ক্রুসেডার বাহিনীর একজন সদস্যও পালিয়ে যেতে পারেনি। হয় তারা নিহত হয়; কিংবা বন্দি হয়।

যুদ্ধে নিহত ক্রুসেডার সৈন্যের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। যুদ্ধক্ষেত্রেই আক্কার বিশপ নিহত হন এবং তার হাতে থাকা 'সত্য ক্রুশ'[৯৩] মাটিতে পড়ে থাকে। মুসলমানরা ক্রুশটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। এ ঘটনা

---

৯৩. প্রচলিত খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীদের বিশ্বাস অনুযায়ী যে কাষ্ঠখণ্ডে হজরত ঈসা মাসিহ আ.-কে শূলে চড়ানো হয়, তার ভগ্নাবশেষকে সত্য ক্রুশ (The True Cross) বলা হয়। খ্রিষ্টানদের মহাসভার সিদ্ধান্ত ও খ্রিষ্টান চার্চের ঐতিহাসিক সক্রেটিস (Socrates Scholasticus)-এর দাবি অনুযায়ী ৩২৬-৩২৮ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইনের মা হেলেনা উক্ত ক্রুশ আবিষ্কার করেন।

অপরদিকে ইসলামি বিশ্বাসমতে হজরত ঈসা আ.-কে শূলে চড়ানো হয়নি; বরং মহান আল্লাহ তাআলা তাকে আপন কুদরতে আসমানে তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ﴾

তারা তাকে হত্যা করেনি, শূলেও চড়ায়নি; কিন্তু তাদের ধাঁধায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। [সূরা নিসা : ১৫৭]

ছিল খ্রিষ্টান বাহিনীর জন্য সবচেয়ে বড় দুর্যোগ। তারা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, তাদের কপালে নিশ্চিত মৃত্যু ও ধ্বংস রয়েছে। এরপর মুসলমানরা পলায়নপর ক্রুসেডারদের পিছু নিয়ে নিকটবর্তী পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করতে থাকে এবং তাদের তরবারির আঘাতে খ্রিষ্টান সৈন্যরা লুটিয়ে পড়তে থাকে। বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা গাই (Guy of Lusignan)-এর পাশে থাকে মাত্র দেড়শ সৈন্য। ক্লান্তি ও ক্ষুৎপিপাসায় একসময় তারা পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়। বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা গাই ও কারকের প্রশাসক রেনাল্ড মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দি হয়।

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির জন্য একটি তাঁবু প্রস্তুত করা হয়। তাঁবুতে সুলতানের বিজ্ঞ উপদেষ্টা ও সেনাপতিরা সমবেত হয়। সকলে কৃতজ্ঞতায় আল্লাহর দরবারে সিজদাবনত হয়ে পড়ে। এরপর সুলতানের নির্দেশে বন্দি দুই রাজাকে উপস্থিত করা হয় এবং তাঁবুর ভেতরে বসানো হয়। প্রচণ্ড পিপাসায় কাতর বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক পানি পান করতে চাইলে তার জন্য ঠান্ডা পানি পরিবেশন করা হয়। সামান্য পানি পান করার পর তিনি অবশিষ্ট পানি রেনাল্ডকে দিতে উদ্যত হলে সালাহুদ্দিন বজ্রকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'আমরা এ পানি তাকে পান করার জন্য দিইনি। কাজেই তার নিজেকে নিরাপদ ভাবার কোনো সুযোগ নেই।' ক্রুদ্ধ সুলতান দাঁড়িয়ে যান এবং রেনাল্ডকে তার গর্হিত আচরণ ও নবীজির শানে ধৃষ্টতার জন্য ভর্ৎসনা করেন। এরপর তিনি আপন প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে নিজ হাতে তাকে হত্যা করেন। রেনাল্ডের পরিণতি স্বচক্ষে অবলোকন করে বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা গাই ভীত হয়ে পড়লে সুলতান সালাহুদ্দিন তাকে শান্ত করতে বলেন, 'রাজাদের হত্যা করা রাজন্যবর্গের নীতি নয়; কিন্তু এই লোক সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।'

এরপর বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা ও তার জীবিত অনুচরদের সসম্মানে দামেশকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

আল-কুদস পুনরুদ্ধার

৫৮৩ হিজরি সনের জুমাদাল উলা মাসে সুলতান সালাহুদ্দিন আক্কায় (Acre) প্রবেশ করেন। মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে সেখানকার ক্রুসেডাররা পালিয়ে সুর (Tyre) নগরীতে চলে যায়। এরপর সালাহুদ্দিন তিবনিন (Tebnine), সিডোন (Sidon), ব্যাবলস (Byblos) ও বৈরুতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি উপকূলীয় পথ ধরে আসকালানে পৌঁছে আসকালান অবরোধ করেন। চৌদ্দ দিনের অবরোধের পর আসকালানবাসী আত্মসমর্পণ করে। এর মাধ্যমে একদিকে বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধ করার পথ সুগম হয়, অপরদিকে উপকূলীয় পথ ধরে বহির্বিশ্ব থেকে সাহায্য আগমনের পথও বন্ধ হয়ে যায়।

রামলা, দারুম, গাজা, বেথেলহাম, নাতরুন ইত্যাদি এলাকা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলে সালাহুদ্দিন আইয়ুবি এবার বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখী হন। তিনি সেখানে কোনো রক্তপাত ঘটাতে চাননি। কিন্তু ক্রুসেডাররা আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে সুলতান সালাহুদ্দিন বাধ্য হয়ে শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে বাইতুল মুকাদ্দাসে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ফিরিঙ্গিরা সন্ধিচুক্তি করতে সম্মত হয় এবং এই শর্তে চুক্তি সম্পাদিত হয় যে—আগামী চল্লিশ দিন তাদেরকে বাইতুল মুকাদ্দাস ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। বিনিময়ে পুরুষগণ জনপ্রতি দশ দিনার, নারীগণ জনপ্রতি পাঁচ দিনার এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিনিময়ে জনপ্রতি দুই দিনার প্রদান করতে হবে। কেউ নির্ধারিত দিনার প্রদান করতে না পারলে সে বন্দি বিবেচিত হবে। যারা শর্ত মেনে প্রস্থান করবে, তাদেরকে নিরাপদে সুর নগরীতে চলে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করার পর মুসলমানরা প্রথম জুমা মসজিদুল আকসায় আদায় করতে পারেনি। তারা এ সময় ক্রুশ, খ্রিষ্টান সন্ন্যাসী ও শূকর ইত্যাদি সরিয়ে মসজিদ পরিষ্কার করায় ব্যস্ত ছিল।

৫৮৩ হিজরি সনের ২৭ রজব (১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ২ অক্টোবর) মসজিদুল আকসায় প্রথম খুতবা প্রদান করেন দামেশকের কাজি মুহিউদ্দিন ইবনুয যাকি। তিনি তার খুতবায় বলেন—

> উপস্থিত লোকসকল! আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই হচ্ছে মুমিন বান্দার চূড়ান্ত

লক্ষ্য ও সর্বোচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্তি। এ সুসংবাদ বাস্তবায়িত হয়েছে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে তোমাদের হাতে এই হৃত ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে, দীর্ঘ প্রায় এক শতাব্দী মুশরিকদের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার পর আপন অবস্থানে ইসলামের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এবং আল্লাহ তাআলার এই মহান ঘরকে পবিত্র করার মাধ্যমে। তিনি এ ঘরকে সমুন্নত ও উচ্চ মর্যাদা দানের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এখানে তার নাম উচ্চারণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তোমাদের মাধ্যমে এখানে ছড়িয়ে পড়া শিরকের মূলোৎপাটন করেছেন, আপন দ্বীনের রীতি-নীতি চালু করেছেন এবং তার একত্ববাদের নীতিমালা সমুন্নত করেছেন। কেননা, এ নগরী তো একত্ববাদের নীতিমালার ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ নগরী হচ্ছে তোমাদের পিতা ইবরাহিমের আবাসভূমি, তোমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিরাজের সূচনাভূমি। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই মসজিদুল আকসা ছিল তোমাদের নামাজের কিবলা। এ ভূখণ্ড নবীগণের আবাসস্থল, আউলিয়ায়ে কেরামের গন্তব্যস্থল, রাসুলগণের কেন্দ্রস্থল এবং ওহি অবতরণস্থল। এখানেই অবতীর্ণ হয়েছে কত শত বিধিবিধান, আদেশ-নিষেধ। এ হচ্ছে সমাবেশস্থল ও উত্থানস্থল। এই সেই পবিত্র ভূমি, যার কথা আল্লাহ তাআলা তার মহাগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

এই সেই মসজিদ, যেখানে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নৈকট্যশীল ফিরেশতাদের নিয়ে নামাজ আদায় করেছেন। এই সেই ভূমি, যেখানে আল্লাহ তাআলা তার বান্দা, রাসুল এবং মরিয়মের উদ্দেশে প্রেরিত 'কালিমা' ও রুহ ঈসাকে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে রিসালাত ও নবুওয়তের মর্যাদা দান করে সম্মানিত করেছেন, আবদিয়াত ও দাসত্বের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করেননি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ﴾

মাসিহ কখনো আল্লাহর বান্দা হওয়াকে লজ্জার বিষয় মনে করে না। [সুরা নিসা : ১৭২]

তিনি আরও ইরশাদ করেন—

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾

যারা বলে—মরিয়ম-তনয় মাসিহই আল্লাহ, তারা নিশ্চিত কাফির হয়ে গেছে। [সুরা মায়িদা : ১৭]

এই মসজিদুল আকসা হচ্ছে প্রথম কিবলা, দ্বিতীয় মসজিদ ও তৃতীয় হারাম শরিফ। মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববির পর শুধু এ মসজিদের উদ্দেশেই সফর করা যায়। সেই দুই স্থানের পর কেবল এখানেই কোমর বাঁধা হয়। যদি তোমরা আল্লাহ তাআলার মনোনীত ও নির্বাচিত না হতে, তাহলে তিনি তোমাদেরকে এই মর্যাদায় ভূষিত করতেন না। এ মর্যাদায় আর কেউ তোমাদের অংশীদার নয়, নয় সমকক্ষ। স্বাগত তোমাদের এই মহান বাহিনীকে! যাদের হাতে নববি মুজিজা বাস্তবায়িত হয়েছে, বদরের ঘটনা পুনঃসম্পাদিত হয়েছে এবং সিদ্দিকি দৃঢ়তা, উমরি বিজয়াভিযান, উসমানি বাহিনীপ্রেরণ ও আলাবি প্রচণ্ড হামলার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

তোমরা ইসলামের জন্য কাদিসিয়া, ইয়ারমুক ও খায়বারের ইতিহাসের নবায়ন করেছ, আবার ফিরিয়ে এনেছ খালিদের বীরত্বের স্মৃতি। আর তাই আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের নবীর পক্ষ হতে উত্তম বিনিময় দান করুন।...

শত্রুর সঙ্গে আচরণে সুলতান সালাহুদ্দিনের উদারতা

এ প্রসঙ্গে আমরা মুসলিম ইতিহাসবিদদের পরিবর্তে কয়েকজন অমুসলিম ঐতিহাসিকের মন্তব্য উল্লেখ করছি।

- স্টিফেনসন বলেন—'সুলতান সালাহুদ্দিন প্রচুর সংখ্যক লোককে মুক্তিপণ ছাড়াই বাইতুল মুকাদ্দাস ত্যাগের সুযোগ দিয়েছেন।'
- ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ স্ট্যানলি লেন পোল (Stanley Edward Lane-Poole) (মৃত্যু : ১৯৩১ খ্রি.) বলেন—সুলতান একদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পুরো সময় নগরদ্বার খুলে রেখে অসহায় ও দরিদ্রদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই যেতে দিয়েছেন।'

- ভারতীয় প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ সৈয়দ আমির আলি ইংরেজ ঐতিহাসিক মিলস-এর বরাতে উল্লেখ করেন—'আল-কুদস ত্যাগ করে প্রচুর সংখ্যক খ্রিষ্টান নাগরিক খ্রিষ্টরাজ্য এন্টিয়কের উদ্দেশে রওনা হয়। কিন্তু এন্টিয়কের শাসক তাদের আশ্রয় দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তাড়িয়ে দেন। বাধ্য হয়ে তারা ফিরতি পথ ধরে এবং বিভিন্ন ইসলামি ভূখণ্ড অভিমুখে রওনা হয়। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করা হয়।'

- আমির আলি আরও উল্লেখ করেন—স্ট্যানলি লেন পোলের বর্ণনামতে বাইতুল মুকাদ্দাসের গির্জাপ্রধান ছিল দয়ামায়াহীন চরম নিষ্ঠুর ব্যক্তি। দরিদ্র ও অসহায় নাগরিকদের মুক্তিপণ আদায়ে সাহায্য করার পরিবর্তে সে তার প্রচুর সম্পদ নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। তখন সালাহুদ্দিনকে জিজ্ঞেস করা হয়—'আপনি কেন মুসলমানদের উন্নয়নের কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করছেন না?' উত্তরে সুলতান বলেন, 'আমি তার কাছ থেকে দশ দিনারের চেয়ে সামান্য বেশিও গ্রহণ করব না এবং তার সঙ্গে প্রতারণা করব না।'

  এ ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে স্ট্যানলি লেন পোল বলেন—'বিষয়টি এমন দাঁড়াল যে, একজন মুসলিম সুলতান এক খ্রিষ্টান ধর্মযাজককে দয়া ও অনুগ্রহের পাঠদান করছেন।'

- প্রখ্যাত ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি (Philip Khuri Hitti) (মৃত্যু : ১৯৭৮ খ্রি.) শেষপর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন—'খ্রিষ্টান নাগরিকদের সঙ্গে সুলতান সালাহুদ্দিনের আচরণ ও ইতিপূর্বে আটাশি বছর ধরে মুসলমানদের সঙ্গে খ্রিষ্টানদের আচরণের মাঝে পার্থক্য পুরোপুরি দৃশ্যমান ও সুস্পষ্ট।'

অপরদিকে ৪৯২ হিজরি সনে (১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে) ক্রুসেডাররা আল-কুদস দখল করার পর কী আচরণ করেছিল?! তারা তখন নির্মম গণহত্যা চালিয়েছিল, এক দিনে হত্যা করেছিল সত্তর হাজার মুসলিম নাগরিককে। এ সম্পর্কে দুজন খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকের ভাষ্য দেখুন।

- তৎকালীন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উইলিয়াম সুরি (William of Tyre) বলেন, 'ক্রুসেডারদের প্রবেশকালে আল-কুদস নগরী এক ভয়াবহ

হত্যাযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করে। মুসলমানদের রক্তে নগরীটি রক্তপ্রান্তরে পরিণত হয়। নগরীজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে ভীতি ও আতঙ্ক।'[৯৪]

- সমসাময়িক আরেক খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন, বাইতুল মুকাদ্দাসে ক্রুসেডাররা নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালানোর পরের দিন সকালে তিনি যখন দর্শনার্থী হিসেবে সেখানে প্রবেশ করেন, তখন অনেক কষ্টে মুসলমানদের লাশের মধ্য দিয়ে রাস্তা পাড়ি দিতে সক্ষম হন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, নিহতদের রক্ত তার হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।[৯৫]

কত ব্যবধান ৪৯২ হিজরি ও ৫৮৩ হিজরি সনের মাঝে!

এটাই ইসলামের শিক্ষা। মুসলিম জাতিই পৃথিবীকে দান করেছে ন্যায় ও সুবিচার, সদাচরণ ও উদারতার শিক্ষা। আল্লাহ তাআলা দয়ার আচরণ করুন ওই মুসলিম কবির প্রতি, যিনি বলেছেন—

مَلَكْنَا فَكَانَ الْعَفْوُ مِنَّا سَجِيَّةً ❋ فَلَمَّا مَلَكْتُمْ سَالَ بِالدَّمِ أَبْطَحُ

وَحَلَّلْتُمُ قَتْلَ الْأُسَارَى وَطَالَمَا ❋ غَدَوْنَا عَلَى الْأَسْرَى نَعْفُوْ وَنَصْفَحُ

فَحَسْبُكُمُ هٰذَا التَّفَاوُتُ بَيْنَنَا ❋ وَكُلُّ إِنَاءٍ بِالَّذِيْ فِيْهِ يَنْضَحُ

আমরা যখন শাসন করেছি, সুবিচার ছিল আমাদের ভূষণ;
তোমরা যখন ক্ষমতা পেলে, বয়েছে রক্তের অবাধ প্রস্রবণ!

বন্দিহত্যা বৈধ-কর্ম এটাই বুঝি তোমাদের শিক্ষা; বন্দির
প্রতি ক্ষমা-অনুগ্রহ, এটাই মোদের ধর্মের দীক্ষা।

আচরণের এ পার্থক্যই পরিচয়-বৈশিষ্ট্য আমাদের-তোমাদের;
ব্যবহারেই বংশপরিচয়, ফল-ফসলে পরিচয় বৃক্ষের।

তৃতীয় ক্রুসেড

[৫৮৫-৫৮৮ হিজরি/১১৮৯-১১৯২ খ্রিষ্টাব্দ]

মুসলমানরা আল-কুদস পুনরুদ্ধার করার পর ইসলামি প্রাচ্যে ক্রুসেডারদের প্রতিপত্তি আরও সংকুচিত হয়ে পড়ে। তাদের হাতে থাকে এন্টিয়ক ও

---

[৯৪]. Guillaume de Tyr, 1, p. 354.
[৯৫]. Raymond d`Aigles, p. 300.

সুরের মতো গোটাকয়েক নগরী। এ সময় মুসলমানদের হাতে বিজিত প্রতিটি নগরী হতে ক্রুসেডাররা ধীরে ধীরে সুর নগরীতে আশ্রয় নিতে থাকে। একত্রিত হয়েই তারা সালাহুদ্দিনের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। সংগঠিত ক্রুসেড শক্তি এবার আক্কা অভিমুখে রওনা হয় এবং জল-স্থল উভয় দিক থেকে আক্কা অবরোধ করে। ৫৮৫ হিজরি সনের ৮ রজব (১১৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২ আগস্ট) থেকে শুরু হওয়া এ অবরোধ দুই বছর অব্যাহত থাকে।

সংবাদ পেয়ে মুসলিম বাহিনীও আক্কায় পৌঁছে ক্রুসেডারদের স্থলভাগে অবরুদ্ধ করে রাখে। সুলতান সালাহুদ্দিন নিজে তিল-কায়সানে (Tell Keisan) শিবির স্থাপন করেন। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে অনেকবার যুদ্ধ সংঘটিত হলেও কোনো পক্ষই নিরঙ্কুশ জয় অর্জন করতে পারেনি। এরইমধ্যে বেজে ওঠে তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধের দামামা।

ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ সালাহুদ্দিনের হাত থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে তৎকালীন পোপ ৮ম গ্রেগরি (Gregory VIII)-এর নির্দেশে তৃতীয় ক্রুসেড অভিযানের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এ অভিযানে খ্রিষ্টান বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল—

- জার্মানির রাজা ১ম ফ্রেডেরিক (Frederick Barbarossa)।
- ফরাসি রাজা ২য় ফিলিপ (Philip Augustus)।
- ইংল্যান্ডের রাজা 'সিংহহৃদয়' খ্যাত প্রথম রিচার্ড (Richard the Lionheart)।

ইউরোপের বিভিন্ন স্থান থেকে ক্রুসেডার বাহিনী ৫৮৫ হিজরি সনের রজব মাসে আক্কার উদ্দেশে রওনা হয়। জার্মানি থেকে প্রায় এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে রওনা হওয়ার পর রাজা ১ম ফ্রেডেরিক ৫৮৬ হিজরি সনের জুমাদাল উলা মাসে (১১৯০ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে) পথিমধ্যে ডুবে মারা গেলে তার নেতৃত্বাধীন জার্মান বাহিনীর সৈন্যরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং অধিকাংশই নিজ ভূখণ্ডে ফিরে যায়। অল্পকিছু সৈন্য আক্কায় পৌঁছায়।

অপরদিকে ২য় ফিলিপের নেতৃত্বাধীন ফরাসি বাহিনী ও ১ম রিচার্ডের নেতৃত্বাধীন ইংরেজ বাহিনী সিসিলিতে একত্রিত হয়। এরপর তারা নিজেরা

পরস্পরে বিরোধে জড়িয়ে পড়ায় দীর্ঘ সময় সিসিলিতেই অবস্থান করে। কিছুদিন পর ফরাসিরা সিসিলি ত্যাগ করে আক্কা অভিমুখে রওনা হয়।

ইংরেজরাও আক্কার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু পথিমধ্যে ঝড়ের কবলে পড়ে ইংরেজ নৌবহর সাইপ্রাস দ্বীপে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। সাইপ্রাস তখন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। সাইপ্রাসে অবতরণ করার পর রাজা রিচার্ড বাইজান্টাইনদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এবং সাইপ্রাস দখল করে সেখানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন। এরইমধ্যে বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক গাই রিচার্ডের কাছে দ্রুত ক্রুসেড অভিযানে যোগ দেওয়ার আবেদনবার্তা পাঠালে রিচার্ড সমুদ্রপথে আক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। অথচ এই গাইকে সুলতান সালাহুদ্দিন বন্দি করার পরও ক্ষমা করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফরাসি ও ইংরেজ বাহিনী আক্কায় পৌঁছে যাওয়ায় অবরোধকারী ক্রুসেডারদের মনোবল বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

৫৮৭ হিজরি সনের ১৭ জুমাদাল উখরা (১১৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জুলাই) শুক্রবার হঠাৎ করেই আক্কা নগরপ্রাচীরের শীর্ষদেশে ক্রুশচিহ্নিত পতাকা উড়তে থাকে। মুসলমানরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে এবং ক্রুসেডারদের বর্বর হামলার শিকার হয়। ষাট হাজার মুসলিম নাগরিকের প্রাণবিয়োগের পর আক্কার কর্তৃত্ব চলে যায় ক্রুসেডারদের হাতে।

আক্কা দখল করার পর ক্রুসেডার বাহিনীর সদস্যরা সেখানেই আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হয়ে যায় এবং দীর্ঘদিন সেখানেই কাটিয়ে দেয়। অথচ তারা বের হয়েছে 'পবিত্র ভূমি' বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে!

এদিকে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের রাজার মধ্যে নতুন করে শুরু হয় বিরোধ ও সংঘাত। এর পরিণতিতে ফরাসি রাজা ফিলিপ দেশে ফিরে যান। এরপর সালাহুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনী ও ১ম রিচার্ডের নেতৃত্বাধীন ক্রুসেডার বাহিনীর মাঝে একের পর এক রক্তক্ষয়ী লড়াই অব্যাহত থাকে। জয়-পরাজয়ের পাল্লা ছিল উভয়দিকেই দোদুল্যমান।

এসব যুদ্ধের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আরসুফের (Apollonia) যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ক্রুসেডাররা জয়ী হয়। ক্রুসেডারদের দৃষ্টিতে এ বিজয় ছিল হিত্তিনের যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ।

এরপর শুরু হয় ৫৮৮ হিজরি সন। ঐতিহাসিক ইবনে কাছির রহ.-এর বরাতে আমরা সে বছরের বিবরণ তুলে ধরছি—

বছরের শুরুতে সুলতান সালাহুদ্দিন আল-কুদসে তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। তিনি নগরপ্রাচীর নির্মাণের কাজ তার সন্তান ও সেনাপতিদের মাঝে ভাগ করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেও নির্মাণকাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন এবং ঘোড়ায় করে পাথর বহনের কাজ করেন। আলিম-উলামা ও কারিগণও প্রাচীর নির্মাণে কাজ করছিল। অভিশপ্ত ফিরিঙ্গিরা আসকালান ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দিক থেকে আল-কুদস দখলের চেষ্টা করলেও প্রহরীদের কারণে কাছে আসার সাহস করছিল না। তবে তারা আল-কুদস অবরোধ ও ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের বিষয়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিল। প্রহরীদের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই তাদের লড়াই হচ্ছিল এবং লড়াইতে কখনো মুসলিম প্রহরীরা, আবার কখনো ফিরিঙ্গিরা জয়ী হচ্ছিল।

৯ জুমাদাল উলা ফিরিঙ্গিরা দারুম দুর্গ দখল করে নেয়। তারা দুর্গের অভ্যন্তরে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, অসংখ্য নাগরিককে হত্যা করে এবং শিশুদেরকে বন্দি করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এরপর তারা একযোগে আল-কুদসের উদ্দেশে রওনা হয়। সুলতান মুসলমানদের নিয়ে তাদের প্রতিরোধে বের হন। উভয় দল মুখোমুখি হলে শয়তানের দল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। সুলতান আল-কুদসে ফিরে আসেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়—

﴿وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا﴾

> আর আল্লাহ কাফিরদেরকে তাদের ক্রোধ সহকারে এমন অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন যে, তারা কোনো সুফল অর্জন করতে পারল না। মুমিনদের পক্ষ হতে যুদ্ধের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। [সুরা আহযাব : ২৫]

এরপর ইংল্যান্ডের রাজা মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র অংশের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। সে ছিল তৎকালীন সবচেয়ে শক্তিশালী ফিরিঙ্গি শাসক। আল্লাহ তার প্রতি অভিসম্পাত করুন। সে মুসলমানদের ওপর রাতের আঁধারে হামলা চালায় এবং অনেক মুসলমানকে হত্যা করে। বন্দি হয় পাঁচশ মুসলমান। ফিরিঙ্গিরা উট, ঘোড়া ও খচ্চরসহ প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ

লাভ করে। উটের সংখ্যাই ছিল তিন হাজার। এর ফলে ফিরিঙ্গিদের সামরিক শক্তি আরও সমৃদ্ধ হয়। সুলতান এ সংবাদ জানতে পেরে অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং বন্দিদের পরিণাম নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। অর্জিত উট, ঘোড়া ও খচ্চরগুলো ইংরেজ বাহিনীর পশুচালকদের দায়িত্বে দিয়ে দেওয়া হয়। নতুন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ইংরেজরা এবার আল-কুদস অবরোধের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হয়। ইংরেজ রাজা উপকূলীয় খ্রিষ্টান অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে বার্তা পাঠিয়ে তাদেরকে অবরোধে অংশ নিতে আহ্বান জানালে সেখানকার যোদ্ধারা ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দেয়। সুলতান সালাহুদ্দিন তাদের প্রতিরোধে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি নগরপ্রাচীর নির্মাণ সম্পন্ন করেন, নগরীর চারপাশে গভীর পরিখা খনন করেন, প্রাচীরের ওপর মিনজানিক স্থাপন করেন এবং আল-কুদসের পার্শ্ববর্তী পানির উৎসগুলোর পানি সেচে ফেলার নির্দেশ দেন।

১৯ জুমাদাল উখরা শুক্রবার রাতে সুলতান তার সেনাপতিদের সমবেত করেন এবং এই আকস্মিক বেদনাদায়ক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ চান। প্রত্যেকে আপন আপন মত প্রকাশ করে। ইমাদ আল-কাতিব প্রস্তাব দেন—সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে শাহাদাতের বায়আত গ্রহণ করতেন, উপস্থিত সকলে সেভাবে কুব্বাতুস সাখরার কাছে গিয়ে শাহাদাতের বায়আত গ্রহণ করবে। সকলে তার প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। তখন বিভিন্নজন বিভিন্ন পরামর্শই দিচ্ছিলেন, আর সুলতান নির্বাক-চিন্তিত বসে ছিলেন। সুলতানকে গম্ভীর দেখে সবাই নীরব হয়ে যায়। মনে হচ্ছিল, তাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। কিছুক্ষণ পর সুলতান নীরবতা ভঙ্গ করে বলেন—

> সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। দুরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর। জেনে রেখো, তোমরা আজ ইসলামের সৈনিক ও প্রহরী। তোমরা জানো যে, মুসলমানদের জানমাল ও পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তা-দায়িত্ব তোমাদের ওপরই অর্পিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন এ সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আর তোমরা ব্যতীত অন্য কোনো মুসলিম রাষ্ট্র বা জনগোষ্ঠী এই শত্রুদের প্রতিরোধে অগ্রসর হবে না। আল্লাহ না করুন! তোমরা যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো, তাহলে এ ভূখণ্ড বেদখল হয়ে যাবে,

> মুসলিম জনসাধারণ ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হবে এবং মুসলমানদের সম্পদ ও স্ত্রী-সন্তানদের কেড়ে নেওয়া হবে। মসজিদগুলো থেকে কুরআন সরিয়ে ফেলে ক্রুশ স্থাপন করে পূজা শুরু হবে, নামাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। এ সবকিছুর হেফাজতের দায়িত্ব তোমাদেরই। তোমরাই এর দায়িত্ব গ্রহণ করেছ এবং মুসলমানদের নিরাপত্তাদান ও অসহায়-দুর্বলদের সহায়তা করার জন্য বাইতুল মাল হতে ভাতা গ্রহণ করেছ। সুতরাং, রাজ্যের সমস্ত মুসলমানদের নিরাপত্তা ও শান্তি তোমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ওয়াস সালাম।

সুলতানের বক্তব্য শেষ হলে সাইফুদ্দিন আল-মাশতুব দাঁড়িয়ে বলেন—

> হে আমাদের মনিব, আমরা আপনার অধীনস্থ ও আপনার গোলাম। আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমাদের মহান ও মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন। আমরা আপনার পূর্ণ অনুগতরূপে আপনার সম্মুখে উপস্থিত আছি। আল্লাহর শপথ! মৃত্যু পর্যন্ত আমরা সকলে আপনার সহায়তায় অবিচল থাকব।

সাইফুদ্দিনের বক্তব্য শেষ হলে উপস্থিত অন্যরাও অনুরূপ অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। সকলের বক্তব্য শুনে সুলতান আনন্দিত হন, তার হৃদয় প্রশান্ত হয়।

এরপর সকলে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে। পরে সুলতান জানতে পারেন যে, জনৈক গভর্নর বলেছেন, 'আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে, আমাদের পরিণতিও আক্কাবাসীর মতো হবে। এরপর ফিরিঙ্গিরা একের পর এক অন্যান্য ইসলামি অঞ্চলগুলোও দখল করে নেবে। আমার মতে এটাই কল্যাণকর হবে যে, আমরা নগরীর বাইরে গিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। যদি আমরা তাদের পরাজিত করতে পারি, তাহলে তাদের হাত থেকে অন্যান্য অঞ্চলও পুনরুদ্ধার করতে পারব। আর ফলাফল যদি এর বিপরীত হয়, তবুও সেনাবাহিনী নিরাপদে থাকবে। তখন শত্রুপক্ষ আল-কুদস দখল করে নিলেও অন্যান্য ইসলামি অঞ্চল দীর্ঘকাল নিরাপদ থাকবে।'

এরপর গভর্নর ও সেনাপতিগণ সুলতানকে অনুরোধ করে বলে, 'আপনি যদি চান যে, আমরা ফিরিঙ্গিদের অবরোধের মাঝে আল-কুদসেই অবস্থান

করব, তাহলে অনুগ্রহ করে আপনি বা আপনার পরিবারস্থ কেউ আমাদের সঙ্গে থাকুন। তাহলে পুরো বাহিনী আপনার নির্দেশনা মেনে চলবে। কারণ, (আপনার অনুপস্থিতিতে) কুর্দিরা তুর্কিদের মানে না, তুর্কিরাও কুর্দিদের অমান্য করে।'

গভর্নরদের অনুরোধ-বার্তা পেয়ে সুলতান অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং সেদিন সারা রাত করণীয় নির্ধারণে চিন্তাভাবনায় কাটিয়ে দেন। অবশেষে সুলতান সিদ্ধান্ত নেন যে, বালাবাক্কু অঞ্চলের প্রশাসক (সুলতান সালাহুদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র বাহরাম শাহ) তার নায়েব হিসেবে আল-কুদসে অবস্থান করবেন।

সেদিন ছিল শুক্রবার। সুলতান জুমার নামাজ আদায়ে উপস্থিত হওয়ার পর মুয়াজ্জিন আজান দিলে তিনি দুই আজানের মাঝে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন। এরপর তিনি সিজদাবনত হয়ে কায়মনোবাক্যে আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া ও কাকুতিমিনতি করতে থাকেন। সুলতান আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করে এই সংকট হতে মুক্তি প্রার্থনা করেন।

পরদিন শনিবার নগরীর নিরাপত্তারক্ষীরা পত্র মারফত সুলতানকে জানায় যে, শত্রুপক্ষ নিজেদের মধ্যে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছে। ফ্রান্সের রাজা চাচ্ছে অবরোধ অব্যাহত রেখে আল-কুদস জয় করতে আর ইংরেজরা চাচ্ছে ফিরে যেতে। ফ্রান্স-অধিপতির বক্তব্য হলো—আমরা বহুদূর থেকে প্রচুর সম্পদ খরচ করে এ পর্যন্ত এসেছি বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করার জন্য। লক্ষ্য পূরণের আর মাত্র একটি ধাপ বাকি আছে। তাই আমরা তা পূরণ করবই। অপরদিকে ইংরেজরা বলছে—এই নগরী অবরোধ করা আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, নগরীর আশপাশের পানির উৎসগুলো ফুরিয়ে গেছে। দীর্ঘ কষ্টের পর যতদিনে আমাদের কাছে পানি পৌঁছবে, ততদিনে কেবল অবরোধপ্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে না; সৈন্যদের প্রাণও ওষ্ঠাগত হয়ে পড়বে।

এরপর ফরাসি-ইংরেজ উভয় পক্ষ এ মর্মে একমত হয় যে, তারা করণীয় নির্ধারণের জন্য নিজেদের মধ্য থেকে তিনশজন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করবে। এরপর সেই তিনশজন তাদের মধ্য হতে বারোজনকে বাছাই করবে। বারোজন আবার নিজেদের মধ্য হতে তিনজনকে চূড়ান্ত

মীমাংসাকারী হিসেবে নির্বাচিত করবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনজন নির্বাচিত হওয়ার পর তারা সারা রাত করণীয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এবং পরদিন সকালে জানিয়ে দেয় যে, তারা চিন্তাভাবনা করার পর সকলের প্রস্থানের বিষয়ে একমত হয়েছে। কারও পক্ষে এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা সম্ভব হয়নি। সকলে বিফল মনোরথে প্রত্যাবর্তনের পথ ধরে। আল্লাহ তাদের সকলের ওপর অভিসম্পাত করুন। খ্রিষ্টান বাহিনী জুমাদাল উখরা মাসের একুশ তারিখ সকালে পথিমধ্যে রামলায় অবতরণ করে। নিজেদের ভূখণ্ড ও পরিবার-পরিজন হতে দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদে তারা অস্থির হয়ে পড়েছিল।

সুলতান সালাহুদ্দিন আশঙ্কা করছিলেন যে, প্রচুর বাহন ও সম্পদের শক্তিতে বলীয়ান খ্রিষ্টান বাহিনী মিশরে হামলা করতে পারে। তাই তিনি তার বাহিনী নিয়ে খ্রিষ্টান বাহিনীর উদ্দেশে বের হন। ইংরেজরাও মিশরের প্রতি প্রচণ্ড লালায়িত ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে নিষ্ফল করে দেন।

সুলতানের বাহিনীর আগমন সংবাদ পেয়ে ইংরেজরা নিরাপত্তাপ্রার্থনা করে সন্ধি করার উদ্দেশ্যে একের পর এক কয়েকজন দূত সুলতানের কাছে প্রেরণ করে। তাদের সন্ধিপ্রস্তাবে উল্লেখ ছিল—তিন বছর উভয় পক্ষ যুদ্ধবিরতি মেনে চলবে, আসকালানের অধিকার তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে, বাইতুল মুকাদ্দাসের আল-কিয়ামা গির্জা (The Church of the Holy Sepulchre) তাদেরকে দান করতে হবে এবং কোনোপ্রকার বিনিময় ব্যতিরেকে খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদেরকে আল-কিয়ামা গির্জা পরিদর্শন ও তীর্থযাত্রার সুযোগ দিতে হবে। সুলতান আল-কিয়ামা গির্জা তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে সম্মত হলেও আসকালান ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং তীর্থযাত্রীদের ওপর যৎসামান্য মাশুল ধার্যের কথা বলেন। কিন্তু ইংরেজরা দাবি জানায় যে, মুসলমানরা যদি আসকালানের নিরাপত্তাপ্রাচীর পুনর্নির্মাণ করে তার নিয়ন্ত্রণ ইংরেজদের বুঝিয়ে না দেয়, তাহলে তারা সন্ধি করবে না। ফলে সুলতানও তাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি না করার সিদ্ধান্ত নেন।

এরপর সুলতান সালাহুদ্দিন জাফা পৌঁছে কঠিন অবরোধ আরোপ করেন এবং জাফা জয় করেন। ফিরিঙ্গিদের আবেদনের কারণে তাদের ছোট-বড় সকলকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। এরইমধ্যে সমুদ্রপথে সামরিক সহায়তা চলে আসায় ইংরেজ বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলিম বাহিনীর ওপর হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত

নেয়। অভিশপ্ত ইংরেজ রাজা আক্রমণ চালিয়ে জাফা পুনরুদ্ধার করে। যেসব মুসলমান পেছনে পড়ে গিয়েছিল, তাদেরকে বন্দি করে ইংরেজ রাজার সামনে হত্যা করা হয়। ইংরেজ বাহিনীর হামলার আশঙ্কায় সুলতান তার বাহিনী নিয়ে অবরোধস্থল থেকে পিছিয়ে যান। ইংরেজ রাজা যদিও জাফা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়; কিন্তু সে অবাক বিস্ময়ে ভাবতে থাকে—সুলতান কীভাবে মাত্র দু-দিনের অবরোধেই এই বিশাল নগরীটি জয় করে ফেললেন! অন্য কোনো সামরিক শক্তি তো দুই বছরেও তা জয় করতে পারবে না। রাজা তো কল্পনাও করেননি যে, অসামান্য বীরত্ব ও দূরদর্শিতার অধিকারী এই সুলতান শুধু তার আগমনের কারণেই অবরোধস্থল থেকে পিছিয়ে যাবেন। অথচ তিনি ও তার সৈন্যরা তো নৌবহর থেকে বিনা অস্ত্রে বেরিয়েছিলেন!

এরপর ইংরেজ রাজা পুনরায় সন্ধিচুক্তির আবেদন জানায় এবং আসকালানকে চুক্তির আওতায় রাখার অনুরোধ করে। সুলতান এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর সে রাতেই সুলতান সতেরোজন অশ্বারোহী যোদ্ধা ও অল্প কয়েকজন পদাতিক সৈন্য নিয়ে ইংরেজ শিবিরের দিকে অগ্রসর হন এবং ইংরেজ রাজাকে অবরুদ্ধ করে ফেলেন। এ সময় যদি মুসলিম বাহিনীর সৈন্যরা অটল-অবিচল থাকত, তাহলে ইংরেজ রাজার বাঁচার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু মুসলিম সৈন্যরা প্রতিপক্ষের ওপর হামলা চালাতে অস্বীকৃতি জানায়। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! সুলতান তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। কিন্তু কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে তিক্ত ওষুধ সেবনের অনুরোধ করা হলে যেভাবে সে অস্বীকৃতি জানায়, সকলে তেমনই সুলতানের নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিল।

ওদিকে ইংরেজ রাজা তার সৈন্যদের নিয়ে আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। সে মুসলিম বাহিনীর ডানবাহু ও বামবাহুকে যুদ্ধের আহ্বান জানায়। কিন্তু একজন বীর যোদ্ধা বা সাহসী সৈনিকও প্রতিপক্ষের আহ্বান গ্রহণ করে লড়াই করতে অগ্রসর হয়নি। অবস্থাদৃষ্টে ব্যথিত-চিত্ত সুলতান প্রস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সৈন্যদের এরূপ অবাধ্যতায় তিনি প্রচণ্ড মনঃক্ষুণ্ন হন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সুলতান পারলে এসব অবাধ্য সৈন্যদের একজনকেও বাইতুল মাল থেকে এক পয়সা ভাতা নিতে দিতেন না।

এরইমাঝে ইংল্যান্ডের রাজা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। অসুস্থ ইংরেজ রাজা মুসলিম সুলতানের কাছে ফলমূল ও বরফ চেয়ে বার্তা পাঠালে সুলতান উদারচিত্তে তার চাওয়া পূরণ করেন। অল্প কদিনের মধ্যেই সে সুস্থ হয়ে ওঠে। সুস্থ হওয়ার পরই পরিবার-পরিজন ও মাতৃভূমির বিরহে অস্থির হয়ে ওঠা ইংরেজ রাজা বারবার দূত পাঠিয়ে সুলতানকে সমঝোতাচুক্তি করার অনুরোধ জানায় এবং আসকালানের দাবি ছেড়ে দিয়ে সুলতানের দাবিমতো চুক্তি করতেই সম্মতি জানায়। সতেরো শাবান উভয় পক্ষের মাঝে সন্ধিচুক্তি লিপিবদ্ধ হয়। খ্রিষ্টান রাজন্যবর্গ চুক্তিরক্ষার দৃঢ় অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে, মুসলিম প্রশাসক ও আমিরগণও চুক্তিরক্ষার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে সম্মতিপত্র লিপিবদ্ধ করে। সুলতানদের রীতি অনুযায়ী সুলতান সালাহুদ্দিন লিখিত অঙ্গীকারের পরিবর্তে কেবল মৌখিক সম্মতি প্রদান করেন। সমঝোতা সম্পন্ন হওয়ায় উভয় পক্ষই বেশ আনন্দিত হয় এবং আনন্দ ও স্বস্তি প্রকাশ করে। সুলতান আল-কুদসে ফিরে এসে নগরীর নিরাপত্তাব্যবস্থা ও অন্যান্য নাগরিক ব্যবস্থাপনা আরও সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত করার প্রতি মনোযোগ দেন। সুলতান এ বছরই হজ আদায়ের মনস্থ করেন এবং নিজের ইচ্ছার কথা জানিয়ে হিজায, ইয়ামেন, মিশর ও শাম অঞ্চলে বার্তা প্রেরণ করে এ জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ প্রদান করেন।

সুলতানের মনোবাঞ্ছা জানতে পেরে কাজি ফাযিল[৯৬] বার্তা পাঠিয়ে তাকে এ সময় হজে যেতে বারণ করেন। তিনি লেখেন—আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, আপনার অনুপস্থিতির সুযোগে ফিরিঙ্গিরা আমাদের রাজ্য দখল করে নিতে পারে, রাজ্যজুড়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা, অন্যায়-অত্যাচার এবং জনগণ ও সেনাদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। সৈন্যগণের মাঝে কল্যাণকামিতার অভাব রয়েছে। তাই এ বছর হজ আদায়ের পরিবর্তে

---

৯৬. মূল নাম আবদুর রহিম বায়সানি। 'কাজি ফাযিল' নামে ইতিহাসে খ্যাত। তিনি ছিলেন সমকালীন শ্রেষ্ঠতম লেখক ও সাহিত্যিক। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি তাকে আপন উজির ও উপদেষ্টা নিযুক্ত করেছিলেন। সালাহুদ্দিন আইয়ুবি তার সম্পর্কে মন্তব্য করেন—'তোমরা এ কথা ভেবো না যে, আমি সৈন্যবলে ও তোমাদের তরবারির জোরে রাজ্য বিস্তৃত করি; আমি তো রাজ্য জয় করি কাজি ফাযিলের কলমের মাধ্যমে।' কাজি ফাযিলের জন্ম ৫২৯ হিজরি সনে (১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দে) ঐতিহাসিক ফিলিস্তিনের আসকালানে আর মৃত্যু ৫৯৬ হিজরি সনে (১২০০ খ্রিষ্টাব্দে) কায়রোতে।

মুসলমানদের রক্ষণাবেক্ষণে কাজ করা আপনার জন্য কল্যাণকর হবে। শত্রুপক্ষ এখনো শামে অবস্থান করছে। আপনি জানেন যে, তারা মূলত শক্তি সঞ্চয় ও জনবলে আরও সমৃদ্ধ হওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্যই আপাতত সমঝোতা করেছে। কিছুদিন পরই তারা প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

কাজি ফাযিলের বার্তা পেয়ে সুলতান তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং এ বছর হজ আদায়ের সংকল্প ত্যাগ করে তা সবাইকে জানিয়ে দেন। এরপর তিনি পুরো রমজান মাস আল-কুদসেই অবস্থান করে সিয়াম, সালাত ও কুরআন তিলাওয়াতে কাটিয়ে দেন। যখনই কোনো ফিরিঙ্গি শাসক-প্রশাসক আল-কুদস ভ্রমণে আসত, সুলতান তাদের সর্বোচ্চ আতিথেয়তা প্রদান করতেন। প্রতিটি খ্রিষ্টরাজ্যের রাজন্যবর্গ ছদ্মবেশে আল-কিয়ামা গির্জা পরিদর্শনে আগমন করত এবং পরিচয় গোপন রেখে সুলতানের দস্তরখানে উপস্থিত সবার সঙ্গে শরিক হতো।

সুলতান এসব বিস্তারিত জানতেন না। তাই তিনি তাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মানমূলক আচরণ করতেন এবং সদাচরণ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করতেন।[৯৭]

এভাবেই উভয় পক্ষের মাঝে 'রামলা চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধারা হলো—

- ক্রুসেডাররা সুর (Tyre) থেকে হাইফা (Haifa) পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাস করতে পারবে।
- কোনোপ্রকার 'দর্শনার্থী মাশুল' প্রদান ছাড়াই খ্রিষ্টানরা আল-কুদসে ভ্রমণ করতে পারবে।
- আগামী তিন বছর আট মাস উভয় পক্ষের মাঝে শান্তি অবস্থা বিরাজমান থাকবে।

এই চুক্তি সম্পাদনের কারণে ইংরেজ রাজা ১ম রিচার্ড ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। চুক্তি সম্পাদনের কিছুদিন পরই তিনি শামের উপকূলীয় অঞ্চল ত্যাগ করে নিজ দেশে ফিরে যান।

---

৯৭. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১২/৩২২-৩২৫।

এভাবেই দীর্ঘ পাঁচ বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, অসংখ্য প্রাণহানি ও বিভিন্ন নগরী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হওয়ার পর তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধে জার্মানি হারায় তাদের রাজাকে, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড হারায় তাদের নির্বাচিত ও সুদক্ষ অনেক সৈনিক ও সেনাপতিকে। যদিও সম্মিলিত ক্রুসেডার বাহিনী বাইতুল মুকাদ্দাসসহ শামের বিভিন্ন অঞ্চল জয়ের স্বপ্ন নিয়ে অভিযানে বের হয়েছিল; কিন্তু তাদের চেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। এ অভিযানে তারা কেবল আক্কা অধিকার করতে সক্ষম হয়। তৃতীয় ক্রুসেড অভিযানে ইউরোপিয়ান বাহিনী যে পরিমাণ ভোগান্তি ও ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে, কোনোকিছুর বিনিময়েই তার প্রতিকারবিধান সম্ভব ছিল না। অপরদিকে সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ.-এর দিক থেকে বিবেচনা করলে বলতে হয়, আরসুফ ও জাফার যুদ্ধে প্রচুর সৈন্যক্ষয় এবং শাম অঞ্চলের প্রশাসকদের অসহযোগিতার কারণে তিনি কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হন এবং যেকোনো মূল্যে আল-কুদসের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে উপকূলীয় অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

এরপর সুলতান সালাহুদ্দিনের সুশাসনে জনসাধারণ নিরাপদে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। তার উদার আচরণের কারণে বাইতুল মুকাদ্দাসে খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের আগমনের হারও প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়। ইংল্যান্ড অধিপতি ১ম রিচার্ড অধিক হারে তীর্থযাত্রীদের আগমনে সুলতান সালাহুদ্দিনের ক্রুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা করে সুলতানের কাছে বার্তা প্রেরণ করেন যে, তিনি যেন বাইতুল মুকাদ্দাসে তীর্থযাত্রীদের অবাধ প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন এবং রাজা রিচার্ডের লিখিত পত্র বা নিদর্শন ছাড়া কাউকে সেখানে প্রবেশের অনুমতি না দেন। কিন্তু সুলতান এ প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়ে প্রত্যুত্তরে লেখেন, তারা এত দূর থেকে এই পবিত্র স্থান পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে এসে পৌঁছেছে। আমি তাদের বাধাদান মোটেও বৈধ মনে করি না।

এর কিছুদিন পরই মহান সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বারো দিন অসুস্থ থাকার পর ৫৮৯ হিজরি সনের ২৭ সফর (১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মার্চ) বুধবার তার বিদেহী আত্মা পরম প্রভুর সান্নিধ্যে গমন করে। সুলতান সালাহুদ্দিনের বিদায়ের দিন ছিল খোলাফায়ে রাশিদিন-পরবর্তী সময়ে ইসলাম ও মুসলিম জাতির জন্য সবচেয়ে দুর্যোগপূর্ণ দিন।

বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারকারী এই মহান মুসলিম বীর যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তার ব্যক্তিগত সঞ্চয়ে ছিল মাত্র সাতচল্লিশটি দিরহাম এবং একটি দিনার! এ ছাড়া অন্য কোনো স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ তার ছিল না।

তার মৃত্যুর সময় মানুষ মনে করেছিল যে, তিনি তার লালিত স্বপ্ন 'মসজিদুল আকসা মুক্তকরণ' পূর্ণ করেই মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা ছিল আরও অনেক উচ্চ ও বিস্তৃত। তিনি একদিন আপন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'আমার তামান্না হলো—আল্লাহ তাআলা যখন অবশিষ্ট উপকূলীয় অঞ্চলও জয় করা সহজ করে দেবেন, তখন আমি পুরো রাজ্যকে সুবিন্যস্তরূপে বণ্টন করে প্রশাসকদের হাতে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবো আর নিজে সমুদ্রপৃষ্ঠ পাড়ি দিয়ে দ্বীপে-দ্বীপে অভিযান চালিয়ে কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করব। এরইমধ্যে হয়তো আমার ডাক এসে যাবে কিংবা আল্লাহর জমিনে কোনো কাফির-অস্বীকারকারী বাকি রাখব না।'

সুলতান সালাহুদ্দিনের ইন্তেকালের পর তার পুত্র আল-আজিজ ইমাদুদ্দিন শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন। কিন্তু শুরুতেই তিনি তার ভাই দামেশকের প্রশাসক আফজালের সঙ্গে বিরোধ ও লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন। দু-ভাইয়ের সংঘাতের সমাপ্তি ঘটে আফজালকে দামেশক থেকে নির্বাসিত করার মাধ্যমে। দামেশকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সালাহুদ্দিনের ভাই ও জাযিরার প্রশাসক আল-আদিল সাইফুদ্দিন মুহাম্মাদ। সাইফুদ্দিন অত্যন্ত দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ শাসক ছিলেন। দামেশকের অভ্যন্তরীণ সমস্যাদি দমন করার পর শামের সকল অঞ্চল তার বশীভূত হয়ে যায়।

৫৯৫ হিজরি সনে (১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দে) আল-আজিজ ইমাদুদ্দিন ইন্তেকাল করেন। তখন তার চাচা সাইফুদ্দিন মিশরে এসে সালাহুদ্দিনের অপর দুই পুত্রকে পরাভূত করেন এবং নতুন শাসক (আল-আজিজ ইমাদুদ্দিনের পুত্র) মানসুর বিন আল-আজিজকে বরখাস্ত করে মিশরের শাসনভার গ্রহণ করেন। তখন মানসুরের বয়স ছিল মাত্র নয় বছর। ৫৯৬ হিজরি সনের মধ্যে সালাহুদ্দিনের রাষ্ট্রের অধিকাংশ অঞ্চল আল-আদিল সাইফুদ্দিনের আয়ত্তে চলে আসে। তার শাসনাধীন মিশর রাষ্ট্র পরিণত হয় সমকালীন বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্রে।

৫৯৭ হিজরিতে মিশরে প্রথমে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এবং তারপর ব্যাপক মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে মিশরের পরিস্থিতি বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু এর মাঝেও সুলতান আল-আদিল রাষ্ট্রের ভিত্তি মজবুতকরণে সামান্য ছাড় না দিয়ে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার এবং ক্রুসেডারদের দমনে একক শক্তিতে পরিণত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

৫৯৩ হিজরি সনে সুলতান আল-আদিল সাইফুদ্দিন যখন শাম অঞ্চলে রাষ্ট্রের ভিত্তি মজবুতকরণে ব্যস্ত ছিলেন, তখন ক্রুসেডাররা জার্মানির সামরিক সহায়তা লাভ করে। মুসলমানদের পারস্পরিক বিভেদের সুযোগ নিয়ে তারা এ সময় আবারও বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে। ক্রুসেডার বাহিনী যুদ্ধে সাইফুদ্দিনকে পরাজিত করে তার কাছ থেকে বৈরুতের নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু এরপরই তারা নিজেদের মধ্যে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। আল-আদিল সাইফুদ্দিন জাফা ও রামলা ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে তাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেন। তার ধারণা ছিল—এর ফলে তিনি তার অবস্থান সুদৃঢ় করার সুযোগ লাভ করবেন।

চতুর্থ ক্রুসেড

[৫৯৯-৬০০ হিজরি/১২০২-১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ]

সুলতান সালাহুদ্দিনের মৃত্যুর পরই তার কাছে হৃত ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে খ্রিষ্টানদের প্রধান ধর্মীয় গুরু পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট (Innocent III) ইউরোপে নতুন ক্রুসেডের ডাক দেন।

এবারের অভিযানে নেতৃত্ব প্রদান করে ফ্রান্সের আঞ্চলিক রাজন্যবর্গ। তারা ফ্রান্স থেকে প্রথমে মিশরে অভিযান পরিচালনার, এরপর বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

কিন্তু এরইমধ্যে কনস্টান্টিনোপলে বাইজান্টাইন সম্রাট ২য় ইসহাক (Isaac II Angelos) তার বিরুদ্ধে পরিচালিত এক বিদ্রোহে ক্ষমতাচ্যুত হন এবং তার পুত্র ৪র্থ অ্যালেক্সিয়াস (Alexius IV Angelus) পালিয়ে পশ্চিম ইউরোপে এসে পোপ ও ক্রুসেডারদের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করেন। বিনিময়ে তিনি পূর্ব ইউরোপের অর্থোডক্স চার্চকে পোপের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেওয়ার এবং ক্রুসেডারদের মিশর অভিযানে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য কর্তৃক সামরিক সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন।

ফলে সংগঠিত ক্রুসেড শক্তি নিজেদের লক্ষ্যপথ পরিবর্তন করে এবার কনস্টান্টিনোপল অভিমুখী হয়। ক্রুসেডাররা কনস্টান্টিনোপলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সেখানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। পরিস্থিতি এত শোচনীয় হয়ে পড়ে যে, অনেক বাইজান্টাইন নাগরিক তখন মনে-প্রাণে কামনা করছিল—হায়! এর পরিবর্তে যদি কনস্টান্টিনোপল মুসলমানদের কর্তৃত্বে চলে যেত! ক্রুসেডাররা বিভিন্ন গির্জা ও উমাইয়া শাসনামলে নির্মিত প্রাচীন মসজিদটি জ্বালিয়ে দেয় এবং নগরীজুড়ে ব্যাপক লুটতরাজ চালায়। ক্রুসেডারদের আগ্রাসনের কারণে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

এই অভিযানের ফলে (বিভক্ত হওয়ার পর) প্রথমবারের মতো প্রাচ্যকেন্দ্রিক অর্থোডক্স চার্চ পশ্চিমা ক্যাথলিক চার্চের বশীভূত হয়ে পড়ে। এরপর ক্রুসেড যোদ্ধাদের যুদ্ধস্পৃহায় ভাটা সৃষ্টি হয় এবং মিশর ও বাইতুল মুকাদ্দাস অভিযানের চিন্তা বাতিল হয়ে যায়। খ্রিষ্টানদের এই পূর্ব-পশ্চিমের ব্যাপক সংঘাত শামের স্থলপথকে অত্যন্ত দুর্গম ও বিপজ্জনক করে তোলে।

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে গবেষণাকারী জনৈক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন—

> নিঃসন্দেহে চতুর্থ ক্রুসেড অভিযান ছিল এ বিষয়ের সুস্পষ্ট সতর্কবার্তা যে, পুরো ক্রুসেড পরিকল্পনাটাই একটি ব্যর্থ পরিকল্পনা।

পঞ্চম ক্রুসেড

[৬১০-৬১৮ হিজরি/১২১৩-১২২১ খ্রিষ্টাব্দ]

৬১০ হিজরি সনে (১২১৩ খ্রিষ্টাব্দে) পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট পঞ্চম ক্রুসেড অভিযানের ডাক দেন। চতুর্থ অভিযানের মতো এবারও লক্ষ্য ছিল আইয়ুবি রাষ্ট্রকে পরাভূত করে আল-কুদস পুনর্দখল করা। পোপের নির্দেশে পরবর্তী দু-বছর ক্যাথলিক ইউরোপজুড়ে ক্রুসেড অভিযানের প্রচারণা চালানো হয়। ৬১২ হিজরি সনের রজব মাসে (১২১৫ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে) রোমে পোপের নেতৃত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং পুরো অভিযানের রূপরেখা চূড়ান্ত করার পাশাপাশি অভিযানে রওনা হওয়ার সময় নির্ধারণ করা হয় ১২১৭ খ্রিষ্টাব্দ।

পঞ্চম ক্রুসেডে যেসব ইউরোপিয়ান শাসকগণ নেতৃত্ব দিয়েছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলো—

- ডিউক অব অস্ট্রিয়া ৬ষ্ঠ লিওপোল্ড (Leopold VI)।
- হাঙ্গেরির রাজা ২য় অ্যান্ড্রু (Andrew II)।
- সাইপ্রাসের শাসক ১ম হিয়ো (Hugh I)।
- কাউন্ট অব ত্রিপোলি ৪র্থ বোহেমন্ড (Bohemond IV of Antioch)।

অবশ্য অভিযান শুরু হওয়ার পূর্বেই ৬১৩ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসে (১২১৬ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে) পোপ ৩য় ইনোসেন্ট ইহধাম ত্যাগ করেন। আর অভিযান শুরু হতে না হতেই হাঙ্গেরির রাজা ২য় অ্যান্ড্রু নিজ দেশে ফিরে যান।

ক্রুসেডাররা মিশরে পৌঁছার পূর্বেই ৬১৫ হিজরি সনে (১২১৮ খ্রিষ্টাব্দে) সুলতান আল-আদিল সাইফুদ্দিন মাহমুদ মৃত্যুবরণ করেন। এরপর আইয়ুবি রাষ্ট্রের হাল ধরেন তার পুত্র আল-কামিল মুহাম্মাদ।

ক্রুসেডার বাহিনী মিশর অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং তুমুল লড়াইয়ের পর ১২১৯ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে দিমইয়াত দখল করে নেয়। আল-কামিল দিনরাত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখলেও তাদেরকে দিমইয়াত থেকে সরাতে ব্যর্থ হন। বাধ্য হয়ে তিনি ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দকে দিমইয়াত ত্যাগের বিনিময়ে প্রলুব্ধকর সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব দেন। কিন্তু নিজেদের সামরিক শক্তি ও সংখ্যাধিক্যের গর্বে অন্ধ ক্রুসেড শক্তি সরাসরি সন্ধিপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং কায়রো অভিমুখে অগ্রসর হয়।

ক্রুসেডার বাহিনী তিনদিক থেকে জলভাগ দ্বারা বেষ্টিত একটি এলাকা দিয়ে কায়রোর দিকে অগ্রসর হয়। এলাকাটি পূর্ব দিক থেকে মানজালা হ্রদ (Lake Manzala), পশ্চিম দিক থেকে দিমইয়াত (শাখা) নদী এবং দক্ষিণ দিক থেকে আল-বাহরুস সাগির দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ইসলামি নৌবহর তাদের প্রতিরোধের জন্য নীলনদে অবস্থান নিয়েছিল।

নীলনদে তখন ভরা জোয়ার চলছিল। মুসলমানরা নদীর বিভিন্ন বাধ কেটে দিলে উক্ত এলাকা পানিতে ডুবে যায় এবং ক্রুসেডারদের সামনে গমনের পথ বন্ধ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে তারা দিমইয়াতে ফিরে যেতে উদ্যত হয়। কিন্তু দিমইয়াতে প্রত্যাবর্তনের একমাত্র সংকীর্ণ পথটিতে আল-কামিল তার

সৈন্যদের মোতায়েন করে রেখেছিলেন। আল-কামিলের সৈন্যরা এবার ক্রুসেডারদের পথ আগলে দাঁড়ায়।

অবরুদ্ধ ও কোণঠাসা ক্রুসেডাররা এবার নিজেরাই সন্ধিচুক্তির আবেদন জানায়। আল-কামিল এই শর্তে তাদের সঙ্গে চুক্তি করতে সম্মত হন যে, তারা দিমইয়াত অঞ্চল মুসলমানদের কাছে সমর্পণের প্রতিশ্রুতি পূরণে বাধ্য হওয়ার জন্য আপাতত কয়েকজন খ্রিষ্টান রাজন্যকে জামানতস্বরূপ আল-কামিলের হাতে তুলে দেবে। অবশেষে ৬১৮ হিজরি সনের রজব (১২২১ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট) মাসে ক্রুসেডাররা দিমইয়াত ত্যাগ করে। আল্লাহর অনুগ্রহে আল-কামিল দিমইয়াতে প্রবেশ করেন। এভাবেই ইউরোপের খ্রিষ্টানশক্তির পঞ্চম ক্রুসেড অভিযানও পুরোপুরি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ষষ্ঠ ক্রুসেড

[৬২৫-৬২৬ হিজরি/১২২৮-১২২৯ খ্রিষ্টাব্দ]

৬২৫ হিজরি সনে (১২২৮ খ্রিষ্টাব্দে) জার্মানির রাজা ২য় ফ্রেডেরিক (Frederick II) খ্রিষ্টরাজ্য বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসনক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনার মনস্থ করেন। ইউরোপীয় সম্মিলিত বাহিনী তার সঙ্গে এ অভিযানে যোগ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ফ্রেডেরিকের সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বেচ্ছাচারিতার কারণে পোপ ও অন্যান্য অঞ্চলের খ্রিষ্টান রাজন্যবর্গ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয় এবং তার সঙ্গে অভিযানে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে ফ্রেডেরিক একাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

অন্যান্য খ্রিষ্টান রাজার তুলনায় ফ্রেডেরিকের মাঝে গোঁড়ামি কম থাকায় পোপ মনে করতেন যে, ফ্রেডেরিক বোধহয় মুসলমানই হয়ে গেছে! ফ্রেডেরিক মুসলমানদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করতেন।

আইয়ুবি রাষ্ট্র তখন ভেতর-বাহির উভয় দিক থেকেই হুমকির সম্মুখীন ছিল। একদিকে সুলতান আল-কামিলের সঙ্গে তার ভাই মুআযযাম ও আশরাফের প্রচণ্ড বিরোধ চলছিল এবং একে কেন্দ্র করে পারস্পরিক লড়াইয়ের উপক্রম হয়েছিল, অপরদিকে বাইরে থেকে খোয়ারিজমিরাও আইয়ুবি সাম্রাজ্যের ঘাড়ে তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছিল। চেঙ্গিস খানের আগ্রাসনে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়া খোয়ারিজমিরা তখন ইস্পাহানে

সমবেত হয়ে শক্তি সঞ্চয়ে সচেষ্ট ছিল এবং ধীরে ধীরে শাম ও ইরাকের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। দ্বিমুখী চাপে অস্থিরপ্রায় আইয়ুবি সুলতান আল-কামিল যখন জানতে পারেন যে, নতুন বিপদরূপে জার্মানির রাজা ফ্রেডেরিক আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন, তখন তিনি ফ্রেডেরিকের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেন। চুক্তির শর্তের মধ্যে ছিল—আল-কামিল আল-কুদস, (তীর্থযাত্রীদের যাত্রাপথে অবস্থিত) আক্কা ও জাফার নিয়ন্ত্রণ ফ্রেডেরিকের হাতে ছেড়ে দেবেন এবং বন্দি ফিরিঙ্গিদের মুক্তি দেবেন। অপরদিকে আল-কামিল যখন যেকোনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন, হোক সে খ্রিষ্টান, ফ্রেডেরিক তখন কামিলকে সহায়তা করবেন এবং পরবর্তী সাড়ে দশ বছর শামে অন্যান্য ক্রুসেড শাসকের কাছে কোনো ধরনের সামরিক সাহায্য পৌঁছতে বাধা প্রদান করবেন। এভাবে জার্মান রাজা ফ্রেডেরিক বিনা যুদ্ধেই আল-কুদসের কর্তৃত্ব লাভ করেন। নিঃসন্দেহে এটি ছিল আইয়ুবি সুলতান আল-কামিলের জীবনের অন্যতম গর্হিত অন্যায়। তার এই নির্বুদ্ধিতার কারণে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি কর্তৃক পুনরুদ্ধারের মাত্র বিয়াল্লিশ বছর পর মুসলমানরা আবারও আল-কুদসের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

ফ্রেডেরিকের সঙ্গে সমঝোতা করার পর সুলতান আল-কামিল এবার তার পূর্ণ শক্তি ব্যয় করেন নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে তাদের শাসনাধীন অঞ্চল কেড়ে নেওয়ার কাজে। অবশেষে আইয়ুবি পরিবারের সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করে তিনি পুরো অঞ্চল নিজের কর্তৃত্বে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। এ সময় প্রায় নয় বছর তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে কোনো লড়াই করেননি। আল-কামিল মুহাম্মাদ তার শাসনামলের শেষদিকে ৬৩৫ হিজরি সনে দামেশক দখলের উদ্দেশ্যে অভিযানে বের হন এবং দামেশক জয় করেন। এ বিজয়ের কিছুদিন পরই তিনি ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর পর আইয়ুবি পরিবারের প্রশাসকদের পারস্পরিক সংঘাত আরও তীব্র আকার ধারণ করে।

সুলতান আল-কামিল একজন কর্মোদ্যমী শাসক ছিলেন। সেচব্যবস্থার সংস্কার ও কৃষিশিল্পে ব্যাপক কাজ করায় তার শাসনামলে মিশরে প্রভূত

অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। তিনি সালাহুদ্দিন দুর্গের[৯৮] নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেন এবং প্রচুর ধর্মীয় শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠা করেন। আইয়ুবি রাজপরিবারের অধিকাংশ সদস্যের ন্যায় তিনিও জ্ঞানানুরাগী ও আলিমদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। হাদিস শ্রবণ ও দ্বীনি আলোচনার জন্য প্রতি শুক্রবার রাতে তিনি উলামায়ে কেরামের মজলিসে শরিক হতেন।

কিন্তু নিজের ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য তিনি মুসলমানদের পবিত্র ভূমি রক্ষায় শিথিলতা করেছেন এবং আল-কুদস-সহ বিভিন্ন ইসলামি ভূখণ্ড খ্রিষ্টানদের হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করেননি। তাহলে তার নাগরিক উন্নয়ন এবং জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানপ্রীতির কী মূল্যই-বা আছে?! সুলতান আল-কামিলকে তার সেই সাধের ক্ষমতা ত্যাগ করতে হয়েছে, ত্যাগ করতে হয়েছে পৃথিবীর মায়া, ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেনি তার পরবর্তী আইয়ুবি প্রজন্মও; কিন্তু ইতিহাস আজও সযত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছে ইসলাম ও ইসলামি ভূখণ্ডের প্রতি তার সেই অবহেলা ও অন্যায় আচরণের দাস্তান।

আল-কামিলের মৃত্যুর পর তার পুত্র (২য় আদিল) সাইফুদ্দিন আবু বকর তার স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু তিনি শাসনকার্যে মনোযোগী হওয়ার পরিবর্তে খেল-তামাশায় মত্ত ছিলেন। ফলে প্রশাসকগণ মিলে দু-বছর পর ৬৩৭ হিজরি সনে তাকে অপসারণ করে।

এরপর আইয়ুবি রাষ্ট্রের হাল ধরেন আল-কামিলের আরেক পুত্র আল-মালিকুস সালিহ আইয়ুব। সালিহ আইয়ুব ছিলেন আইয়ুবি রাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি সবধরনের ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা নির্মূল করে যথাযথভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। সুলতান আইয়ুব ৬৩৮ হিজরি সনে নীলনদের রওজা দ্বীপে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং প্রচুর তুর্কি মামলুক (ক্রীতদাস) ক্রয় করে সেখানে জড়ো করেন। অষ্টম আব্বাসি খলিফা মুতাসিম যেমন সেনাবাহিনীতে প্রচুর পরিমাণ তুর্কি ক্রীতদাস অন্তর্ভুক্ত

---

৯৮. **সালাহুদ্দিন দুর্গ** : মিশরের কায়রোতে আল-মুকাত্তাম পাহাড়ের পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত একটি দুর্গ। এটি আল-জাবাল দুর্গ ও কায়রো দুর্গ (The Citadel of Cairo) নামেও পরিচিত। প্রথম আইয়ুবি সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি দুর্গটির নির্মাণকাজ শুরু করেন আর পঞ্চম আইয়ুবি সুলতান আল-কামিলের হাতে এর নির্মাণ সমাপ্ত হয়। আল-কামিলের শাসনকাল থেকে পরবর্তী ছয় শতকের অধিক কাল ধরে সালাহুদ্দিন দুর্গই ছিল মিশর শাসকের সরকারি বাসভবন। সালাহুদ্দিন দুর্গকে মধ্যযুগে নির্মিত অন্যতম দুর্ভেদ্য সামরিক দুর্গ মনে করা হয়।

করেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে তারাই তার সন্তানদের হাত থেকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়েছিল, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে সুলতান আস-সালিহ আইয়ুবের ক্ষেত্রেও। তার সংগৃহীত এসব তুর্কি ক্রীতদাসই পরে তার বংশধরদের হাত থেকে আইয়ুবি রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব কেড়ে নেয় এবং মামলুক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। রওজা দ্বীপে সংগঠিত হওয়ায় ইতিহাসে তারা 'বাহরি মামলুক' নামে পরিচিত।

সুলতান আস-সালিহ আইয়ুবের চাচা সালিহ ইসমাইল ছিলেন তার অন্যতম প্রতিপক্ষ। তিনি দামেশক দখল করে নেন এবং ক্রুসেডারদের সঙ্গে আঁতাঁত করে তাদের হাতে বিভিন্ন অঞ্চল ছেড়ে দেন। পরে সুলতান আইয়ুব বিভিন্ন খোয়ারিজম গোত্রের সহায়তা নিয়ে শত্রুদের পরাভূত করেন।

দ্বিতীয়বার আল-কুদস পুনরুদ্ধার

সুলতান আস-সালিহ আইয়ুব ৬৪২ হিজরি সনে (১২৪৪ খ্রিষ্টাব্দে) আল-কুদস পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনার ঘোষণা দেন। তেরো হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে তিনি রওনা হন আল-কুদস অভিমুখে। সংবাদ পেয়ে শামের বিভিন্ন এলাকার ক্রুসেডাররা সমবেত হয়ে ব্যাপক সৈন্যসমাবেশ ঘটায়। পরিতাপের বিষয়, এ সময় হিমস ও আলেপ্পোসহ শামের বিভিন্ন এলাকার আইয়ুবি প্রশাসকগণ ক্রুসেডারদের সমর্থন জানায় এবং আল-মালিকুস সালিহের বাহিনীর প্রতিরোধের লক্ষ্যে ক্রুসেডারদের সঙ্গে নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে জড়ো হয়! সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় বিশ হাজার। আল-কুদসের পথে গাজার নিকটে আল-মালিকুস সালিহের বাহিনী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয় এবং তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এরপর তারা সামনে অগ্রসর হয়ে আল-কুদস অবরোধ করে। মুসলিম বাহিনীর প্রবল আক্রমণে এগারো হাজার সৈন্যবিশিষ্ট আল-কুদসের স্থানীয় ক্রুসেডার বাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে; পনেরো বছর পর আবারও আল-কুদসে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

এরপর থেকে একটানা ছয়শ তিরানব্বই বছর পবিত্র আল-কুদস নগরী ইসলামি শাসনাধীন ছিল। ১৩৩৫ হিজরি সনে (১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে) ব্রিটিশ বাহিনী আল-কুদস দখল করে নেয় এবং পরবর্তী সময়ে ইহুদিদের হাতে তুলে দেয়।

সুলতান আইয়ুব ৬৪৩ হিজরি সনে দামেশক এবং ৬৪৫ হিজরি সনে আসকালান পুনরুদ্ধার করেন। এভাবে আইয়ুবি রাষ্ট্র পুনরায় তার পিতামহ আল-মালিকুল আদিল সাইফুদ্দিনের শাসনামলের ন্যায় বিস্তৃতি লাভ করে।

সপ্তম ক্রুসেড

[৬৪৭-৪৮ হিজরি/১২৪৯-৫০ খ্রিষ্টাব্দ]

সুলতান আস-সালিহ আইয়ুবের হাতে আল-কুদসের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিক্ষুব্ধ ইউরোপ নতুন করে ক্রুসেডের ডাক দেয়। ফ্রান্সের রাজা নবম লুই ইউরোপজুড়ে ক্রুসেড যুদ্ধের প্রচারণা চালান এবং তৎকালীন পোপ ৪র্থ ইনোসেন্ট (Pope Innocent IV)-এর সমর্থন লাভ করেন। দীর্ঘ তিন বছর ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণের পর আস-সালিহ আইয়ুবের শাসনামলের শেষদিকে ৬৪৬ হিজরি সনের জুমাদাল উলা (১২৪৮ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট) মাসে রাজা লুই আঠারোশ জাহাজের একটি বিশাল নৌবহর নিয়ে মিশর অভিমুখে রওনা হন। ক্রুসেডার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লক্ষের অধিক। ৬৪৭ হিজরি সনের ২২ সফর (১২৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ৬ জুন) ক্রুসেডার বাহিনী দিমইয়াতে পৌঁছে কয়েকদিনের প্রচণ্ড যুদ্ধের পর দিমইয়াত দখল করে নেয়।

আইয়ুবি সুলতান আল-মালিকুস সালিহ আইয়ুব তখন অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। ক্রুসেডারদের আগমনের সংবাদ পেয়ে সুলতানের স্ত্রী শাজারাতুদ-দুর সুলতানের পুত্র তুরান শাহের কাছে বার্তা পাঠিয়ে তাকে দ্রুত মিশরে চলে আসতে বলেন। তুরান শাহ তখন জাযিরা অঞ্চলে অবস্থান করছিলেন। ১৫ শাবান (২৩ নভেম্বর) সুলতান আইয়ুব মৃত্যুবরণ করলে শাজারাতুদ-দুর তার মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখেন এবং সুলতানের নকল স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিভিন্ন নির্দেশনা জারি করে সকলকে বোঝান যে, সুলতানই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি সেনাপতি ও রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমবেত করে জানান যে, সুলতান তাদেরকে সুলতান-পুত্র তুরান শাহের নামে বায়আত গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে সকলে তুরান শাহের নামে বায়আত গ্রহণ করে।

এদিকে ক্রুসেডার বাহিনী দিমইয়াত দখল করার প্রায় ছয় মাস পর মানসুরা নগরী অভিমুখে রওনা হয়। কিন্তু তারা ইতিপূর্বে আল-কামিলের আমলে যে ভুল করেছিল, এবারও সেই একই ভুল করে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন

যুগে মিশর বিজয়ী অভিযাত্রীগণ ফারামা হয়ে সিনাই মরুঅঞ্চল পাড়ি দিয়ে মিশরে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু ক্রুসেডাররা পূর্বের ন্যায় এবারও দিমইয়াত ও মানসুরা হয়ে মিশরে প্রবেশের চেষ্টা করে। এ পথে তাদের অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে প্রচুর খাল, নদী ও শাখা নদী প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

৬৪৭ হিজরি সনের ১৪ রমজান (১২৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর) ক্রুসেডার বাহিনী মানসুরা নগরীর নিকটে আল-বাহরুস সাগিরের তীরে এসে পৌঁছায়। ক্রুসেডাররা এ সময় টানা কয়েক সপ্তাহ ধরে নদী পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করলেও অপর পাড়ে অবস্থানরত আইয়ুবি বাহিনীর তীব্র তিরবৃষ্টির কারণে ব্যর্থ হয়। এরপর তারা স্থানীয় এক খ্রিষ্টান নাগরিকের মাধ্যমে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত নদীর তুলনামূলক অপ্রশস্ত একটি অংশের কথা জানতে পারে। তৎক্ষণাৎ ক্রুসেডার বাহিনীর একটি অংশ রাজা ৯ম লুইয়ের ভাই রবার্টের নেতৃত্বে গোপনে মূল বাহিনী থেকে সরে পড়ে এবং নদী পাড়ি দিয়ে পেছন দিক থেকে মুসলিম বাহিনীর ওপর হামলা চালায়। অল্পসময়ের মধ্যেই ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। সেদিন ছিল ৬৪৭ হিজরি সনের ৪ জিলকদ (১২৫০ খ্রিষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি)।

তুরানশাহ তখনও মিশরে এসে পৌঁছাননি। শাজারাতুদ-দুর তাই ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় তার স্বামীর প্রতিষ্ঠিত বাহরি মামলুক বাহিনীকে প্রেরণ করেন। বাহরি মামলুক বাহিনীর প্রবল আক্রমণে নদী অতিক্রমকারী ক্রুসেডার বাহিনীটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। জীবিত দু-চারজন তাড়া খেয়ে নদীতে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারায়।

এরইমধ্যে তুরানশাহ উপস্থিত হন এবং তার সৈন্যদের নিয়ে দিমইয়াত থেকে মানসুরা আসার পথের মাঝে অবস্থান নেন। ৬৪৭ হিজরি সনের ৯ জিলহজ (১২৫০ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ মার্চ) এ পথে ক্রুসেডার বাহিনীর জন্য রসদপত্র নিয়ে একটি নৌবহর এগিয়ে এলে মিশরীয় নৌবাহিনী তাদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় তারা প্রতিপক্ষের আশিটির অধিক জাহাজ আটক করতে সক্ষম হয়। ফলে ক্রুসেড শিবিরে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ৬৪৮ হিজরি সনের ২ মুহাররম (১২৫০ খ্রিষ্টাব্দের ৬ এপ্রিল) তুরানশাহ তার বাহিনী নিয়ে ফারিসকুর নামক স্থানে ক্রুসেডারদের নৌবাহিনীর মোকাবিলা করেন এবং প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তাদেরকে পরাজিত করেন। প্রায় পাঁচ হাজার ক্রুসেডার সৈন্য এ সময় নিহত হয়।

এদিকে রাজা ৯ম লুইয়ের নেতৃত্বে মূল ক্রুসেডার বাহিনী নদী পাড়ি দিয়ে মামলুক বাহিনীর মুখোমুখি হয়। মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে প্রায় ত্রিশ হাজার ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়, নদীতে ডুবে মারা যায় প্রচুর সৈন্য। পরাজিত ক্রুসেডার বাহিনী পলায়ন করার সময় রাজা ৯ম লুইকে জীবিত অবস্থায় বন্দি করা হয় এবং মানসুরার দারে ইবনে লুকমানে[৯৯] আটকে রাখা হয়। পরে এক কোটি ফ্রাংক মুক্তিপণ প্রদানের বিনিময়ে তিনি তার পরিজন ও অন্যান্য বন্দি সৈন্যসহ মুক্তিলাভ করেন।

সুলতান তুরান শাহ 'আল-মালিকুল মুআযযাম' উপাধি ধারণ করে আইয়ুবি রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ক্রুসেডারদের দমন করার পর শাজারাতুদ-দুরের কাছে তার পিতার সম্পদ দাবি করেন এবং মামলুকদের বিভিন্নভাবে হুমকি প্রদান করেন। অবশেষে দায়িত্ব গ্রহণের সত্তর দিনের মাথায় মামলুকরা তুরান শাহকে হত্যা করে উম্মে খলিল শাজারাতুদ-দুরকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। ইতিপূর্বে কোনো নারী মুসলমানদের শাসনভার গ্রহণ করেনি। শাজারাতুদ-দুর এর তিন মাস পরই নিজেকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেন।

এরপর মামলুকরা আইয়ুবি পরিবারের জনৈক রাজপুত্র আল-আশরাফ মুসা বিন ইউসুফ বিন মাসউদ বিন আল-কামিলকে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত করে। মাত্র আট বছর বয়সী অপ্রাপ্তবয়স্ক মুসার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয় সুলতান আল-মালিকুস সালিহ আইয়ুবের ক্রীতদাস ইযযুদ্দিন আইবেক তুর্কমানিকে। ইযযুদ্দিন শাজারাতুদ-দুরকে বিয়ে করেন এবং কিছুদিন না যেতেই মুসাকে অপসারণ করে নিজেই রাষ্ট্রের একচ্ছত্র ক্ষমতা অর্জন করেন। এর মাধ্যমে মিশরে আইয়ুবি রাষ্ট্রের পতন ঘটে। শামে অবশ্য এরপরও কিছুদিন আইয়ুবি রাষ্ট্র টিকে ছিল। পরবর্তী সময়ে শামকেন্দ্রিক আইয়ুবি রাষ্ট্র সীমিত স্বাধীনতাসহ মামলুকদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়।

ঐতিহাসিকগণ আইয়ুবি রাষ্ট্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

> আইয়ুবি রাষ্ট্রের শুরু থেকে শেষ পুরো ইতিহাস জিহাদ ও বিজয়াভিযানের ইতিহাস। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ও শেষ সুলতান তুরান শাহ উভয়ই জীবনভর নিরলসভাবে

---

৯৯. তৎকালীন মিশরের কাজি ছিলেন ইবরাহিম বিন লুকমান। তার বাড়িতেই রাজা লুইকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল।

> ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে উদ্ভাসিত বিজয়-ইতিহাস রচনা করেছেন। দুজনের মাঝেও এমন কয়েকজন শাসক বিগত হয়েছেন, যারা ক্রুসেডারদের আক্রমণ প্রতিরোধে এ দুজনের চেয়ে কম ছিলেন না। আইয়ুবি রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ই যেন হয়েছিল ইসলামি প্রাচ্যে ইউরোপের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে এবং তাদের এই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে ছয়শ বছরেরও অধিক সময়ের জন্য পিছিয়ে দিতে। কোমলতা ও উদারতা, সততা ও বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ এবং সাম্প্রদায়িকতা পরিহারের মাধ্যমে আইয়ুবি রাষ্ট্র ক্রুসেডারদের সামনে এক মঙ্গলকামী শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। আইয়ুবি শাসকগণ নিজেদের সমুন্নত আচরণের মাধ্যমে ক্রুসেডারদের সামনে তুলে ধরেছিলেন শত্রুর সঙ্গে আচরণের এক অনুপম নীতি; শিখিয়েছিলেন মানুষের সঙ্গে কীরূপ সদাচরণ করতে হয়; চরম নিন্দনীয় পাশবিক গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা ইত্যাদি কীভাবে পরিহার করতে হয়। তৎকালীন চরম সাম্প্রদায়িক ইউরোপিয়ান খ্রিষ্টান শক্তির মোকাবিলায় যদি আইয়ুবি রাষ্ট্র বাধা হয়ে না দাঁড়াত, তাহলে আন্দালুসের মতো শাম, মেসোপটেমিয়া, মিশর ও উত্তর আফ্রিকার সুবিস্তৃত ভূখণ্ড থেকেও ইসলামের নাম-নিশান মুছে যেত।

আমাদের মতে ঐতিহাসিকগণের এই মন্তব্য জিনকি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। জিনকি রাষ্ট্রের কর্ণধারগণও ক্রুসেডারদের প্রতিরোধে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেছিল।

যারা মুসলমানদের রাষ্ট্র ও ভূখণ্ড জবরদখল করেছিল এবং মসজিদুল আকসার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছিল, জিনকি ও আইয়ুবি রাজবংশের এই অব্যাহত সংগ্রাম ও অভিযানের কারণে তাদের মোকাবিলায় মুসলিম জনসাধারণের অন্তরে ঈমানি চেতনা পুনঃজাগ্রত হয়েছিল।

এর পাশাপাশি এই অব্যাহত যুদ্ধাভিযানের ফলেই প্রাচ্যের রোমান (বাইজান্টাইন) সাম্রাজ্য অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এর ফলেই ক্রুসেড যুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই উসমানি সাম্রাজ্যের হাতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটে। সে ইতিহাস সামনে যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মামলুক রাষ্ট্রের ইতিহাস

[৬৪৮-৯২২ হিজরি—১২৫০-১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ]

ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক জিহাদ ও লড়াই ছিল মামলুক রাষ্ট্রের পরিচয়-বৈশিষ্ট্য। তিরধনুক আর তরবারির সঙ্গেই ছিল তাদের সখ্য ও হৃদ্যতা। মামলুকরাই ছিল আইনে জালুত, হিমস ও শাকহাব যুদ্ধের মহানায়ক এবং সাইপ্রাসের মহান বিজেতা।

কিন্তু যখন তারা ভুলে যায় ইসলামপ্রদত্ত সেই মহান দায়িত্ব ও বার্তার কথা, ভুলে যায় তির-তরবারির সখ্যের কথা যার মাধ্যমে তারা বহিঃআক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকত এবং অবতীর্ণ হয় উম্মাহর জীবনে আগ্রাসী ও অত্যাচারীর ভূমিকায়, তখন সুন্নাতুল্লাহও আপন ভূমিকায় অগ্রসর হয়, মামলুকরা হারিয়ে যায় ইতিহাসের অতল গহ্বরে।

মামলুক পরিচিতি

আরবি 'মামলুক' (বহুবচন 'মামালিক') শব্দের অর্থ ক্রীতদাস। যুদ্ধবন্দি যেসব দাস ক্রয়সূত্রে কারও অধিকারে আসে, তাদেরকে মামলুক বলা হয়। আর ক্রীতদাস পিতামাতার সন্তান হিসেবে যারা জন্ম থেকেই দাস বিবেচিত হয়, তাদেরকে 'কিন' বলা হয়। অবশ্য ব্যাপকার্থে উভয় প্রকার ক্রীতদাসের ক্ষেত্রেই মামলুক শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

আব্বাসি খলিফা মামুন এবং পরবর্তী খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ আপন আপন খিলাফত আমলে দাসবাজার থেকে প্রচুর দাস ক্রয় করেন এবং সেনাবাহিনীসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে তাদেরকে অধিষ্ঠিত করেন। তখন থেকেই মামলুক শব্দটি একটি বিশেষ পারিভাষিক রূপ পরিগ্রহ করে এবং রাষ্ট্রীয় উচ্চ পদে দায়িত্ব পালনকারী ক্রীতদাসদের মামলুক বলা হতে থাকে। আব্বাসি খলিফাগণের পাশাপাশি আন্দালুসের উমাইয়া শাসকগণও প্রচুর পরিমাণে মামলুক সংগ্রহ করতেন। যুদ্ধবন্দি ও দাসবাজার থেকে ক্রয়—উভয় পদ্ধতিতেই দাস সংগ্রহ করা হতো।

দাসবাজারে সবচেয়ে বেশি ক্রীতদাস আমদানি হতো মাওয়ারাউন নাহার অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা থেকে। এসব অঞ্চলে সব সময়ই যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত বলে প্রচুর মানুষ বন্দি হয়ে দাসবাজারে বিক্রি হতো। মাওয়ারাউন নাহারের অধিকাংশ অঞ্চলে তুর্কি আদিবাসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় অধিকাংশ দাসই হতো তুর্কি বংশোদ্ভূত। অবশ্য এসব অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণে আর্মেনীয় ও মোঙ্গল দাসও আমদানি হতো। পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত প্রচুর খ্রিষ্টান দাসও দাসবাজারে বিক্রি হতো। ইউরোপিয়ান ক্রীতদাসরা অবশ্য সাকলাবি নামে পরিচিত ছিল। মুসলিম শাসকগণ মামলুকদেরকে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষাদানের পাশাপাশি সুদক্ষ প্রশিক্ষণ ও সুনিবিড় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে বিশুদ্ধ ইসলামি সামরিক চিন্তাধারায় গড়ে তুলতেন।

ইসলামি ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে মামলুকগণ ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণসহ চলমান বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। ক্রুসেডারদের প্রতিরোধ ও তাতার-মোঙ্গল আগ্রাসন মোকাবিলায়

মামলুকদের ভূমিকা ইতিহাসের পাতায় অম্লান হয়ে আছে। কোনো কোনো রাষ্ট্রে মামলুকরা প্রধান সামরিক শক্তি, ক্ষেত্রবিশেষে একক সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে—মুতাসিম-পরবর্তী আব্বাসি খলিফাগণের শাসনামলে তুর্কি মামলুকরাই মূলত আব্বাসি সাম্রাজ্য পরিচালনা করত। আন্দালুসেও সাকলাবি ক্রীতদাসগণ রাষ্ট্রক্ষমতায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করত। মিশর ও ভারতবর্ষে মামলুক পরিচয়ধারীরা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিল। আলোচ্য পরিচ্ছেদে আমরা কেবল মিশরে প্রতিষ্ঠিত মামলুক রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করব।

* * *

এক. বাহরি (সালিহি) মামলুক রাষ্ট্র

[৬৪৮-৭৮৪ হিজরি—১২৫০-১৩৮২ খ্রিষ্টাব্দ]

মিশরকেন্দ্রিক মামলুক রাষ্ট্রের ইতিহাস দু-ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগের নাম বাহরি মামলুক রাষ্ট্র, যার ব্যাপ্তি ৬৪৮ হিজরি সন হতে ৭৮৪ হিজরি সন (১২৫০-১৩৮২ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত; আর দ্বিতীয়ভাগের নাম বুরজি বা সার্কাসি মামলুক রাষ্ট্র, যার ব্যাপ্তি ৭৮৪ হিজরি সন হতে ৯২২ হিজরি সন (১৩৮২-১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আইয়ুবি সুলতান আল-মালিকুস সালিহ আইয়ুব প্রচুর তুর্কি দাস ক্রয় করে তাদের বসবাসের জন্য রওজা দ্বীপে দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন এবং সেখানেই তাদের বসবাস ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। আল-মালিকুস সালিহ আইয়ুব অল্পবয়সী দাস সংগ্রহ করতেন। তিনি মামলুকদের সঙ্গে দাসের মতো আচরণ করতেন না; বরং তাদেরকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করতেন। সুলতানের তত্ত্বাবধানে প্রথমেই তাদের কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকহের প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করা হতো। এরপর তাদেরকে অশ্বারোহণ, তিরন্দাজি ও তরবারি চালনাসহ বিভিন্ন যুদ্ধবিদ্যার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। পাশাপাশি তাদেরকে প্রদান করা হতো নেতৃত্ব, যুদ্ধ পরিচালনা, যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়ন, সামরিক সমস্যাবলির সমাধান ইত্যাদি বিষয়ের বাস্তব জ্ঞান। স্বয়ং সুলতান আস-সালিহ আইয়ুব যাবতীয় বিষয় তদারকি করতেন।

মামলুকদের কেউ সামরিক বা ধর্মীয় বিষয়ে বিশেষ প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ ঘটালে তাকে পদোন্নতি দেওয়া হতো; ক্ষেত্রবিশেষে রাজ্যের কিছু এলাকার জায়গির প্রদান করা হতো। যোগ্যতা ও প্রতিভাবলে মামলুকদের অনেকেই সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অংশের সেনাপতিত্ব ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসকের দায়িত্বও লাভ করে। পরবর্তীকালে তারাই মামলুক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং নীলনদের রওজা দ্বীপে বসবাসকারী হওয়ায় 'বাহরি মামলুক' নামে পরিচিতি লাভ করে। সুলতান আস-সালিহ আইয়ুবের প্রতি সম্বন্ধ করে তাদেরকে 'সালিহি মামলুক'ও বলা হয়।

বাহরি মামলুক রাষ্ট্রের সুলতানের সংখ্যা চব্বিশ জন। প্রথম মামলুক সুলতান ইযযুদ্দিন আইবেক তুর্কমানি। তিনি ৬৪৮ হিজরি সনে মিশরের ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং সুলতানা শাজারাতুদ-দুরকে বিয়ে করেন। পরে তিনি শাজারাতুদ-দুরের সকল ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। ৬৫৫ হিজরি সনে (১২৫৭ খ্রিষ্টাব্দে) ইযযুদ্দিন আইবেক নিহত হন। কিছুদিন পর শাজারাতুদ-দুরকেও হত্যা করা হয়। এরপর ইযযুদ্দিন আইবেকের পুত্র নুরুদ্দিন আলি 'আল-মালিকুল মানসুর' উপাধি ধারণ করে মিশরের শাসনভার গ্রহণ করেন। নুরুদ্দিনের বয়স তখনও এগারো পেরোয়নি!

সাইফুদ্দিন কুতুজের দায়িত্বগ্রহণ

নতুন সুলতান অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় সেনাপতি সাইফুদ্দিন কুতুজ তার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে থাকেন। তার শাসনামলেই ৬৫৬ হিজরি সনে সমকালীন মুসলিম উম্মাহর জীবনে এক বিরাট বিপর্যয় সংঘটিত হয়—তাতারদের হাতে বাগদাদের পতন ঘটে এবং খিলাফতব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটে। পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাইফুদ্দিন কুতুজ মিশরের আলিম-উলামা ও কাজিদেরকে সমবেত করেন। সকলে কিশোর সুলতানকে অপসারণ করে তাকে দায়িত্বগ্রহণের ফতোয়া প্রদান করে। অবশেষে ৬৫৭ হিজরি সনে (১২৫৯ খ্রিষ্টাব্দে) সাইফুদ্দিন কুতুজ 'আল-মালিকুল মুযাফফার' উপাধি ধারণ করে মিশরের শাসনভার গ্রহণ করেন।

আমরা যদি ৬৫৮ হিজরি সনের ইসলামি বিশ্বের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তাহলে দেখতে পাব—উত্তর আফ্রিকা বাদে অবশিষ্ট ইসলামি বিশ্বে চারজন শাসকের শাসন চলছে।

- উত্তর এশিয়া (মাওয়ারাউন নাহার, আজারবাইজান, সমরকন্দ, খোরাসান ইত্যাদি) অঞ্চলে চলছিল তাতারি শাসক হালাকু খানের শাসন।
- শাম অঞ্চলের শাসক ছিলেন নাসির বিন আজিজ।
- কারাক অঞ্চলের শাসক ছিলেন মুগিছ বিন আদিল।
- মিশরের শাসক ছিলেন সাইফুদ্দিন কুতুজ।

শাসকদের অপরিণামদর্শী আচরণ,

ক্ষমতা রক্ষার জন্য পারস্পরিক লড়াই এবং শত্রুর বিষয়ে উদাসীনতা

এ সময় শাম অঞ্চলের শাসক নাসির বিন আজিজ কারাকের শাসক মুগিছ বিন আদিলের সহায়তা নিয়ে সাইফুদ্দিন কুতুজের বিরুদ্ধে লড়াই করে জোরপূর্বক মিশর দখলের প্রস্তুতি নেন। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারেন যে, বাগদাদে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পর হালাকু খান এবার শাম দখলের পরিকল্পনা করছেন, তখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টে যায়। ৬৫৮ হিজরি সনে হালাকু খান সাত দিনের অবরোধের পর আলেপ্পোতে প্রবেশ করে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালান। আলেপ্পোতে বাগদাদের চেয়েও অধিক মানুষ হালাকু-বাহিনীর নির্মম ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়। কেবল খ্রিষ্টান নাগরিকরা গণহত্যা হতে রেহাই পায়। এ সময় তাতারদের আগ্রাসনের সংবাদ পেয়ে পার্শ্ববর্তী হামা (Hama) অঞ্চলের প্রশাসক মানসুর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং হালাকু বাহিনী সেদিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই নগরদ্বারের চাবি হালাকু খানের কাছে পাঠিয়ে দেন।

৬৫৮ হিজরি সনের সফর মাসের শেষদিকে (১২৬০ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে) মোঙ্গল বাহিনী কোনোরূপ বাধাবিপত্তি ছাড়াই দামেশকে প্রবেশ করে। দামেশকের দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত দুর্গ জয় করার জন্য তাতাররা উপর্যুপরি মিনজানিকের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। একসময় দুর্গের অধিবাসীরা নতি স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করে। হালাকু খান ইবিল সিয়ান নামক জনৈক তাতারকে দামেশক নগরী ও দুর্গের শাসনভার প্রদান করে।

এই ইবিল সিয়ান খ্রিষ্টানদের প্রতি অনুরাগী ছিল এবং খ্রিষ্টধর্মকে সম্মানের চোখে দেখত। ইবিল সিয়ান দায়িত্ব গ্রহণ করায় খ্রিষ্টানরা দামেশকে অবাধ কর্তৃত্ব লাভ করে এবং নগরীজুড়ে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করে। তারা সমবেত হয়ে রাজপথে 'বিশুদ্ধ ধর্ম খ্রিষ্টধর্ম বিজয় লাভ করেছে' বলে শ্লোগান দিতে থাকে, ইসলাম ও মুসলমানদের নিন্দা করতে থাকে এবং ক্রুশ উত্তোলন করে জনসাধারণকে ক্রুশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাধ্য করে। মুসলমানরা তাতার প্রশাসকের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করলে সে মুসলমানদের অপমান করে তাড়িয়ে দেয়।

হালাকু খানের প্রধান সহকারী ছিল কিতবুগা। চরম ধূর্ত কিতবুগা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অত্যন্ত নিকৃষ্ট বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করত। কিতবুগা কোনো অঞ্চল জয় করার পর তার পার্শ্ববর্তী এলাকা অবরোধ করত এবং বিজিত এলাকার বন্দি যোদ্ধাদেরকে অবরুদ্ধ এলাকায় আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দিত। অবরুদ্ধ এলাকার অধিবাসীরা তখন পড়ত উভয় সংকটে। তারা যদি প্রতিবেশী বন্দিদের আশ্রয় দিত, স্বাভাবিকভাবেই অতিরিক্ত লোক যুক্ত হওয়ায় সঞ্চিত খাদ্য-পানীয় ও রসদসামগ্রী অল্পদিনেই শেষ হয়ে যেত এবং বাধ্য হয়ে তাতারদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে হতো। আর যদি তারা তাদেরকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃতি জানাত, তাহলে কিতবুগা প্রথমে বিজিত এলাকার যোদ্ধাদেরকে নিয়ে অবরুদ্ধদের বিরুদ্ধে লড়াই করত। এরপরও বিজয় অর্জিত না হলে যখন অবরুদ্ধ অঞ্চলের সৈন্যরা ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত, তখন সে তার নিজস্ব তাজাদম সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতো এবং সহজেই বিজয় ছিনিয়ে নিত।

ধূর্ত কিতবুগার আরেকটি নিকৃষ্ট কৌশল ছিল—সে কোনো দুর্গ অবরোধ করার পর সেখানকার নেতৃবৃন্দের কাছে বার্তা পাঠাত যে, তোমাদের সঞ্চিত পানি কমে গেছে। তোমরা যদি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করো, তাহলে আমরা জোরপূর্বক ভেতরে প্রবেশ করে তোমাদের সকলকে হত্যা করব এবং নারী ও শিশুদের বন্দি করব। পানি শেষ হয়ে গেলে তোমরা কীভাবে টিকে থাকবে? সুতরাং আমরা জোরপূর্বক প্রবেশ করার পূর্বেই তোমরা সন্ধি করে নাও। উত্তরে যদি দুর্গবাসী জানাত যে, 'আমাদের যথেষ্ট পানি মজুদ আছে; পানি নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা নেই।' তাহলে কিতবুগা বলত, 'আমি তোমাদের দাবি বিশ্বাস করি না। আচ্ছা, আমাদের কয়েকজন প্রতিনিধি ভেতরে গিয়ে দেখে আসবে যে, সত্যিই তোমাদের কাছে পর্যাপ্ত পানি আছে কি না? বাস্তবেই যদি পর্যাপ্ত পানি থাকে, তাহলে আমরা অবরোধ প্রত্যাহার করে ফিরে যাব।' দুর্গবাসী ফাঁদে পা দিয়ে সম্মতি জানালে কিতবুগার বাহিনীর কয়েকজন সৈন্য পানির পরিমাণ যাচাইয়ের জন্য দুর্গের ভেতরে যেত। তারা সঙ্গে নিয়ে যেত একধরনের ফাঁপা বর্শা, যার ভেতরে বিষ ভরা থাকত। দুর্গে প্রবেশ করার পর তারা বিষাক্ত বর্শা দিয়ে পানির গভীরতা মাপার ভান করত আর পুরো পানি

বিষাক্ত হয়ে যেত। ফলে দুর্গবাসী নিজেদের অজান্তেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত।

তৎকালীন ইসলামি প্রাচ্যের তিন বৃহৎ নগরী বাগদাদ, আলেপ্পো ও দামেশককে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালানোর পর তাতাররা বালাবাক্কু, আজালুন (Ajloun), সাল্‌ত (Al-Salt), হাওরান (The Hauran), নাবলুস, গাজা, জেবরিন ও হেবরন (Hebron)-সহ পুরো শাম অঞ্চল দখল করে নেয় এবং তাতার রীতি অনুযায়ী প্রতিটি অঞ্চলে নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। শামে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর তাতাররা এবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মামলুক নিয়ন্ত্রিত মিশরের প্রতি। মিশরের পর হালাকু খানের পরবর্তী টার্গেট ছিল মক্কা ও মদিনা।

ইযযুদ্দিন বিন আবদুস সালাম

বাগদাদ ও শামে তাতারদের আগ্রাসনের সংবাদ মিশরে পৌঁছলে করণীয় নির্ণয়ের জন্য মামলুক রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় আলিম-উলামা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ পরামর্শে বসে। পরামর্শে কাজি বদরুদ্দিন সানজাওয়ি ও শায়খুল ইসলাম ইযযুদ্দিন বিন আবদুস সালামও উপস্থিত ছিলেন। পরামর্শে উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি যুদ্ধব্যয় নির্বাহের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে কিছু অর্থ গ্রহণের মত পেশ করলে শায়খ ইযযুদ্দিন দাঁড়িয়ে বলেন, 'যখন বাইতুল মালে কোনো সম্পদ থাকবে না, এরপর আপনারা নিজেদের সঞ্চিত স্বর্ণ-রুপা-অলংকার ইত্যাদিও খরচ করে ফেলবেন এবং যুদ্ধাস্ত্র বাদ দিয়ে বাকি আর্থিক বিবেচনায় জনসাধারণ ও আপনারা সমপর্যায়ে পরিণত হবেন আর সৈন্যদের কাছে আরোহণের ঘোড়া ছাড়া অন্য কিছু থাকবে না, কেবল তখন শাসকের জন্য শত্রুর মোকাবিলায় জনগণের সম্পদ গ্রহণ করা বৈধ হবে। কারণ, শত্রু যখন আক্রমণ করে বসে, তখন আপন আপন জানমাল দিয়ে তাদের প্রতিরোধ করা সকলের ওপর অপরিহার্য হয়ে যায়।'

তাতারি আগ্রাসন মোকাবিলায় মুসলমানদের অভিযান

মিশরের সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ সার্বিক দিক বিবেচনা করে তাতাররা মিশরে আগমনের পূর্বে নিজেই অগ্রসর হয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার বাহিনী প্রস্তুত করে শাম অভিমুখে রওনা হন।

সংবাদ পেয়ে কিতবুগার নেতৃত্বে বিশাল তাতার বাহিনী কুতুজের বাহিনীর দফারফা করতে অগ্রসর হয়।

৬৫৮ হিজরি সনের রমজান মাসে (১২৬০ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে) আইনে জালুতের প্রান্তরে উভয় পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে তাতার বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়, তাদের সেনাপতি কিতবুগা ও বহু সৈন্য নিহত হয়। সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ সেনাপতি রুকনুদ্দিন বাইবার্স বুনদুকদারিকে পরাজিত তাতার বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দিলে তিনি আলেপ্পো পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন।

আইনে জালুতের যুদ্ধের এক বিস্ময়কর দৃশ্যপট

আইনে জালুতের যুদ্ধ চলাকালে সুলতান কুতুজের ঘোড়াটি প্রতিপক্ষের নিক্ষিপ্ত তিরের আঘাতে মারা যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ অতিরিক্ত ঘোড়ার দায়িত্বশীল কাউকে না পেয়ে পদব্রজেই যুদ্ধ করতে থাকেন। তার চারপাশে তখন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিল। মুসলিম সুলতান হিসেবে তিনি যুদ্ধের একেবারে কেন্দ্রে অবস্থান করছিলেন।

জনৈক মুসলিম সেনাপতি সুলতানকে পদব্রজে লড়াইরত দেখতে পেয়ে নিজ ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন এবং আল্লাহর শপথ দিয়ে সুলতানকে তার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণের অনুরোধ করেন। কিন্তু সুলতান কুতুজ তাকে বাধা দিয়ে বলেন, 'আমি মুসলমানদেরকে তোমার কল্যাণ-অবদান থেকে বঞ্চিত করতে পারি না।' এরপর তিনি পদব্রজেই লড়াই করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর দায়িত্বশীলগণ অতিরিক্ত ঘোড়া নিয়ে এলে তিনি তাতে আরোহণ করেন।

পরবর্তী সময়ে জনৈক প্রশাসক তাকে বলেন, 'সুলতান, আপনি অমুকের ঘোড়ায় কেন আরোহণ করলেন না? শত্রুরা আপনাকে অশ্বহীন অবস্থায় লক্ষ করলে তো আপনাকে হত্যা করে ফেলত আর আপনার অবর্তমানে ইসলাম ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।' তখন তিনি উত্তর দেন, 'আমাকে হত্যা করা হলে তো আমি জান্নাতে চলে যেতাম। আর ইসলামের কথা বলছ?! ইসলামের এক মহান রব আছেন; যিনি ইসলামকে কখনো নিশ্চিহ্ন হতে দেবেন না। ইসলামি ইতিহাসে কত-শত মহান ব্যক্তি নিহত হয়েছেন; অমুক, অমুক শাসক শহিদ হয়েছেন; কিন্তু তাদের অবর্তমানে আল্লাহ তাআলা এমন সব ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যারা

ইসলামের প্রতিরক্ষায় কাজ করেছেন এবং ইসলামকে নিশ্চিহ্ন হতে দেননি।'

আইনে জালুতে তাতার বাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ দামেশকে পৌঁছলে সেখানে অবস্থানরত তাতাররা পালিয়ে যায়। দামেশকের মুসলিম অধিবাসীগণ তাদের পিছু নিয়ে তাদেরকে হত্যা করে এবং তাদের হাতে বন্দি মুসলমানদের মুক্ত করে। এই আকস্মিক পট পরিবর্তনে তাতারদের সহায়তাকারী খ্রিষ্টানরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। খ্রিষ্টানরা যে গির্জা থেকে ক্রুশ বের করে সড়কে সড়কে প্রদক্ষিণ করত, মুসলমানরা আক্রমণ চালিয়ে সে গির্জায় আগুন লাগিয়ে দেয়। যেসব খ্রিষ্টান মুসলমানদেরকে ক্রুশের সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করত, মুসলমানরা তাদের বাড়িঘরও জ্বালিয়ে দেয়। জনৈক শিয়া রাফিজি মুসলমানদের সম্পদ আত্মসাৎ করতে তাতারদের সহায়তা করেছিল। বিক্ষুব্ধ মুসলমানরা তাকে হত্যা করে।

সেনাপতি রুকনুদ্দিন বাইবার্স শামের অধিকাংশ এলাকা আইয়ুবি পরিবারের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে মামলুক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন। রুকনুদ্দিনের সাফল্যে খুশি হয়ে সুলতান কুতুজ তাকে আলেপ্পোর প্রশাসক নিযুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তিনি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সক্ষম হননি। মিশরে ফেরার পর বাইবার্স তাকে হত্যা করে মিশরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১০০]

রুকনুদ্দিন বাইবার্সের দায়িত্বগ্রহণের মধ্য দিয়েই মূলত বাহরি মামলুক রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসনব্যবস্থার সূচনা হয়।

---

১০০. আইনে জালুতের যুদ্ধের পঞ্চাশ দিন পরই দামেশক থেকে মিশরে ফেরার পথে সালিহিয়া নামক এলাকায় সাইফুদ্দিন কুতুজ নিহত হন। তবে তার হত্যাকারী ও হত্যার কারণ নির্ণয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অগ্রগণ্য মতানুসারে রুকনুদ্দিন বাইবার্সই তাকে হত্যা করেন। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের মতে সাইফুদ্দিন কুতুজ ইতিপূর্বে মামলুক সেনাপতি ফারিসুদ্দিন আকতাইকে হত্যা করেছিলেন বলে মামলুকরা তার প্রতি বিক্ষুব্ধ ছিল। তাকে হত্যা করা ছিল সেই অতীত হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ। অপরদিকে জালালুদ্দিন সুয়ুতি রহ. *তারিখুল খুলাফা* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, কুতুজ বাইবার্সকে আলেপ্পোর প্রশাসনদায়িত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েও পরে তা ভঙ্গ করেন। এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে বাইবার্স তাকে হত্যা করেন। এ ছাড়া আরও কিছু কারণ ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন।

আয-যাহির রুকনুদ্দিন বাইবার্স বুনদুকদারি

[৬৫৮-৬৭৬ হিজরি—১২৬০-১২৭৭ খ্রিষ্টাব্দ]

প্রতিষ্ঠাকালীন সংগ্রাম-পরবর্তী সময়ের প্রথম শাসক হিসেবে রুকনুদ্দিন বাইবার্সকেই বাহরি মামলুক রাষ্ট্রের প্রথম সুলতান বিবেচনা করা হয়।

দায়িত্ব গ্রহণের পরই তিনি সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সুবিন্যস্তকরণ, সেনাবাহিনীর সংস্কার ও নৌবহর নির্মাণে কাজ শুরু করেন। এরপর তিনি শামের নিরাপত্তাব্যবস্থা দৃঢ়করণে মনোযোগ দেন এবং দামেশক ও কায়রোর মাঝে ডাকবাহী কবুতরবিশিষ্ট দ্রুতগামী ডাকব্যবস্থার প্রচলন করেন। সুলতান বাইবার্স সালাহুদ্দিন আইয়ুবির ন্যায় ইসলামের সেবা করার এবং ক্রুসেডারদের দখলে থাকা শামের অবশিষ্ট অঞ্চল থেকেও তাদেরকে উচ্ছেদ করার আকাঙ্ক্ষা লালন করতেন। ইসলামের সেবার জন্য আরও মজবুত নেতৃত্ব অর্জনের লক্ষ্যে তিনি তাতারদের আগ্রাসনের পর বাগদাদ থেকে পালিয়ে বেড়ানো জনৈক আব্বাসি রাজপুত্রকে মিশরে নিয়ে আসেন এবং তার হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করে খিলাফতব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করেন। এর মাধ্যমে শুরু হয় মিশরকেন্দ্রিক আব্বাসি খিলাফতব্যবস্থা। নতুন এই খলিফার নাম (২য় মুসতানসির বিল্লাহ) আবুল কাসিম আহমাদ।

কিছুদিন পর খলিফা ২য় মুসতানসির বিল্লাহ তাতারদের হাত থেকে বাগদাদ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে নিহত হন। এরপর আরেক আব্বাসি যুবরাজ হাকিম বি আমরিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদের হাতে বায়আত গ্রহণ করা হয়। মিশরের পরবর্তী আব্বাসি খলিফাগণ ছিলেন এই হাকিম বি আমরিল্লাহরই বংশধর। এরপর দীর্ঘদিন আব্বাসি খিলাফত চলার পর কালের পরিক্রমায় উসমানিরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়।

হালাকু খানের চাচাতো ভাই বার্কে খানের ইসলাম গ্রহণ

আইনে জালুতের যুদ্ধে পরাজয়ের পর তাতারদের মাঝে অন্তর্বিরোধ শুরু হয়। হালাকু খানের সেনাপতিরা বিভিন্ন যুদ্ধে অর্জিত সম্পদ ও ভূখণ্ডে নিজেদের অংশ দাবি করে। ৬৬০ হিজরি সনে হালাকু খান ও তার চাচাতো ভাই বার্কে খানের মধ্যে বিরোধ শুরু হলে এই সংঘাত চরমে পৌঁছায়। বার্কে খান মুসলমানদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে

ইসলাম গ্রহণ করে সুলতান আয-যাহির বাইবার্সকে নিম্নোক্ত বার্তা প্রেরণ করেন—

> আপনি ইসলামের প্রতি আমার ভালোবাসার কথা জানেন আর হালাকু খান মুসলমানদের প্রতি কী অন্যায় আচরণ করেছে—তা-ও জানেন। তাই আপনি এক প্রান্ত হতে অগ্রসর হোন আর আমি আরেক প্রান্ত হতে; দুজন মিলে তাকে পরাজিত কিংবা রাজ্যছাড়া করব। তার হাত থেকে আমরা যে ভূখণ্ড জয় করতে পারব, তার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব আপনার।

বার্কে খানের প্রস্তাব সুলতান বাইবার্সকে মুগ্ধ করে। তাতারদের মোকাবিলায় আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক অপ্রত্যাশিত পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং তাতারদের পারস্পরিক বিরোধে জড়িয়ে দিয়েছেন। কিছুদিন পরই হালাকু খান ও বার্কে খানের মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে হালাকু খান পরাজিত হন এবং কোনোমতে অবশিষ্ট সীমিত সংখ্যক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন।

এরপর বার্কে খান কনস্টান্টিনোপলে অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় কোণঠাসা কনস্টান্টিনোপলের শাসক বার্কে খানের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করে। সংবাদ পেয়ে সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স বার্কে খানের কাছে বহুমূল্য প্রচুর উপহারসামগ্রী প্রেরণ করেন।

এরপর তাতারদের একটি প্রতিনিধিদল বাইবার্সের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিরাপত্তাপ্রার্থনা করে। তিনি তাদের নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং তাদের উষ্ণ আপ্যায়নের পাশাপাশি বিশাল জায়গির প্রদান করেন।

৬৬৩ হিজরি সনে (১২৬৫ খ্রিষ্টাব্দে) মৃগিরোগে আক্রান্ত হয়ে হালাকু খানের মৃত্যু হয়। তাকে উর্মিয়া হ্রদের শাহি দ্বীপে (Shahi Island) সমাহিত করা হয়।

হালাকু খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবাগা খান তাতারদের শাসনভার গ্রহণ করেন। আবাগা খান ছিলেন হালাকু খানের দশ পুত্রের একজন। বার্কে খান আবাগা খানের দায়িত্বভার গ্রহণের কথা জানতে পেরে তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাকে পরাজিত করে তার বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেন।

বার্কে খানের ইন্তেকাল

বার্কে খান (বিন জোচি খান বিন চেঙ্গিস খান) ইসলাম ও উলামায়ে কেরামের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। সুলতান আয-যাহির বাইবার্স তার সঙ্গে সদুপদেশ বিনিময় করতেন এবং তার প্রেরিত দূতদের যথেষ্ট সম্মান করতেন। ৬৬৫ হিজরি সনে (১২৬৬ খ্রিষ্টাব্দে) বার্কে খানের মৃত্যু হয়।

বার্কে খানের ইন্তেকালের পর মানকুতামুর বিন তোগান বিন বাতু বিন জোচি খান বিন চেঙ্গিস খান নামক জনৈক তাতার তার স্থলাভিষিক্ত হন। মানকুতামুর-ও মুসলিম ছিলেন। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় বার্কে খানের আদর্শ অনুসরণ করেন।

নতুন করে তাতারদের হুমকি

এর কিছুদিন পর হালাকু-পুত্র আবাগা খান সুলতান বাইবার্সের কাছে নিম্নোক্ত বার্তা প্রেরণ করেন—

> 'তুমি হচ্ছ সিভাস অঞ্চলের একজন ক্রীতদাসমাত্র। তুমি কীভাবে পৃথিবীর অধিপতির বিরোধিতা করার দুঃসাহস দেখাও?! মনে রেখো, তুমি আসমানের ওপর আত্মগোপন করো কিংবা অতল ভূগর্ভে, আমার হাত থেকে কোনোমতেই নিষ্কৃতি পাবে না। সুতরাং নিজের ভালো চাইলে রাজাধিরাজ আবাগা খানের সঙ্গে সমঝোতা করে নাও।'

বাইবার্স তখন দামেশকে ছিলেন। তার কাছে এই বার্তা পৌঁছলে তিনি দূতদেরকে বলেন, 'তাকে জানিয়ে দিয়ো যে, আমিও আমার দাবি নিয়ে তার পেছনেই লেগে আছি। সে (ও তার পূর্বপুরুষগণ) খলিফার কাছ থেকে যেসব ভূখণ্ড দখল করেছে এবং অন্য যেসব এলাকায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে, সব তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া পর্যন্ত আমি শান্ত হব না।'

খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের সহায়তায় আবাগা খানের নেতৃত্বাধীন তাতাররা শামের মুসলমানদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে। কিন্তু ৬৬৯ হিজরি সনে হালাকু খানের উত্তরসূরি আবাগা খান ও তার জ্ঞাতিভাই মানকুতামুরের মধ্যে লড়াই হলে আবাগা খান পরাজিত হয়। সুলতান বাইবার্সের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। সুলতান তখন আসকালানে ছিলেন।

৬৭১ হিজরি সনে বাইবার্সের কাছে সংবাদ পৌঁছায় যে, একদল তাতার সৈন্য ফুরাত নদী পাড়ি দিয়ে পুনরায় শামে হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। সংবাদ পেয়ে কালবিলম্ব না করে সুলতান তার বাহিনী নিয়ে রওনা হন এবং ফুরাত অতিক্রম করে তাতারদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ যুদ্ধে তার সঙ্গে আমির সাইফুদ্দিন কালাউন ও বদরুদ্দিন বাইসারিও ছিলেন। যুদ্ধে প্রচুর সংখ্যক তাতার সৈন্য নিহত হয়।

৬৭৫ হিজরি সনে তাতারদের সঙ্গে মুসলমানদের আরেকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে বেশ কয়েকজন শ্রেষ্ঠতম মুসলিম সেনাপতি শহিদ হলেও বিজয় শেষপর্যন্ত মুসলমানদের পদচুম্বন করে।

ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সুলতান বাইবার্স

মামলুক রাষ্ট্রকে একইসঙ্গে তিন-তিনটি প্রবল শক্তিধর প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। একদিকে ছিল ধেয়ে আসা তাতারিদের হুমকি, আরেকদিকে ছিল ক্রুসেডারদের অব্যাহত রাজ্যবিস্তৃতির প্রচেষ্টা। আর তৃতীয় শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল শিয়া বাতিনি গোষ্ঠী।

তাতারদের দমন করার পাশাপাশি সুলতান আয-যাহির রুকনুদ্দিন বাইবার্স সমকালীন খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের অন্তরেও প্রবল ভীতি সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ কারণে খ্রিষ্টান শাসকদের অনেকে তার সঙ্গে সন্ধি করেছিল।

তাতারদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে লড়াই করে তাদেরকে প্রতিরোধ করার সুযোগ থাকলেও খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। কারণ, খ্রিষ্টানরা শামের যেসব এলাকা দখল করে নিয়েছিল, সব জায়গায়ই তারা নগরীর চারপাশে দুর্ভেদ্য দুর্গ ও নগরপ্রাচীর নির্মাণ করেছিল এবং দুর্গ প্রতিরক্ষার জন্য নাইট টেম্পলার ও নাইট হসপিটালার সংগঠনের কর্মীদের নিয়োজিত রেখেছিল।[১০১] তাই ক্রুসেডারদের দমন করতে সম্মুখ সমরে

---

১০১. প্রথম ক্রুসেড অভিযানের মাধ্যমে আল-কুদস নগরী খ্রিষ্টানদের দখলে চলে যাওয়ার পর নগরীটি অভিমুখে খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের আগমন বেড়ে গেলে পথে তাদের নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে হুগো ডি পায়েন্স (Hugue de payens) নামক জনৈক ফরাসি যোদ্ধা নাইট টেম্পলার (Knights Templar) নামক সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদুল আকসার যে অংশটিকে ইহুদিরা সুলায়মানি মন্দির (Solomon's Temple)-এর স্থান বলে দাবি করে থাকে, হুগো সে জায়গাটিকে তার সামরিক সংগঠনটির মূল কার্যালয় নির্বাচিত করেন। এ কারণেই সংস্থাটির সদস্যগণ দাউদের উপাসনালয়ের প্রতি সম্বন্ধিত হয়ে Knights=

=Templar বা উপাসনালয়ের যোদ্ধা নামে পরিচিতি লাভ করে। মাত্র নয়জন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করা নাইট টেম্পলার প্রথমদিকে সাধারণ মানুষের দান-দক্ষিণার ওপর নির্ভর করে চলত। এরপর ১১২৯ খ্রিষ্টাব্দে তারা কাউন্সিল অব ট্রয়সের অনুমোদন লাভ করে। ১১৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন পোপ ২য় ইনোসেন্ট সংগঠনটিকে একটি আজ্ঞাপত্র প্রদান করেন এবং একমাত্র পোপের আইন ব্যতীত অন্য সকল আইনকানুন হতে সংগঠনটিকে মুক্ত ঘোষণা করেন। এরপর থেকেই সংগঠনটির ভাগ্য বদলে যায় এবং তারা খ্রিষ্টান সমাজ হতে প্রচুর সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করতে থাকে। সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও সর্বোচ্চ মানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নাইট টেম্পলারের সদস্যরা অধিকাংশ ক্রুসেড যুদ্ধে অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে লড়াই করত। খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীরা নাইট টেম্পলারের সদস্যদের কাছে নিজেদের সম্পদ গচ্ছিত রেখে একটি ঋণপত্র গ্রহণ করত এবং বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে ঋণপত্রটি ফেরত দিয়ে নিজেদের সম্পদ বুঝে নিত। ঐতিহাসিকদের মতে এটিই ছিল বিশ্বে প্রথম হুন্ডি বা চেকের ব্যবহার। এভাবে দান ও চুক্তি লেনদেনের মাধ্যমে ধর্মীয়-সামরিক সংগঠন নাইট টেম্পলার বিশাল বহুজাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানেও পরিণত হয়। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি কর্তৃক আল-কুদস নগরী পুনরুদ্ধারের পর শামে খ্রিষ্টানরা যেমন ধীরে ধীরে কোণঠাসা হয়ে পড়ে, তেমনই নাইট টেম্পলাররাও বারবার তাদের মূলকেন্দ্র পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় এবং সামরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে খ্রিষ্টান বিশ্বে তাদের জনপ্রিয়তায় ধস নামে।

অপরদিকে নাইট হসপিটালার (Knights Hospitaller) সংগঠনটি মূলত ক্রুসেড অভিযান শুরু হওয়ার বেশ কয়েক বছর পূর্বে ১০৭০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আল-কুদস নগরীতে আগত দরিদ্র তীর্থযাত্রীদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইউরোপীয় কিছু খ্রিষ্টান বণিকের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি দাতব্যসংস্থা হিসেবে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সংগঠনটির কার্যালয় ছিল বাইতুল মুকাদ্দাসের আল-কিয়ামা গির্জা (The Church of the Holy Sepulchre)-এর পাশে। সংস্থার সদস্য ও কর্মীদের Hospitallers (চিকিৎসাসেবাকর্মী) বলে অভিহিত করা হতো। নাইট হসপিটালার সংস্থার সদস্যরা সরাসরি রোমের পোপের নির্দেশনা মেনে চলত বলে কর্মক্ষেত্রে ব্যাপক স্বাধীনতা ভোগ করত। ক্রুসেডারদের আল-কুদস দখলকালে তারা বিভিন্ন তথ্য দিয়ে তাদেরকে সহায়তা করেছিল। ক্রুসেডাররাও তাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে তাদেরকে খুশি রাখত। আল-কুদসসহ ফিলিস্তিনের বিভিন্ন অঞ্চলে এমনকি পুরো ইউরোপজুড়ে সংস্থাটির প্রচুর দাতা ছিল। ফলে দিনে দিনে সংস্থাটি অঢেল বিত্ত-বৈভব ও ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে যায়।

ক্রুসেড রাজ্য বাইতুল মুকাদ্দাসের তৃতীয় শাসক ২য় বল্ডউইন (শাসনকাল : ১১১৮-১১৩১ খ্রিষ্টাব্দ) তার শাসনামলের শুরুতে হসপিটালার সংস্থাটিকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করার উদ্যোগ নেন। এর ফলে সংস্থাটির প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায় এবং সংস্থার সদস্যরা প্রতিষ্ঠাকালীন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত সামরিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেও ভূমিকা রাখতে শুরু করে।

খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শুরুর অংশে বিভিন্ন যুদ্ধে ক্রুসেডাররা নাইট টেম্পলার ও নাইট হসপিটালারের সদস্যদের ওপর যথেষ্ট নির্ভর করত। সংগঠনদুটি কোনো খ্রিষ্টান শাসকের=

লড়াইয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কঠোর অবরোধ আরোপের মাধ্যমে তাদেরকে দুর্বল করে তোলা। শাম অঞ্চলে তখনও তিনটি ক্রুসেড রাজ্য টিকে ছিল—বাইতুল মুকাদ্দাস, ত্রিপোলি ও এন্টিয়ক।

সুলতান বাইবার্স ৬৬১ হিজরি সনে (১২৬৩ খ্রিষ্টাব্দে) শামের ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ লড়াই শুরু করেন। প্রথমেই তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যভুক্ত নাজারেথ (Nazareth) অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন এবং নগরীটি জয় করে নেন। এরপর তিনি রাজ্যটির রাজধানী আক্কা অভিমুখে অগ্রসর হন। আক্কার উপকণ্ঠে সংঘটিত প্রচণ্ড এক যুদ্ধে বাইবার্স বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা ৩য় কনরাড (Conrad III)-কে পরাজিত করেন। পরাজিত কনরাড পালিয়ে আক্কার দুর্গে আশ্রয় নেন। সুলতান বাইবার্স কিছু সৈন্যকে আক্কা অবরোধে নিয়োজিত রেখে নিজে আরসুফ অভিমুখে রওনা হন। টানা চল্লিশ দিন অবরোধ করে রাখার পর আরসুফের ক্রুসেডার সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে।

পরের বছর সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের আরেক দুর্ভেদ্য দুর্গ আতলিত (Athlith) অবরোধ করেন এবং যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করে নেন। আতলিত বিজয়ের পর তিনি হাইফা অবরোধ করেন। সুলতানের নির্দেশে মুসলিম সৈন্যরা নগরপ্রাচীর লক্ষ্য করে বিরামহীন পাথর ও গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। একপর্যায়ে নগরপ্রাচীর ভেঙে পড়লে মুসলিম বাহিনী হাইফায় প্রবেশ করে নগরীটি দখল করে নেয়।

৬৬৩ হিজরি সনে (১২৬৫ খ্রিষ্টাব্দে) বাইবার্সের নেতৃত্বে মামলুক বাহিনী কায়সারিয়া অবরোধ করে। নাইট হসপিটালারদের সঙ্গে নিয়ে ক্রুসেডার বাহিনী চল্লিশ দিন পর্যন্ত অবিচল থাকলেও একপর্যায়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। কায়সারিয়া জয়ের পর বাইবার্স তার অন্যতম সেনাপতি কালাউন ও আল-মানসুর আলিকে পাঠান আর্মেনীয় জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত কিলিকিয়া অঞ্চল জয়ের জন্য আর নিজে রওনা হন সাফাদ (Safad) নগরী জয়ের লক্ষ্যে।

=আনুগত্যের পরিবর্তে সরাসরি পোপের আনুগত্য করত এবং কেবল পোপের অনুমোদন থাকলে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির আল-কুদস পুনরুদ্ধারের পর অন্যান্য খ্রিষ্টান সংগঠনের ন্যায় নাইট হসপিটালারের জনপ্রিয়তায়ও ভাটা শুরু হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুর দিকে তৎকালীন পোপের প্ররোচনায় ফরাসি রাজা উভয় সংগঠনের বেশকিছু নেতাকে হত্যা করেন। ফলে ধীরে ধীরে সংগঠনদুটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

কালাউন ও আল-মানসুর আলির নেতৃত্বে মামলুক বাহিনীর একটি অংশ ৬৬৪ হিজরি সনের (১২৬৬ খ্রিষ্টাব্দের) মধ্যে আদানা ও তারসুস-সহ পুরো কিলিকিয়া রাজ্য জয় করে। এদিকে সুলতান বাইবার্স নিজে বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যভুক্ত সাফাদ নগরী অবরোধ করেন। দুই হাজার নাইট টেম্পলারের উপস্থিতি সত্ত্বেও ভীত ক্রুসেডাররা আত্মসমর্পণ করে সাফাদ নগরী বাইবার্সের হাতে তুলে দেয়। এরপর বাইবার্স একে একে আসকালান ও জাফা জয় করেন। এর ফলে শামের পুরো উপকূলীয় অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে আর ক্রুসেড রাজ্য বাইতুল মুকাদ্দাস সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে কেবল আক্কা নগরীতে।

বাইতুল মুকাদ্দাস ক্রুসেড রাজ্যের দফারফা করে সুলতান বাইবার্স ৬৬৬ হিজরি সনে (১২৬৮ খ্রিষ্টাব্দে) এন্টিয়ক অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন। দীর্ঘ অবরোধের পর ৬৬৬ হিজরি সনের ৪ রমজান (১২৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ মে) এন্টিয়কের সাধারণ জনগণ আত্মসমর্পণ করলে এন্টিয়কের পতন ঘটে। নগরীর নিরাপত্তায় নিয়োজিত দশ হাজার ক্রুসেডার সৈন্য আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানিয়ে দুর্গে আশ্রয় নিলে মামলুক বাহিনী আক্রমণ চালিয়ে ২০ মে তাদেরকেও পরাভূত করে।

অষ্টম ক্রুসেড

[৬৬৮-৬৬৯ হিজরি/১২৬৯-১২৭০ খ্রিষ্টাব্দ]

এন্টিয়কের পতন যেন ছিল ইসলামি প্রাচ্যে ক্রুসেডারদের চূড়ান্ত পতনধ্বনি। দুই ক্রুসেড রাজ্য এডেসা ও এন্টিয়ক ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অবশিষ্ট দুই রাজ্য বাইতুল মুকাদ্দাস ও ত্রিপোলিও টিকে আছে কোনোমতে। স্বভাবতই এতে ইউরোপ প্রবলভাবে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। তৎকালীন পোপ ৪র্থ ক্লেমন্ত (Pope Clement IV) তাই নতুন করে ক্রুসেড যুদ্ধের ডাক দেন।

পোপের আহ্বানে ইউরোপজুড়ে প্রস্তুতি শুরু হয়। এবারের অভিযানে অংশ নিতে সম্মতি জানান—

- ইংল্যান্ডের যুবরাজ অ্যাডওয়ার্ড।
- সাইপ্রাসের রাজা ৩য় হিউ (Hugh III of Cyprus)।
- ফ্রান্সের রাজা ৯ম লুই (সপ্তম ক্রুসেডের সর্বাধিনায়ক)।

অষ্টম ক্রুসেডে খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা সঙ্গী হিসেবে পায় তাতার রাজ্য ইলখানাতের[১০২] শাসক ও হালাকু খানের পুত্র আবাগা খানকে। সিদ্ধান্ত হয়, ফরাসি রাজা ৯ম লুই মামলুক রাষ্ট্রের পশ্চিমে অবস্থিত তিউনিসিয়ায় ঘাঁটি স্থাপন করে পর্যায়ক্রমে (লিবিয়ার) ত্রিপোলি ও কায়রো দখল করে আল-কুদস অভিমুখে অগ্রসর হবেন; অ্যাডওয়ার্ড ও হিউ নৌপথে আক্কায় পৌঁছে আল-কুদসে হামলা চালাবেন আর আবাগা খান মামলুক রাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে একে একে আলেপ্পো ও দামেশক দখল করে নেবেন, তারপর ফ্রান্স-ইংল্যান্ড-সাইপ্রাস বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে আল-কুদস দখলে অংশ নেবেন।

রুকনুদ্দিন বাইবার্স এ সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানতেন না। তিনি এন্টিয়ক রাজ্যের পতন ঘটানোর পর রাজধানী কায়রোতে ফিরে যান। কিছুদিন পর তিনি আবারও শাম অঞ্চলে গমন করেন। এবার তিনি আক্রমণ করেন শামের নাসিরিয়া পার্বত্যাঞ্চলে অবস্থিত শিয়া বাতিনি রাজ্য মাসইয়াফে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ৬৫৪ হিজরি সনে (১২৫৬ খ্রিষ্টাব্দে) পারস্যের বাতিনি রাজ্যের পতন ঘটলেও শামের বাতিনি রাজ্যটি টিকে ছিল। পূর্বে নাসিরিয়া পর্বতমালা হতে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত এবং উত্তরে এন্টিয়ক রাজ্যসীমা হতে দক্ষিণে ত্রিপোলি রাজ্যসীমা পর্যন্ত ছিল শামের বাতিনি রাজ্যসীমা। রাজ্যজুড়ে ছিল দুর্ভেদ্য উনিশটি দুর্গ। বাইবার্স তার বাহিনীকে অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি দুর্গকে তিনদিক থেকে অবরুদ্ধ করে ফেলেন। খোলা থাকে কেবল পশ্চিমে সাগরের দিক। সুকঠিন অবরোধ ও অনবরত গোলা নিক্ষেপের মাধ্যমে সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স এক বছরের মধ্যে একে একে সবগুলো দুর্গের পতন ঘটাতে সক্ষম হন। এর ফলে পৃথিবী শিয়া বাতিনি গোষ্ঠীর বর্বরতা থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি লাভ করে।

রাজা ৯ম লুই ফরাসি বাহিনীর সঙ্গে ইতালির নেপলস ও আন্দালুসের খ্রিষ্টরাজ্য নাফারের সহায়ক বাহিনী নিয়ে ৬৬৮ হিজরি সনের জিলকদ

---

১০২. **ইলখানাত :** ইলখানাত অর্থ ছোট সাম্রাজ্য। বাগদাদসহ পারস্যের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করার পর তাতাররা সেখানে স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল, যার নামকরণ করা হয় 'ইলখানাত'। মূল তাতার সাম্রাজ্যের চেয়ে আয়তনে ছোট হওয়ায় এবং মূল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হওয়ায় সুবিশাল সাম্রাজ্যটির এই নামকরণ করা হয়! ইলখানাতসহ অন্যান্য তাতার রাজ্যের বিস্তারিত ইতিহাস সামনে চতুর্থ খণ্ডে আলোচনা করা হবে।

মাসে (১২৭০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে) তিউনিসিয়ার উপকূলীয় নগরী কার্থেজে (Carthage) পৌঁছান। তিউনিসিয়ার তৎকালীন শাসকপরিবার বনু হাফস মুসলমান হলেও ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রেখে চলত। কিন্তু তিউনিসিয়ায় পৌঁছেই ক্রুসেডার বাহিনী মহামারির শিকার হয় এবং অনেক সৈন্য আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে ইহধাম ত্যাগ করে। খোদ রাজা লুই-ও ২৫ আগস্ট মারা যান। তখন বাকিরা সামনে অগ্রসর না হয়ে সেখান থেকেই নিজ নিজ দেশে ফিরে যায়। এ সংবাদ জানতে পেরে অ্যাডওয়ার্ড ও হিউয়ের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ড ও সাইপ্রাসের বাহিনী এবং আবাগা খানের নেতৃত্বাধীন তাতার বাহিনীও অভিযানের চিন্তা বাদ দেয়। ফলে অষ্টম ক্রুসেডও পুরোপুরি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

শাম অঞ্চলে বাতিনি রাজ্যের অবরোধে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় বাইবার্স ক্রুসেডারদের সংগঠিত হওয়ার সংবাদ জানতে পেরে দ্রুত কায়রোতে ফিরে এসেছিলেন। ক্রুসেডারদের প্রস্থানের পর তিনি পুনরায় শাম অঞ্চলে ফিরে যান। ১২৭১ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে তিনি জয় করেন ত্রিপোলি রাজ্যের অধীনস্থ বুর্জ সাফিতা (Chastel Blanc)। এরপর তিনি অবরোধ করেন ত্রিপোলি নগরী।

নবম ক্রুসেড

[৬৭০ হিজরি/১২৭১-১২৭২ খ্রিষ্টাব্দ]

ত্রিপোলি অবরোধের সংবাদ জানতে পেরে ইউরোপের টনক নড়ে ওঠে। আল-কুদস, এডেসা, এন্টিয়ক সবই হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন যদি ত্রিপোলি ও আক্কারও পতন ঘটে, তাহলে ইসলামি প্রাচ্য থেকে ক্রুসেডারদের নামনিশানাই মুছে যাবে। তাতারদের সহায়তায় এবার ঘোষিত হয় নবম ক্রুসেড।

অষ্টম ক্রুসেডের মতো এবারও অভিযানে যোগ দেয় ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সাইপ্রাস ও তাতার রাজ্য ইলখানাত। আবাগা খান অবশ্য এবার নিজে না এসে তার আস্থাভাজন সেনাপতি সামাগার (Samagar)-কে প্রেরণ করেন। পরিকল্পনা করা হয়, ইউরোপীয় ক্রুসেডাররা মামলুক সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্সকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখবে, এ ফাঁকে তাতার বাহিনী শামের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে নেবে।

৬৭০ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসে (১২৭১ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) সামাগারের নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী উত্তর দিক থেকে মামলুক রাষ্ট্রে পা রাখে। প্রথমেই তারা আলেপ্পোতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, এরপর একে একে হামলা চালায় মাআররাতুন-নোমান ও আফামিয়া নগরীতে। সংবাদ পেয়ে সুলতান বাইবার্স অল্পকিছু সৈন্যকে ত্রিপোলিতে রেখে বাকিদের নিয়ে দ্রুত আফামিয়া অভিমুখে অগ্রসর হন। বাইবার্সের রওনা হওয়ার সংবাদ পেয়েই তাতার বাহিনী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করে। বাইবার্স দ্রুত গতিতে তাদের ধাওয়া করে মামলুক রাজ্যের শেষ সীমা খাবুর নদী পর্যন্ত পৌঁছে যান। কিন্তু তার আগেই তাতাররা পালিয়ে ইলখানাত রাজ্যে চলে যায়!

সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স যখন তাতারদের তাড়া করে শামের উত্তর প্রান্তে পৌঁছে গেছেন, ওদিক থেকে ইউরোপীয় ক্রুসেডাররা তখন ফিলিস্তিন অঞ্চলে হামলা চালায়। মামলুক বাহিনী অন্যদিকে ব্যস্ত থাকায় ইংল্যান্ডের যুবরাজ অ্যাডওয়ার্ডের নেতৃত্বে ক্রুসেডার বাহিনী অনেকটা বিনা যুদ্ধে একে একে মন্টফোর্ট দুর্গ (Montfort Castle), নাজারেথ নগরী ও কাকুন দুর্গ দখল করে নেয়।

সংবাদ পেয়ে কালবিলম্ব না করে সুলতান বাইবার্স শামের দক্ষিণ প্রান্তে ছুটে আসেন। বত্রিশ হাজার সৈন্যবিশিষ্ট ক্রুসেডার বাহিনীর মোকাবিলা করতে তিনি মাত্র বিশ হাজার সৈন্য নিয়েই আক্কায় পৌঁছান। বাইবার্সের আগমনে অ্যাডওয়ার্ডের যুদ্ধস্পৃহা মুহূর্তেই উবে যায়। তিনি বাইবার্সের কাছে দূত প্রেরণ করে সন্ধিচুক্তির আবেদন জানান! ৬৭০ হিজরি সনের শাওয়াল মাসে (১২৭২ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে) উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 'কায়সারিয়ার চুক্তি' নামে খ্যাত দশ বছর দশ মাস দশ দিন মেয়াদি চুক্তিটির ধারাগুলো হলো—

- মন্টফোর্ট, নাজারেথ ও কাকুন দুর্গের অধিকার মুসলমানরা ফেরত পাবে।
- এসব এলাকার যেসব মুসলিম নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে, তাদের পরিবারকে নিহত প্রত্যেক ব্যক্তির বিপরীতে প্রতি বছর তিনশ ষাট দিরহাম প্রদান করতে হবে। এই ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে দুই ক্রুসেড রাজ্য বাইতুল মুকাদ্দাস ও ত্রিপোলি।

- খ্রিষ্টানরা তীর্থযাত্রার জন্য আল-কুদসে আগমন করলে নির্দিষ্ট দর্শনার্থী মাশুল প্রদান করতে হবে।
- তীর্থযাত্রীরা ইসলামি ভূখণ্ডে ধর্মপ্রচার করতে পারবে না, ভূমি ক্রয় করতে পারবে না, ইসলামি ভূখণ্ডের কোনো খ্রিষ্টান নাগরিকের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না এবং তীর্থযাত্রার আগে-পরে মিলিয়ে অতিরিক্ত দুই দিনের বেশি অবস্থান করতে পারবে না।

উত্তরের এই অব্যাহত অভিযানব্যস্ততা সুলতান বাইবার্সকে মিশরের দক্ষিণাঞ্চলের বিষয়ে উদাসীন করতে পারেনি। ৬৭৪ হিজরি সনে তিনি নুবিয়া অঞ্চলে বাহিনী প্রেরণ করেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের বশীভূত করে পুনরায় জিজিয়া প্রদানে বাধ্য করতে সক্ষম হন। ইতিপূর্বে তারা জিজিয়া প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

৬৭৬ হিজরি সনের ২৭ মুহাররম (১২৭৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জুন) সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স ইন্তেকাল করেন। এরপর মিশরের ক্ষমতা নিয়ে সংঘাত শুরু হয় এবং বাইবার্সের দুই পুত্র আস-সাইদ নাসিরুদ্দিন বারাকা ও আল-আদিল বদরুদ্দিন সুলামিশ একের পর এক শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাদের একজনেরও শাসনামল দীর্ঘায়ত হয়নি। অবশেষে মিশরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন আল-মালিকুল মানসুর সাইফুদ্দিন কালাউন আস-সালিহি। তিনি ৬৭৮ হিজরি সন হতে ৬৮৯ হিজরি সন (১২৭৯-১২৯০ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী একশ বছরেরও অধিক সময় মিশরের ক্ষমতার লাগাম কালাউন-পরিবারের হাতেই ছিল।

ক্ষমতা সুসংহত হওয়ার পর সুলতান কালাউন ক্রুসেডারদের সঙ্গে দশ বছর মেয়াদি শান্তিচুক্তি করেন। চুক্তির অন্যতম ধারা ছিল—এ সময় তিনি মিশরের পণ্যবাহী জাহাজকে শামের খ্রিষ্টান নিয়ন্ত্রিত বন্দরগুলোতে প্রবেশের অনুমতি দেবেন না এবং খ্রিষ্টানরা তাদের নগরীগুলোতে নতুন করে কোনো প্রতিরক্ষামূলক স্থাপনা নির্মাণ করতে পারবে না। চুক্তির এ ধারাগুলো দ্বারাই অনুমান করা যায় যে, সমকালীন ক্রুসেড শক্তি কতটা দুর্বল ও হীনবল হয়ে পড়েছিল।

ক্রুসেডারদের সঙ্গে সুলতান কালাউনের সমঝোতাচুক্তি মূলত তার প্রজ্ঞাপূর্ণ বিবেচনাবোধেরই নিদর্শন ছিল। কারণ, তাতাররা তখন নতুন করে মিশরে হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

৪৩—দ্রষ্টব্য—৩২

অমুসলিমদের ধর্মত্যাগে বাধ্য করা ইসলামে বৈধ নয়

হিমসের যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে সুলতান মানসুর কালাউন দামেশকে এই রাজকীয় বার্তা প্রেরণ করেন যে, ইতিপূর্বে যাদের নাম জিম্মি হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে, তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হলো। যারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে, তাদেরকে শূলে চড়ানো হবে।

সুলতানের নির্দেশ জারি হওয়ার পর কেউ ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তাকে গলায় রশি ঝুলিয়ে শূলে চড়াতে নিয়ে যাওয়া হতো। ফলে তারা বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। তারা বলত—শাসক ইসলাম গ্রহণের নির্দেশ দেওয়ায় আমরা ঈমান এনেছি।

এরইমধ্যে হিমসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এরপর সে বছরেরই (৬৮০ হিজরি সনের) শাওয়াল মাসে জোরপূর্বক ইসলামগ্রহণকারী জিম্মিদের বিষয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বেশ কয়েকজন মুফতি লিখে জানান যে, জিম্মিদেরকে জোরপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে; সুতরাং তাদের নিজ ধর্মে প্রত্যাবর্তনের অধিকার আছে। কাজি জামালুদ্দিন বিন আবু ইয়াকুব মালিকির কাছেও জিম্মিদের জোরপূর্বক ইসলামগ্রহণের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। তখন তাদেরকে নিজ ধর্মে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ প্রদান করা হয়।

এরপর তাদের অধিকাংশই নিজ ধর্মে ফিরে যায় এবং পূর্বের ন্যায় তাদের ওপর জিজিয়া আরোপ করা হয়।

৪৩—০—৩২

হিমসের যুদ্ধ

৬৮০ হিজরি সনের রজব মাসে (১২৮১ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) হিমসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতার দিক দিয়ে হিমসের যুদ্ধকে তুলনা করা যেতে পারে আইনে জালুতের যুদ্ধের সঙ্গে।

এ সময় আবাগা খান আরও একবার শাম অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালান। এবার তিনি তার ভাই (হালাকু খানের আরেক পুত্র) মিঙ্গু তিমুর (Mengu Timur)-এর নেতৃত্বে বিশাল এক বাহিনী শাম অভিমুখে প্রেরণ করেন। বাহিনীটিতে আশি হাজার তাতার সৈন্যের পাশাপাশি জর্জিয়ান ও আর্মেনীয় সৈন্য মিলে এক লক্ষাধিক সৈন্য ছিল। তাতারদের শামে আক্রমণের সংকল্পের কথা জানতে পেরে সুলতান কালাউন ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিম শাসক-প্রশাসকদের কাছে বার্তা প্রেরণ করে তাদেরকে তাতারবিরোধী অভিযানে যোগ দেওয়ার এবং সামরিক সহায়তার আহ্বান জানান। প্রশাসকগণ আপন আপন বাহিনী নিয়ে সুলতানের অবস্থানস্থল দামেশকে সমবেত হয়। প্রতিটি অঞ্চল থেকে দলে দলে লোকজন আগমন করে। তুর্কমেন, বেদুইন ও অন্যান্যরাও বাহিনীতে যোগদান করে। সবমিলিয়ে মুসলিম বাহিনীর সদস্যসংখ্যা তাতারদের অর্ধেকের কাছাকাছি পৌঁছায়। সকলে আল্লাহর কাছে কাকুতিমিনতি করে সাহায্য কামনা করতে থাকে।

রজব মাসের চৌদ্দ তারিখ সূর্যোদয়ের সময় হিমসের উপকণ্ঠে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। যুদ্ধ শুরু হলে প্রথমদিকে জয়ের পাল্লা তাতারদের দিকে হেলে পড়ে। এ সময় কিছু মুসলিম যোদ্ধা রণক্ষেত্র হতে পালিয়ে যায়। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর মূল অংশে অবস্থানরত সুলতান কালাউন সামান্য হতোদ্যম বা নিরাশ না হয়ে তার অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে অটল-অবিচল থেকে লড়াই চালিয়ে যান। সুলতানকে অবিচল দেখতে পেয়ে অনেক সেনাপতি ও যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসে। কথায় বলে—রাজ্য চলে রাজার চালে!

এরপর মুসলিম বাহিনীর প্রবল আক্রমণে তাতাররা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। প্রচুর তাতার সৈন্য নিহত হয়; বাকিরা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে পলায়নের পথ ধরে। সুলতান কালাউন পলায়নপর তাতারদের পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য মুসলিম বাহিনীর সৈন্যদের প্রেরণ করেন।

৬৮০ হিজরি সনেই হালাকু-পুত্র আবাগা খান মৃত্যুবরণ করেন। তাতারদের হিমসের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত তার ছিল না; বরং তার ভাইয়ের সিদ্ধান্তে হয়েছিল। কিন্তু উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় আবাগা খানও তাতার-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে স্বজাতির পরাজয় অবলোকন করে আবাগা খান অত্যন্ত ভেঙে পড়েন এবং

এর কিছুদিন পরই মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তাতারদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তার ভাই আহমাদ তেকুদির বিন হালাকু। দায়িত্ব গ্রহণ করার পরই তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মামলুক সুলতান কালাউনের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরিতে সচেষ্ট হন। বিরোধী তাতাররা এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে তাকে অপসারণ ও হত্যার চেষ্টা চালায়। ৬৮৩ হিজরি সনে (১২৮৪ খ্রিষ্টাব্দে) তাতাররা আহমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তাকে হত্যা করে। তাতারি ইলখানাত রাজ্যের নেতৃত্বের আসনে এবার অভিষিক্ত হন আবাগা খানের পুত্র আরগুন।

তাতারদের দিক থেকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার পর সুলতান কালাউন এবার ক্রুসেডারদের প্রতি মনোযোগী হন। প্রথমেই তিনি লাতাকিয়া অবরোধ করার পর জয় করে নেন। এরপর ত্রিপোলির খ্রিষ্টানরা মুসলিম বণিক কাফেলার ওপর হামলা চালিয়ে চুক্তিভঙ্গ করলে তিনি ত্রিপোলিতে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। সুলতান কালাউন ৬৮৮ হিজরি সনের মুহাররম মাসে (১২৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে) মিশর থেকে শামের উদ্দেশে রওনা হন। পথে এক সপ্তাহ দামেশকে অবস্থান করে তিনি তার বাহিনীকে বিন্যস্ত করেন। এরপর তিনি ত্রিপোলি অভিমুখে রওনা হন এবং রবিউল আউয়াল মাসের শুরুতে ত্রিপোলি অবরোধ করেন। মামলুক বাহিনীর কামান ও মিনজানিক হতে নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে ত্রিপোলির নিরাপত্তাব্যবস্থা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। রবিউস সানি মাসের চার তারিখে (১২৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ এপ্রিল) সুলতানের নির্দেশে মামলুক বাহিনী চূড়ান্ত হামলা চালিয়ে ত্রিপোলিতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ৫০৩ হিজরি সনের জিলহজ মাসে ক্রুসেডাররা ত্রিপোলি দখল করে নিয়েছিল। দীর্ঘ একশ পঁচাশি বছর পর সুলতান কালাউন ত্রিপোলি পুনরুদ্ধার করেন।

ত্রিপোলির পতনের পর শাম অঞ্চলে ক্রুসেডারদের দখলে অবশিষ্ট থাকে কেবল সুর, আক্কা ও বৈরুত নগরী। খ্রিষ্টানদের অন্যতম সুরক্ষিত নগরী আক্কাও ক্রুসেডারদের সঙ্গে কৃত দশ বছর মেয়াদি শান্তিচুক্তির আওতায় ছিল। কিন্তু ৬৮৯ হিজরি সনে আক্কায় কয়েকজন মুসলিম ব্যবসায়ীকে হত্যা করা হলে সুলতান কালাউন হত্যাকারীদেরকে তার হাতে সমর্পণের দাবি জানান। আক্কার ক্রুসেডার কর্তৃপক্ষ এতে অস্বীকৃতি জানালে সুলতান কালাউন আক্কায় অভিযান পরিচালনার মনস্থ করেন। কিন্তু আক্কায় অভিযান

পরিচালনার পূর্বেই ৬৮৯ হিজরি সনের জিলকদ মাসে (১২৯০ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে) তিনি ইন্তেকাল করেন।

সুলতান কালাউনের শাসনামলে রাজ্যজুড়ে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার অন্যতম কীর্তি সুলতান আল-মানসুর কালাউন কমপ্লেক্স। কায়রোতে দুই প্রাসাদের মাঝে একটি বড় হাসপাতাল, মসজিদ, মাদরাসা ও স্মারক-গম্বুজ নিয়ে কমপ্লেক্সটি গঠিত হয়েছে। হাসপাতালটি ছিল তৎকালীন মিশরের সর্ববৃহৎ চিকিৎসাকেন্দ্র। সুলতান এই কমপ্লেক্সের জন্য প্রচুর সম্পদ ওয়াকফ করে গিয়েছিলেন এবং ওয়াকফের মধ্যে বিভিন্ন কল্যাণমূলক শর্ত সংযুক্ত করেছিলেন। ইন্তেকালের পর সুলতান কালাউনকে উক্ত কমপ্লেক্সের স্মারক-গম্বুজের নিচে সমাহিত করা হয়।

সুলতান কালাউনের ইন্তেকালের পর তার পুত্র আল-আশরাফ সালাহুদ্দিন খলিল তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ৬৮৯ হিজরি সন হতে ৬৯৩ হিজরি সন (১২৯০-১২৯৩ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। সুলতান আল-আশরাফ খলিল ছিলেন দুঃসাহসী বীর যোদ্ধা। তার পিতা সুলতান কালাউন ক্রুসেডারদের অধিকৃত সবচেয়ে সুরক্ষিত নগরী আক্কা বিজয়ের জন্য যে বাহিনী প্রস্তুত করছিলেন, তিনি তা পূর্ণ প্রস্তুত করেন। সংবাদ পেয়ে ক্রুসেডাররা তাকে প্রতিরোধ করার জন্য অবশিষ্ট যোদ্ধাদের সমবেত করে। কিন্তু নিজেদের স্বভাবরীতির দাবিতেই যেন তারা পরস্পর বিভেদে জড়িয়ে পড়ে। ৬৯০ হিজরি সনের জুমাদাল উলা মাসে (১২৯১ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে) আল-আশরাফের নেতৃত্বাধীন মামলুক বাহিনী প্রচণ্ড যুদ্ধের পর আক্কা জয় করে এবং নগরীটির প্রতিরক্ষা-দুর্গ ধ্বংস করে। এ যুদ্ধে খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের বহু সৈন্য নিহত হয়। ইতিপূর্বে সুলতান বাইবার্স ও সুলতান কালাউন চেষ্টা করেও যে আক্কা নগরী জয় করতে পারেননি, অবশেষে আল্লাহ তাআলা আল-আশরাফের হাতে সেই বিজয় দান করেন।

আক্কার পতনের পর সুর, সিডন ও বৈরুতসহ একে একে শামের অবশিষ্ট খ্রিষ্টান নগরীগুলোরও পতন ঘটে এবং শামে খ্রিষ্টরাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। বেঁচে থাকা অবশিষ্ট ক্রুসেডাররা শাম থেকে পালিয়ে শামের সন্নিকটে নতুন দুটি খ্রিষ্টরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। একটি হলো আর্মেনিয়া, অপরটি দ্বীপরাষ্ট্র সাইপ্রাস। ফলে শামের অভ্যন্তর অঞ্চল আপাতত বিপদমুক্ত হলেও বাইরের এই দুটি রাষ্ট্রের কোনো একটি থেকে বিপদ আগমনের আশঙ্কা বাকি থেকে যায়।

আল-কুদস ও শামের বিভিন্ন অঞ্চল জবরদখল করার পর পর খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা দামেশকসহ অবশিষ্ট শাম এবং পরে মিশর জয়ের স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু তাদের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত করতে সুলতান ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ. এক অব্যাহত জিহাদের ধারা শুরু করেন। তার সুযোগ্য উত্তরসূরি নুরুদ্দিন জিনকি রহ. সে ধারাকে আরও বেগবান করেন, সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. পবিত্র নগরী আল-কুদস পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে তাকে চূড়ান্ত লক্ষ্যপানে একধাপ এগিয়ে নেন। আর এর সফল পরিসমাপ্তি ঘটে চার মামলুক সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ, রুকনুদ্দিন বাইবার্স, সাইফুদ্দিন কালাউন ও আল-আশরাফ খলিলের মাধ্যমে।

সুলতান আল-আশরাফ খলিল ৬৯৩ হিজরি সনে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর মামলুক রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করেন তার ভাই আল-মালিকুন নাসির মুহাম্মাদ বিন কালাউন। তার শাসনকাল ৬৯৩ হিজরি থেকে ৭৪১ হিজরি সন (১২৯৩-১৩৪১ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। অতি অল্প বয়সে দায়িত্ব গ্রহণকারী সুলতান মুহাম্মাদ এ সময়ের মধ্যে দু-বার অপসারিত হন। প্রথমবার ৬৯৪ হিজরি সনে (১২৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) পাঁচ বছরের জন্য এবং দ্বিতীয়বার ৭০৮ হিজরি সনে (১৩০৮ খ্রিষ্টাব্দে) এক বছরের জন্য।

হালাকু খানের বংশধর গাজানের ইসলাম গ্রহণ

হিমসের যুদ্ধে পরাজয়ের পর তাতারদের অন্তর্বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। তারা যাকেই শাসক পদে বসাত, কিছুদিন পরই তাকে বরখাস্ত ও হত্যা করত। অবশেষে ৬৯৪ হিজরি সনে তাতার রাষ্ট্র ইলখানাতের শাসনভার গ্রহণ করেন হালাকু খানের প্রপৌত্র গাজান বিন আরগুন বিন আবাগা খান বিন হালাকু খান। গাজান সেনাপতি তুযুন-এর হাতে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন। গাজান ইসলাম গ্রহণ করার পর তার অনুসরণে তাতার জনগোষ্ঠীর প্রায় এক লক্ষ লোক ইসলাম গ্রহণ করে। গাজানের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার দিনটি ছিল এক ঐতিহাসিক দিন। তিনি সেদিন জনসাধারণের মাঝে স্বর্ণ-রুপা ছিটিয়ে দেন এবং নিজের নাম রাখেন 'মাহমুদ'। এরপর তিনি জুমার নামাজে উপস্থিত হন। মাহমুদ গাজান বহু গির্জা ধ্বংস করেন এবং খ্রিষ্টানদের ওপর জিজিয়া আরোপ করেন। তিনি বাগদাদ ও অন্যান্য অঞ্চলে বিভিন্ন অবিচারমূলক প্রথা বাতিল করেন। তার শাসনামলেই তাতারদের মাঝে ইসলামি শিক্ষার প্রসার শুরু হয়।

গাজানের শাম দখলের প্রচেষ্টা

এরপর গাজান তার রাজ্য মিশর ও শাম অঞ্চলেও বিস্তৃত করার মনস্থ করেন এবং শামের মুসলমানদের বিরুদ্ধে একাধিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। কোনো কোনো লড়াই সাধারণ খণ্ড-যুদ্ধে সীমাবদ্ধ থাকলেও কোনো কোনোটি ছিল চরম রক্তক্ষয়ী। এসব যুদ্ধের কারণে শামের মুসলমানদের চরম ক্ষতি পোহাতে হয়।

তাতারি দুর্যোগ মোকাবিলায় ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর অবিস্মরণীয় ভূমিকা

এ সময় মুসলিম জনমনে এই প্রশ্ন উদয় হয় যে, এসব তাতাররা তো মুসলমান। তারা মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধাচরণও করেনি। বরং তারা তো কখনো মুসলিম শাসকের বশ্যতাই স্বীকার করেনি যে, পরে বিরুদ্ধাচরণের প্রশ্ন আসবে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা কীকরে বৈধ হতে পারে? তখন ইবনে তাইমিয়া রহ. ফতোয়া প্রদান করেন যে, 'তারা হজরত আলি রাযি. ও মুয়াবিয়া রাযি.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী খারিজি সম্প্রদায়ের হুকুমভুক্ত। খারিজিরা মনে করত যে, তারা আলি রাযি. ও মুয়াবিয়া রাযি.-এর তুলনায় শাসন ক্ষমতার অধিক হকদার। তদ্রূপ এই তাতাররাও মনে করে যে, অন্যান্য মুসলমানের চেয়ে তারা হক প্রতিষ্ঠার অধিক হকদার। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্যায়-অবিচারে লিপ্ত থাকার অভিযোগ উত্থাপন করছে। অথচ তারা নিজেরা এর চেয়েও শত গুণ কঠিন অন্যায়ে লিপ্ত আছে।'

ইবনে তাইমিয়া রহ. মুসলমানদেরকে তাতারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আরও বলেন, 'তোমরা যদি আমাকে মাথায় কুরআন নিয়েও তাতারদের পক্ষে দণ্ডায়মান দেখতে পাও, তবুও আমাকে হত্যা করবে।'

ইবনে তাইমিয়া রহ. একদিকে যেমন শাম ও মিশরের মুসলিম জনসাধারণকে অটল-অবিচল থাকতে উদ্বুদ্ধ করছিলেন এবং শাসক-প্রশাসকদেরকে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করতে উৎসাহিত করছিলেন, অপরদিকে তিনি তাতারদের কাছে গিয়ে তাদের কাছ থেকে মুসলমানদের জন্য নিরাপত্তার ঘোষণা লাভের চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

৬৯৯ হিজরি সনের ৩ রবিউস সানি (১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর) ইবনে তাইমিয়া উলামায়ে কেরাম ও গণমান্য ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে তাতার শাসক গাজানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং

অত্যন্ত জোরালো ভাষায় দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। তার এই বক্তব্য মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

একই বছরের ৮ রজব (১৩০০ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ মার্চ) শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া তাতার সেনাপতি বুলাই-এর তাঁবুতে গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তার হাতে বন্দি ব্যক্তিদের মুক্তির বিষয়ে কথা বলেন। বন্দিদের মাঝে বেশ কিছু জিম্মি নাগরিকও ছিল। ইবনে তাইমিয়ার সুপারিশে সেনাপতি বুলাই সকল মুসলিম বন্দিকে মুক্তিদান করেন। কিন্তু ইবনে তাইমিয়া আপত্তি জানিয়ে বলেন, 'না, আমাদের জিম্মিদেরকেও মুক্তি দিতে হবে।' এরপর সেনাপতি বুলাই প্রচুর সংখ্যক বন্দিকে মুক্তি প্রদান করেন। ইবনে তাইমিয়া রহ. সেখানে তিনদিন অবস্থান করার পর ফিরে আসেন।

একবার তাতারদের একটি সৈন্যদল অভিযানে রওনা হয়ে দামেশকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন দামেশকের নাগরিকরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে। দামেশকের গভর্নর সকলের উদ্দেশে ঘোষণা করেন—'সকলে নগরপ্রাচীর সামলাও। কেউ আপন ঘরে অবস্থান করলে তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে।' তখন সকলে নগরীর প্রতিরক্ষার জন্য প্রাচীরের কাছে সমবেত হয়। ইবনে তাইমিয়া রহ. এ সময় প্রতি রাতে প্রাচীরের কাছে গিয়ে সকলকে জিহাদের আহ্বান জানাতেন এবং অটল-অবিচল থেকে শত্রুর মোকাবিলা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন।

যুদ্ধ চলাকালে ইবনে তাইমিয়া রহ. তার কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে বিভিন্ন পানশালায় গিয়ে মদের বোতল ও পানপাত্র ভেঙে ফেলতেন এবং অন্যায়ের আড্ডাখানা এসব পানশালার মালিকদেরকে কঠোর ভাষায় শাসাতেন। তিনি বলতেন, 'এদের কারণেই আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও বিজয় আগমনে বিলম্ব হচ্ছে।'

এরইমধ্যে শুরু হয় ৭০০ হিজরি সন। জনসাধারণ তখন তাতার-ভীতিতে প্রকম্পিত। কিন্তু ইবনে তাইমিয়া রহ. তাদের সাহস জোগাতে থাকেন এবং আল্লাহর নুসরত ও সাহায্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। মিশরের সুলতান আন-নাসির মুহাম্মাদ বিন কালাউন এ সময় দামেশকবাসীকে সহায়তাপ্রদান বন্ধ করে দিলে ইবনে তাইমিয়া রহ. মিশরে সফর করে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাকে বলেন, 'আপনি যদি শাম অঞ্চলের

শাসক না-ও হতেন আর শামবাসী আপনার কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করত, তখনও তাদেরকে সাহায্য করা আপনার অবশ্য কর্তব্য ছিল। অথচ আপনি তো তাদের শাসক ও সুলতান, তারা আপনার প্রজা ও অধীনস্থ এবং তাদের বিষয়ে আপনি পরকালে আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসিত হবেন। তাহলে তাদের বিষয়ে আপনার কর্মনীতি কীরূপ হওয়া উচিত?'

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এভাবেই মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি সকলকে সাহস ও শক্তি জোগাতেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নুসরত ও বিজয়লাভের প্রতিশ্রুতি শোনাতেন। আট দিন মিশরে অবস্থানের পর তিনি দামেশকে ফিরে আসেন।

তাতার শাসক গাজান যখন জানতে পারেন যে, মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার প্রতিরোধ করতে যাচ্ছে, তখন তিনি নিজ বাহিনীর দুর্বলতা ও সংখ্যাস্বল্পতার দিক বিবেচনা করে দেশে ফিরে যান।

৭০২ হিজরি সনে শামবাসী জানতে পারে যে, তাতাররা এবার নিশ্চিত শাম অঞ্চলে অভিযান চালাতে যাচ্ছে। ফলে শামের অধিবাসীদের মাঝে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যখন তারা জানতে পারে যে, স্বয়ং সুলতান আন-নাসির মুহাম্মাদ তার বাহিনী নিয়ে তাতারদের মোকাবিলায় শামে আগমন করছেন, তখন তারা নিশ্চিন্ত হয়।

শাকহাবের যুদ্ধ

৭০২ হিজরি সনের রমজান মাসে (১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে) দামেশকের দক্ষিণে শাকহাব প্রান্তরে সংঘটিত এ যুদ্ধে তাতাররা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। পরাজিত তাতার সৈন্যরা আশেপাশের পাহাড় ও টিলায় পালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেও খুব অল্প সংখ্যকই রেহাই পেতে সক্ষম হয়।

যুদ্ধ চলাকালে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে সৈন্যদের সারিতে-সারিতে গিয়ে তাদের মনোবল বৃদ্ধি করছিলেন। তিনি তাদের সামনে নিজে খাবার খেয়ে তাদেরকে বোঝাচ্ছিলেন যে, চলমান পরিস্থিতিতে তাদের জন্য রোজা না রাখা শ্রেয়তর।

সুলতান আন-নাসির মুহাম্মাদ বিন কালাউনও এই যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। যুদ্ধ চলাকালে তার ঘোড়া যেন ভীত হয়ে পালাতে না পারে, এজন্য তিনি তার ঘোড়াকে বেঁধে রেখেছিলেন। সমকালীন আব্বাসি

খলিফা ২য় মুসতাকফি বিল্লাহ আবুর রবি সুলায়মানও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

৭০৩ হিজরি সনে গাজান মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তাতারদের শাসনভার গ্রহণ করেন তার ভাই খোদাবান্দা (মুহাম্মাদ) বিন আরগুন। জনগণ তাকে 'আল-মালিক গিয়াসুদ্দিন' উপাধি প্রদান করে এবং ইরাক, খোরাসানসহ তাতারি রাষ্ট্র ইলখানাতের অধিভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলের মিম্বরে তার নামে খুতবা পাঠ শুরু হয়।

শাকহাবের যুদ্ধে তিক্ত পরাজয় বরণের পর তাতাররা পরে আর কখনো শাম বা মিশরের ইসলামি ভূখণ্ডে হামলা চালানোর দুঃসাহস দেখায়নি।

শিয়াদের পুনরুত্থান

তাতার শাসক খোদাবান্দা প্রথমদিকে সুন্নি মতাদর্শী ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি শিয়া মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শিয়া ধর্মমত গ্রহণ করেন এবং নিজ রাষ্ট্রে বিভিন্ন শিয়ারীতি চালু করেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন শিয়া আলিমের সাহচর্য গ্রহণ করেন; যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হালাকু খানের উজির খাজা নাসিরুদ্দিন তুসির শিষ্য জামালুদ্দিন বিন মুতাহহার আল-হিল্লি। শিয়া রাফিজিরা খোদাবান্দার সহায়তায় ইসলামি বিশ্বের আনাচেকানাচে শিয়া মতবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছিল। এমনকি মক্কার শিয়া প্রশাসক খামিছা মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে তাকে সহায়তা করার জন্য চলে আসে। কিন্তু খামিছার স্বপ্ন পূরণের আগেই ৭১২ হিজরি সনে খোদাবান্দা মৃত্যুবরণ করেন।

খোদাবান্দার মৃত্যুতে শিয়াদের পরিকল্পনা মাঠে মারা যায় এবং খামিছা ভগ্ন হৃদয়ে মক্কায় ফিরে যায়। দালকানদি নামক জনৈক রাফিজি নেতা হিজাযে শিয়া মতবাদের প্রচার-প্রসারের জন্য খামিছাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করেছিল। সে-ও খামিছার সঙ্গে মক্কার পথ ধরে। পথিমধ্যে আরব সর্দার মুহাম্মাদ বিন ঈসা তাদের দুজনের পথরোধ করেন এবং তাদেরকে পরাজিত করে সকল সম্পদ করায়ত্ত করে নেন। এ সংবাদ জানতে পেরে মুসলিম জনসাধারণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়। সুলতান আন-নাসির মুহাম্মাদ আরব সর্দার মুহাম্মাদ বিন ঈসার এই কীর্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে নিজের আস্থাভাজন করে নেন।

খোদাবান্দার মৃত্যুর পর তাতারদের শাসনভার গ্রহণ করেন তার পুত্র আবু সাইদ। তিনি তার পিতার মতাদর্শ পরিহার করে সুন্নি মতাদর্শ গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক ইবনে কাছির রহ. তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

> তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম তাতার নেতা, সুশাসক এবং সুন্নাহর প্রতি অধিকতর অবিচল। তিনি তার শাসনামলে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর অনুসারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং শিয়া রাফিজিদের হীনবল করেছেন।[১০৩]

আবু সাইদ ৭৩৬ হিজরি সনে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তাতারদের শক্তি ও প্রভাব কার্যত নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তারা পারস্পরিক বিবাদবিসংবাদে জড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন এশিয়া মহাদেশের ত্রাস ও হুমকি হয়ে বিচরণ করা তাতাররা এরপর নিজেদের রাজত্বে কোণঠাসা হয়ে পড়ে এবং সেই ভীতিকর প্রভাব পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তী সময়ে তৈমুর লংয়ের আমলে আবারও তাতাররা এশিয়া অঞ্চলের ত্রাস হিসেবে আবির্ভূত হয়।

সুলতান আন-নাসির মুহাম্মাদ বিন কালাউনের শাসনামলে মামলুক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক সমৃদ্ধি ঘটে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পেছনে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি যে পদক্ষেপটি কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল, তা হলো—তিনি মিশর অতিক্রমকারী প্রতিটি বাণিজ্যকাফেলার ওপর পণ্যমূল্যের দশ শতাংশ কর আরোপ করেছিলেন। সে সময় ইউরোপ ও ভারতবর্ষের পারস্পরিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক বেশ গতিশীল ছিল এবং ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোকে ভারতবর্ষে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছতে হলে মিশর অতিক্রম করতে হতো।

সুলতান আন-নাসির মুহাম্মাদ মামলুক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ উন্নতির প্রতিও যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি পরিমাপ ও ওজনব্যবস্থা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, মদপান নিষিদ্ধ করেন এবং শিষ্টাচার ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রতিষ্ঠায় কাজ করেন। তার শাসনামলে ইসলামি স্থাপত্য ও নির্মাণশিল্প উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো, বিশ্বের বিভিন্ন জাদুঘরে বিদ্যমান অধিকাংশ প্রাচীন ও দর্শকনন্দিত ইসলামি নিদর্শন এ সময়েরই অবদান।

---

[১০৩]. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১৪/১৪৮।

সুলতান মুহাম্মাদ নীলনদ ও সালাহুদ্দিন দুর্গের মাঝে পানি সরবরাহের কৃত্রিম খাল (কানাত)[১০৪] প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়াও তিনি নীলনদ হতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত খাল খনন করেন। সুলতান মুহাম্মাদ নীলনদের তীরঘেঁষে দীর্ঘ সড়ক নির্মাণ করেন, যা বন্যার সময় সেতুর কাজে দিত।

সুলতান আন-নাসির মুহাম্মাদ শীর্ণকায়, পঙ্গু ও এক-চক্ষুহীন ছিলেন। কিন্তু এতসব শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতাপশালী যোদ্ধা এবং দায়িত্বপালন ও সিদ্ধান্তগ্রহণে ইস্পাত-কঠিন।

সুলতান আন-নাসির মুহাম্মাদ বিন কালাউন ৭৪১ হিজরি সনে (১৩৪১ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় তিনি মামলুক রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করার মতো যোগ্য কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাননি। তার মৃত্যুর পর তার পুত্রগণ রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী একচল্লিশ বছরে একের পর এক তার আট পুত্র শাসনদায়িত্ব পালন করেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছিলেন হাসান বিন আন-নাসির মুহাম্মাদ। তিনি ৭৪৮ হিজরি সন হতে ৭৫২ হিজরি সন (১৩৪৭-১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত মামলুক রাষ্ট্র শাসন করেন। সুলতান হাসান বিন মুহাম্মাদই সেই সুবিশাল মাদরাসা-মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ করেন, যা বিশালতা ও নির্মাণকুশলতায় সমকালীন বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আসন লাভ করেছিল। সালাহুদ্দিন দুর্গের কাছেই অবস্থিত এই কমপ্লেক্সটি বর্তমানে সুলতান হাসান মসজিদ নামে প্রসিদ্ধ।

পরবর্তী সময়ে সার্কাসি মামলুকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাহরি মামলুক রাষ্ট্রের পতন ঘটে।

---

১০৪. কানাত ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন—মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত *সবুজ পৃথিবী ও মুসলমানদের অবদান*।

বাহরি মামলুক রাষ্ট্রের সুলতানগণের তালিকা

১.	আল-মুইয ইযযুদ্দিন আইবেক তুর্কমানি (নিহত)	:	৬৪৮-৬৫৫ হি. (১২৫০-১২৫৭ খ্রি.)
২.	আল-মানসুর নুরুদ্দিন আলি বিন ইযযুদ্দিন আইবেক (অপসারিত)	:	৬৫৫-৬৫৭ হি. (১২৫৭-১২৫৯ খ্রি.)
৩.	আল-মুযাফফার সাইফুদ্দিন কুতুজ (নিহত)	:	৬৫৭-৬৫৮ হি. (১২৫৯-১২৬০ খ্রি.)
৪.	আয-যাহির রুকনুদ্দিন বাইবার্স বুনদুকদারি (নিহত)	:	৬৫৮-৬৭৬ হি. (১২৬০-১২৭৭ খ্রি.)
৫.	আস-সাইদ নাসিরুদ্দিন বারাকা বিন রুকনুদ্দিন বাইবার্স (অপসারিত)	:	৬৭৬-৬৭৮ হি. (১২৭৭-১২৭৯ খ্রি.)
৬.	আল-আদিল বদরুদ্দিন সুলামিশ বিন রুকনুদ্দিন বাইবার্স (অপসারিত)	:	৬৭৮-৬৭৮ হি. (১২৭৯-১২৭৯ খ্রি.)
৭.	আল-মানসুর সাইফুদ্দিন কালাউন (স্বাভাবিক মৃত্যু)	:	৬৭৮-৬৮৯ হি. (১২৭৯-১২৯০ খ্রি.)
৮.	আল-আশরাফ সালাহুদ্দিন খলিল বিন সাইফুদ্দিন কালাউন (নিহত)	:	৬৮৯-৬৯৩ হি. (১২৯০-১২৯৩ খ্রি.)
৯. (ক)	আন-নাসির মুহাম্মাদ বিন সাইফুদ্দিন কালাউন (অপসারিত)	:	৬৯৩-৬৯৪ হি. (১২৯৩-১২৯৪ খ্রি.)
১০.	আল-আদিল যায়নুদ্দিন কুতবুগা (অপসারিত)	:	৬৯৪-৬৯৬ হি. (১২৯৪-১২৯৬ খ্রি.)
১১.	আল-মানসুর হুসামুদ্দিন লাজিন (নিহত)	:	৬৯৬-৬৯৮ হি. (১২৯৬-১২৯৮ খ্রি.)
০৯. (খ)	আন-নাসির মুহাম্মাদ বিন সাইফুদ্দিন কালাউন (অপসারিত)	:	৬৯৮-৭০৮ হি. (১২৯৮-১৩০৮ খ্রি.)

১২.	আল-মুযাফফার রুকনুদ্দিন (২য়) বাইবার্স (অপসারিত)	:	৭০৮-৭০৯ হি. (১৩০৮-১৩০৯ খ্রি.)
০৯. (গ)	আন-নাসির মুহাম্মাদ বিন সাইফুদ্দিন কালাউন (স্বাভাবিক মৃত্যু)	:	৭০৯-৭৪১ হি. (১৩০৯-১৩৪১ খ্রি.)
১৩.	আল-মানসুর সাইফুদ্দিন আবু বকর বিন আন-নাসির মুহাম্মাদ (অপসারিত)	:	৭৪১-৭৪২ হি. (১৩৪১-১৩৪১ খ্রি.)
১৪.	আল-আশরাফ আলাউদ্দিন কুজুক বিন আন-নাসির মুহাম্মাদ (অপসারিত)	:	৭৪২-৭৪২ হি. (১৩৪১-১৩৪১ খ্রি.)
১৫.	আন-নাসির শিহাবুদ্দিন আহমাদ বিন আন-নাসির মুহাম্মাদ (অপসারিত)	:	৭৪২-৭৪৩ হি. (১৩৪২-১৩৪২ খ্রি.)
১৬.	আস-সালিহ ইমাদুদ্দিন ইসমাইল বিন আন-নাসির মুহাম্মাদ (স্বাভাবিক মৃত্যু)	:	৭৪৩-৭৪৬ হি. (১৩৪২-১৩৪৫ খ্রি.)
১৭.	আল-কামিল সাইফুদ্দিন শাবান বিন আন-নাসির মুহাম্মাদ (নিহত)	:	৭৪৬-৭৪৭ হি. (১৩৪৫-১৩৪৬ খ্রি.)
১৮.	আল-মুযাফফর যায়নুদ্দিন হাজ্জি বিন আন-নাসির মুহাম্মাদ (নিহত)	:	৭৪৭-৭৪৮ হি. (১৩৪৬-১৩৪৭ খ্রি.)
১৯. (ক)	আন-নাসির বদরুদ্দিন হাসান বিন আন-নাসির মুহাম্মাদ (অপসারিত)	:	৭৪৮-৭৫২ হি. (১৩৪৭-১৩৫১ খ্রি.)
২০.	আস-সালিহ সালাহুদ্দিন সালিহ বিন আন-নাসির মুহাম্মাদ (অপসারিত)	:	৭৫২-৭৫৫ হি. (১৩৫১-১৩৫৪ খ্রি.)

১৯. (খ)	আন-নাসির বদরুদ্দিন হাসান বিন আন-নাসির মুহাম্মাদ (নিহত)	:	৭৫৫-৭৬২ হি. (১৩৫৪-১৩৬১ খ্রি.)
২১.	আল-মানসুর সালাহুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আল-মুযাফফার যায়নুদ্দিন হাজ্জি (অপসারিত)	:	৭৬২-৭৬৪ হি. (১৩৬১-১৩৬৩ খ্রি.)
২২.	আল-আশরাফ যায়নুদ্দিন শাবান বিন আল-আমজাদ হুসাইন বিন আন-নাসির মুহাম্মাদ (নিহত)	:	৭৬৪-৭৭৮ হি. (১৩৬৩-১৩৭৬ খ্রি.)
২৩.	আল-মানসুর আলাউদ্দিন আলি বিন আল-আশরাফ যায়নুদ্দিন (স্বাভাবিক মৃত্যু)	:	৭৭৮-৭৮৩ হি. (১৩৭৬-১৩৮১ খ্রি.)
২৪. (ক)	আস-সালিহ সালাহুদ্দিন হাজ্জি বিন আল-আশরাফ যায়নুদ্দিন (অপসারিত)	:	৭৮৩-৭৮৪ হি. (১৩৮১-১৩৮২ খ্রি.)
**	আয-যাহির সাইফুদ্দিন বারকুক[১০৫]	:	৭৮৪-৭৯১ হি. (১৩৮২-১৩৮৯ খ্রি.)
২৪ (খ)	আস-সালিহ সালাহুদ্দিন হাজ্জি বিন আল-আশরাফ যায়নুদ্দিন (অপসারিত)	:	৭৯১-৭৯২ হি. (১৩৮৯-১৩৯০ খ্রি.)

১০৫. আয-যাহির সাইফুদ্দিন বারকুক বাহরি মামলুক ছিলেন না; তিনি ছিলেন সার্কাসি মামলুক এবং তার মাধ্যমেই বাহরি মামলুক রাষ্ট্রের সমাপ্তি ও সার্কাসি মামলুক রাষ্ট্রের সূচনা ঘটে। তবে মাঝে তিনি ৭৯১ হিজরি সনে অপসারিত ও বন্দি হন এবং শেষ বাহরি মামলুক সুলতান আস-সালিহ সালাহুদ্দিন হাজ্জি পুনরায় ক্ষমতা লাভ করেন। বছরখানেক পরই বারকুক সালাহুদ্দিন হাজ্জিকে পরাভূত করে পুনরায় ক্ষমতা হস্তগত করেন এবং বাহরি মামলুক রাষ্ট্রের চূড়ান্ত পতন ঘটান।

দুই. সার্কাসি (বুরজি) মামলুক রাষ্ট্র

[৭৮৪-৯২২ হিজরি—১৩৮২-১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ]

সপ্তম বাহরি মামলুক সুলতান আল-মানসুর সাইফুদ্দিন কালাউন প্রচুর দাস ক্রয় করেছিলেন। তিনি তাদেরকে আল-জাবাল দুর্গের (সালাহুদ্দিন দুর্গ) বিভিন্ন বুরজ বা টাওয়ারে বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন বলে তারা বুরজি মামলুক নামে খ্যাতি লাভ করে। বংশমূল বিবেচনায় তারা বাহরি মামলুকদের তুলনায় ভিন্ন ছিল। বাহরি মামলুকরা ছিল তুর্কি বংশোদ্ভূত, অপরদিকে সার্কাসি মামলুক রাষ্ট্রের অধিকাংশ সুলতান ছিল সার্কাস (The Circassians) বংশোদ্ভূত। বাহরি মামলুক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি—সুলতান আল-মানসুর সাইফুদ্দিন কালাউনের পর থেকে সাম্রাজ্যের শাসনক্ষমতা অনেকটা বংশগত ও উত্তরাধিকারমূলক ছিল; কিন্তু সার্কাসি মামলুক রাষ্ট্র মোটেও বংশনির্ভর ছিল না। বরং তাদের প্রত্যেক শাসকের ক্ষমতাপ্রাপ্তির মূলে ছিল ব্যক্তিগত সামরিক খ্যাতি এবং সাম্রাজ্যের নেতৃস্থানীয় সেনাপতি ও প্রশাসকদের সমর্থনলাভের যোগ্যতা।

সার্কাসি মামলুক রাষ্ট্রের সুলতানের সংখ্যা তেইশজন। তাদের মধ্য থেকে নয়জনের শাসনকাল একশ পঁচিশ বছর; আর বাকি নয় বছরে শাসনদায়িত্ব পালন করেন চৌদ্দজন সুলতান!

সার্কাসি মামলুক রাষ্ট্রের অধিকাংশ সুলতান ও তাদের অধীনস্থ প্রশাসকগণ ছিল জ্ঞানানুরাগী। বিশালাকার প্রাসাদ, মসজিদ, মাদরাসা, সড়ক, পথঘাট ও বিভিন্ন কল্যাণমূলক স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণে প্রতিযোগিতার কারণে তাদের নাম ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। কায়রোতে বিদ্যমান অধিকাংশ ঐতিহাসিক স্থাপনা তাদের নির্মিত। তবে অধিকাংশ সার্কাসি সুলতান অত্যাচারী ও কঠোর ছিল। তারা জনগণের কাঁধে বিভিন্ন করের বোঝা চাপিয়ে দিত। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের শাসনামলে সাম্রাজ্যের প্রতিটি স্তরে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়, বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায় এবং অর্থের বিনিময়ে ন্যায়বিচার বেচাকেনা হতে থাকে। জনগণ সেনাবাহিনীর অনাচার-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

তবে পারস্পরিক শত বিরোধ-বিসংবাদ থাকলেও সার্কাসি মামলুক রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ শত্রুর মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হতো। এভাবে প্রায় দেড় শতাব্দী কাল তারা মামলুক রাষ্ট্রকে বহিঃআক্রমণ থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হয়।

সার্কাসি মামলুক রাষ্ট্রের প্রথম সুলতান ছিলেন আল-মালিকুয যাহির সাইফুদ্দিন বারকুক। তিনি শেষ বাহরি মামলুক সুলতান আস-সালিহ সালাহুদ্দিন হাজ্জিকে অপসারণ করে সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। পরে বাহরি মামলুকরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে সরিয়ে সালাহুদ্দিন হাজ্জিকে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনে। বছরখানেক পর তিনি তাদেরকে দমন করে আবারও ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হন।

তাতারি হুমকি আরও একবার!

তাতাররা ৭৯৫ হিজরি সনে (১৩৯৩ খ্রিষ্টাব্দে) সেনাপতি তৈমুর লং-এর নেতৃত্বে বাগদাদে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ৭৯৭ হিজরি সনে পুরো মেসোপটেমিয়া অঞ্চল তাতারদের অধিকারে চলে যায়। এরপর তৈমুর লং মামলুক রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসকদের কাছে বার্তা প্রেরণ করে মিশর ভূমি তার হাতে সঁপে দিতে বলেন। সুলতান সাইফুদ্দিন বারকুক তৎক্ষণাৎ তৈমুর-বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শামের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসক ও উসমানি সুলতান ১ম বায়জিদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হন। কিন্তু এরইমধ্যে সুলতান বারকুকের অন্তিমলগ্ন ঘনিয়ে আসে এবং তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বেই ৮০১ হিজরি সনে (১৩৯৯ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি ইন্তেকাল করেন। তাতারি আগ্রাসন প্রতিরোধের দায়িত্ব এবার অর্পিত হয় তার পুত্র আন-নাসির যায়নুদ্দিন ফারাজের কাঁধে। ফারাজের বয়স তখন মাত্র তেরো বছর!

৮০৩ হিজরি সনে তৈমুর লং আলেপ্পোকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে দামেশক অভিমুখে রওনা হন। সুলতান ফারাজ তার মোকাবিলা করার জন্য শামের উদ্দেশে মিশর ত্যাগ করেন। দামেশকের কাছে দুই পক্ষের মধ্যে একাধিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এবং প্রতিটিতেই মিশরীয় বাহিনী জয়লাভ করে। অবস্থাদৃষ্টে তৈমুর লং সুলতান ফারাজের কাছে সন্ধিপ্রস্তাব পাঠালে সুলতান তাতে সাড়া দেন।

উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় হঠাৎ করেই মিশরীয় বাহিনীর মামলুকদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। তারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে মিশরে ফেরার পথ ধরে। ফলে সুলতান ফারাজ হতাশ হয়ে পড়েন এবং বাকি সৈন্যদের নিয়ে দ্রুত মিশরে ফিরে আসতে বাধ্য হন। দামেশকের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব এখন দামেশকবাসীকে একাই বহন করতে হবে। এ সুযোগে তৈমুর লং দামেশকে প্রবেশ করে আলেপ্পোর মতো দামেশকেও প্রচুর ধ্বংসযজ্ঞ ও রক্তপাত ঘটান।

৮০৮ হিজরি সনে (১৪০৫ খ্রিষ্টাব্দে) মামলুকরা ফারাজকে অপসারণ করে এবং তার ভাই আল-মানসুর আবদুল আজিজকে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত করে। অবশ্য ছয় মাস পরই ফারাজ তার ক্ষমতা ফিরে পেতে সক্ষম হন। দ্বিতীয়বার ক্ষমতা গ্রহণ করার পর সুলতান ফারাজ শাম অঞ্চলে মামলুক রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মজবুতকরণ ও বিদ্রোহী প্রশাসকদের বশীভূত করার লক্ষ্যে শামে বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেন।

সুলতান আল-আশরাফ বার্সবাই

৮১৫ হিজরি সনে (১৪১২ খ্রিষ্টাব্দে) সুলতান আন-নাসির যায়নুদ্দিন ফারাজ ইন্তেকাল করার পর মামলুক রাষ্ট্রের পরিস্থিতি শোচনীয় হয়ে পড়ে। পরবর্তী দশ বছরে সুলতান পদে চার-চারবার পরিবর্তন ঘটে; কিছুদিন সুলতান পদ শূন্যও থাকে এবং তৎকালীন আব্বাসি খলিফা ২য় মুসতাইন বিল্লাহই মামলুক রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। অবশেষে ৮২৫ হিজরি সনে (১৪২২ খ্রিষ্টাব্দে) মামলুক রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করেন সুলতান আল-আশরাফ সাইফুদ্দিন বার্সবাই। তিনি ৮২৫ হিজরি থেকে ৮৪১ হিজরি সন (১৪২২-১৪৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত সুলতান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সুলতান বার্সবাই বিভিন্ন উচ্চহারের কর আরোপ করে এবং বাণিজ্য ক্ষেত্রে নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করে জনজীবন আরও কঠিন করে তোলেন। তবে তার কঠোর শাসনব্যবস্থা ও অত্যধিক প্রভাবের কারণে তার শাসনামলে মামলুক রাষ্ট্রে কোনো ধরনের বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়নি।

সাইপ্রাস বিজয়

৬৯০ হিজরি সনে (১২৯১ খ্রিষ্টাব্দে) মামলুক সুলতান আল-আশরাফ খলিলের হাতে আক্কা নগরীর পতন ঘটার পর সাইপ্রাস প্রাচ্যে খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে পরিণত হয়। যেকোনো স্থানে মুসলমানদের হাতে পরাজিত ক্রুসেডারদের জন্য সাইপ্রাস সর্বদা উন্মুক্ত থাকত।

১ম পিটার লুসিনান (Peter I de Lusignan) সাইপ্রাসের শাসক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সমুদ্রপথে মুসলমানদের বিভিন্ন জাহাজের ওপর হামলা চালিয়ে দখল করে নিতে থাকেন। তিনি ৭৬৭ হিজরি সনে (১৩৬৫ খ্রিষ্টাব্দে) আলেকজান্দ্রিয়ায় আক্রমণ করেন এবং নির্বিচারে গণহত্যা চালান। জুমার দিন হওয়ায় অধিকাংশ মানুষ তখন মসজিদে ছিল। পরে মামলুকদের সৈন্যসমাবেশের সংবাদ পেয়ে ১ম পিটার পালিয়ে যান এবং সঙ্গে করে প্রায় পাঁচ হাজার লোককে বন্দি করে নিয়ে যান।

সুলতান আল-আশরাফ বার্সবাই ৮২৭ হিজরি সনে (১৪২৪ খ্রিষ্টাব্দে) সাইপ্রাসের ক্রুসেডারদের দমনের সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রথমে একটি অনুসন্ধানী ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করেন। উক্ত বাহিনী সাইপ্রাসের লিমাসোল (Limassol) বন্দরে অভিযান চালিয়ে খ্রিষ্টানদের কয়েকটি জাহাজ ডুবিয়ে দেয় এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যুদ্ধবন্দি নিয়ে ফিরে আসে।

এরপর ৮২৮ হিজরি সনের রজব মাসে (১৪২৫ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে) সুলতান বার্সবাই সাইপ্রাসের উদ্দেশে আরেকটি বাহিনী প্রেরণ করেন। মুসলিম বাহিনী সাইপ্রাসে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই করে। যুদ্ধে প্রচুর সংখ্যক ক্রুসেডার নিহত হয়। সাইপ্রাসে সুলতানের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর মুসলিম অভিযাত্রীরা এক হাজার যুদ্ধবন্দি ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে মিশরে ফিরে আসে।

৮২৯ হিজরি সনে (১৪২৬ খ্রিষ্টাব্দে) সুলতান বার্সবাই সাইপ্রাসে চূড়ান্ত অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে আরেকটি বাহিনী প্রেরণ করেন। মুসলিম বাহিনী এবার ক্রুসেডারদের চূড়ান্তরূপে পরাজিত করে। মুসলমানরা সাইপ্রাসের রাজধানী নিকোসিয়া (Nicosia) নগরীতে প্রবেশ করে সেখানকার গির্জায় জুমার নামাজ আদায় করে। এবারের অভিযানের

মাধ্যমে পুরো সাইপ্রাস সুলতান আল-আশরাফ বার্সবাইয়ের কর্তৃত্বে চলে আসে।

সুলতান বার্সবাই মিশর হয়ে গমনকারী বিদেশি জাহাজের ওপর অত্যধিক উচ্চ হারে কর আরোপ করেন। ফলে বিদেশি বণিক ও ব্যবসায়ীরা অসন্তোষ প্রকাশ করে। ফরাসিরা তাদের সকল ব্যবসায়ীকে মিশর থেকে ডেকে পাঠায়। অবশেষে সুলতান বার্সবাই মিশরের অর্থনৈতিক মন্দার আশঙ্কায় তাদের দাবি-দাওয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

সুলতান আল-আশরাফ সাইফুদ্দিন বার্সবাই ৮৪১ হিজরি সনে (১৪৩৮ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন এবং তার পুত্র আল-আজিজ জামালুদ্দিন ইউসুফ তার স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু মাসতিনেক পরই তিনি অপসারিত হন। পরবর্তী একত্রিশ বছরে একে একে সাতজন সুলতান মামলুক রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করেন। তবে ইতিহাসে তাদের উল্লেখযোগ্য কোনো অংশগ্রহণ ও অবদান নেই। অবশেষে ৮৭৩ হিজরি সনে (১৪৬৮ খ্রিষ্টাব্দে) মামলুক রাষ্ট্রের হাল ধরেন আল-আশরাফ কাইতাবাই। তিনি ৯০২ হিজরি সন (১৪৯৬ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত একটানা উনত্রিশ বছর সুলতান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কাইতাবাই ছিলেন সার্কাসি মামলুক রাষ্ট্রের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি সুলতান। তিনি ছিলেন সুঠামদেহী বীর যোদ্ধা। জনগণ ও সেনাপতিগণ তাকে ভালবাসত।

সুলতান কাইতাবাইয়ের মূল প্রতিপক্ষ ছিল ততদিনে মুসলিমবিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হওয়া উসমানি সালতানাত। ৮৫৭ হিজরি সনে (১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে) কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর উসমানিরা পার্শ্ববর্তী অন্যান্য শাসকগোষ্ঠীর মূল হুমকিতে পরিণত হয়েছিল। এ সময় উসমানি শাসকগণ মিশর ও শামের বিভিন্ন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে এবং মিশরে দাস বিক্রিতে বাধা প্রদান করে।

উসমানি সুলতান ২য় বায়জিদের ভাই সুলতান জেম (Cem Sultan) বায়জিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পালিয়ে মিশরে চলে এলে সুলতান কাইতাবাই তাকে আশ্রয় দেন এবং যথেষ্ট সমাদর করেন। এতে বায়জিদ কাইতাবাইর প্রতি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হন। একে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে একাধিক রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের ঘটনা ঘটে।

৯০২ হিজরি সনে (১৪৯৬ খ্রিষ্টাব্দে) কাইতাবাই অসুস্থ হয়ে পড়লে সাম্রাজ্যের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাকে অপসারণ করে তার পুত্র আন-নাসির নাসিরুদ্দিন মুহাম্মাদের হাতে বায়আত গ্রহণ করে। পরের দিনই কাইতাবাই ইন্তেকাল করেন।

সুলতান আল-আশরাফ কাইতাবাই স্থাপত্যশিল্পের প্রচণ্ড অনুরাগী ছিলেন। একমাত্র বাহরি মামলুক সুলতান আন-নাসির মুহাম্মাদ বিন সাইফুদ্দিন কালাউনের শাসনামলে নির্মিত স্থাপনাসমূহ সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্বে কাইতাবাইয়ের আমলে নির্মিত স্থাপনাসমূহের সঙ্গে তুল্য হতে পারে।

সুলতান কাইতাবাইয়ের ইন্তেকালের পর পরবর্তী পাঁচ বছরে মামলুক রাষ্ট্রে একে একে পাঁচজন সুলতান ক্ষমতারোহণ করেন। অবশেষে ৯০৬ হিজরি সনে (১৫০১ খ্রিষ্টাব্দে) মামলুক রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সুলতান আল-আশরাফ কানসুহ আল-ঘুরি। তিনি ৯২২ হিজরি সন (১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত মামলুক রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। জামে ঘুরি ও ঘুরি মাদরাসা তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন।

সুলতান কানসুহ আল-ঘুরি ষাট বছর বয়সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের অল্প কয়েক বছর পূর্বে ১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা (Vasco da Gama) দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ অব গুড হোপ (The Cape of Good Hope) আবিষ্কার করেছিলেন। এই আবিষ্কারের ফলে ভারতবর্ষগামী ইউরোপিয়ান বাণিজ্য কাফেলাগুলোর যাতায়াতপথ বদলে যায় এবং মিশরের পরিবর্তে এ পথেই কাফেলাগুলোর চলাচল শুরু হয়। ফলে মিশরের মামলুক রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে মারাত্মক ধস নামে। একে কেন্দ্র করে পর্তুগালের সঙ্গে মামলুকদের বিরোধ ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

৯১৮ হিজরি সনে উসমানি সুলতান ১ম সেলিম খান তার বাহিনী নিয়ে শাম অঞ্চলে অভিযান শুরু করেন। ৯২২ হিজরি সনের ২৫ রজব (১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ আগস্ট) আলেপ্পোর উত্তরে মার্‌জ দাবিকের ময়দানে উসমানি বাহিনী মামলুক বাহিনীর মুখোমুখি হয়। যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই উসমানি বাহিনী জয়লাভ করে এবং মামলুক সুলতান কানসুহ আল-ঘুরি নিহত হন।

সুলতান আল-ঘুরি নিহত হওয়ার পর মামলুক রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করেন তার ভ্রাতুষ্পুত্র ও শেষ সার্কাসি মামলুক সুলতান আল-আশরাফ ২য় তুমান বাই।

সুলতান তুমান বাই সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার মাধ্যমে মামলুক সেনাবাহিনীকে পুনঃসংগঠিত করেন এবং উসমানি বাহিনীর প্রতিরোধে অগ্রসর হন। ৯২২ হিজরি সনের ২৯ জিলহজ (১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি) মিশরের রায়দানিয়া (Raydaneyah) এলাকায় উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। যুদ্ধে মামলুক বাহিনী পরাজিত হয়। সুলতান তুমান বাইকে বন্দি করা হয় এবং কায়রোর যুবাইলা দ্বারের (Bab Zuweila) ওপর শূলে চড়ানো হয়।

তুমান বাইয়ের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মিশরে মামলুক রাষ্ট্রের পতন ঘটে এবং মিশর উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

উসমানি সুলতান ১ম সেলিম মিশর জয় করে তৎকালীন আব্বাসি খলিফা ৩য় মুতাওয়াককিলকে বন্দি করে মিশর থেকে ইস্তাম্বুলে নিয়ে আসেন। মুতাওয়াককিল সেলিমের কাছে এ মর্মে অসিয়ত করেন যে, তার মৃত্যুর পর মুসলিম উম্মাহর খিলাফতের দায়িত্ব আব্বাসি রাজবংশ হতে উসমানি পরিবারের কাছে স্থানান্তরিত হবে। খলিফা মুতাওয়াককিল নিজের কাছে সংরক্ষিত খিলাফতের বিভিন্ন নিদর্শনও সুলতান সেলিমের কাছে হস্তান্তর করেন। মূলত এর মাধ্যমেই আব্বাসি খিলাফতের পতন ঘটে এবং উসমানি খিলাফতের সূচনা হয়। ৯৫০ হিজরি সনে (১৫৪৩ খ্রিষ্টাব্দে) মুতাওয়াককিলের মৃত্যু হলে কাগজে-কলমেও আব্বাসি খিলাফতের পতন ঘটে এবং শুরু হয় ইসলামি ইতিহাসের এক নব-অধ্যায়, যার নাম ‘উসমানি খিলাফত’।

* * *

সার্কাসি (বুরজি) মামলুক রাষ্ট্রের সুলতানগণের তালিকা

১. (ক)	আয-যাহির সাইফুদ্দিন বারকুক	:	৭৮৪-৭৯১ হি. (১৩৮২-১৩৮৯ খ্রি.)
**	আস-সালিহ সালাহুদ্দিন হাজ্জি[১০৬]	:	৭৯১-৭৯২ হি. (১৩৮৯-১৩৯০ খ্রি.)
১. (খ)	আয-যাহির সাইফুদ্দিন বারকুক	:	৭৯২-৮০১ হি. (১৩৯০-১৩৯৯ খ্রি.)
২. (ক)	আন-নাসির যায়নুদ্দিন আবুস সাআদাত ফারাজ বিন বারকুক	:	৮০১-৮০৮ হি. (১৩৯৯-১৪০৫ খ্রি.)
৩.	আল-মানসুর ইযযুদ্দিন আবুল ইয আবদুল আজিজ বিন বারকুক	:	৮০৮-৮০৯ হি. (১৪০৫-১৪০৬ খ্রি.)
২. (খ)	আন-নাসির যায়নুদ্দিন আবুস সাআদাত ফারাজ বিন বারকুক	:	৮০৯-৮১৫ হি. (১৪০৬-১৪১২ খ্রি.)
**	খলিফা ২য় মুসতাইন বিল্লাহ আবুল ফজল আব্বাস[১০৭]	:	৮১৫ হি. (১৪১২ খ্রি.)
৪.	আল-আমির শাইখুল মুআইয়াদ আবুন নাসর	:	৮১৫-৮২৪ হি. (১৪১২-১৪২১ খ্রি.)

---

১০৬. পূর্বেও এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে যে, আস-সালিহ সালাহুদ্দিন হাজ্জি সার্কাসি মামলুক ছিলেন না; তিনি ছিলেন শেষ বাহরি মামলুক সুলতান। ৭৮৪ হিজরি সনে প্রথম সার্কাসি মামলুক সুলতান আয-যাহির সাইফুদ্দিন বারকুক তাকে অপসারিত করে শাসনভার গ্রহণ করলেও ৭৯১ হিজরি সনে সালাহুদ্দিন হাজ্জি পুনরায় ক্ষমতা লাভ করেন। বছরখানেক পর বারকুক পুনরায় সালাহুদ্দিন হাজ্জিকে পরাভূত করে ক্ষমতা হস্তগত করেন এবং বাহরি মামলুক রাষ্ট্রের চূড়ান্ত পতন ঘটান।

১০৭. তিনি ছিলেন ৪৭ নং আব্বাসি খলিফা। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এ সময় মিশরে কোনো সুলতান না থাকায় খলিফাই সালতানাতের দায়িত্ব পালন করেন।

৫.	আল-মুযাফফার আবুস সাআদাত আহমাদ	:	৮২৪ হি. (১৪২১ খ্রি.)
৬.	আয-যাহির সাইফুদ্দিন আবুল ফাতহ তাতার	:	৮২৪ হি. (১৪২১ খ্রি.)
৭.	আস-সালিহ নাসিরুদ্দিন মুহাম্মাদ	:	৮২৪-৮২৫ হি. (১৪২১-১৪২২ খ্রি.)
৮.	আল-আশরাফ সাইফুদ্দিন বার্সবাই	:	৮২৫-৮৪১ হি. (১৪২২-১৪৩৮ খ্রি.)
৯.	আল-আজিজ জামালুদ্দিন ইউসুফ আবুল মাহাসিন বিন বার্সবাই	:	৮৪১-৮৪২ হি. (১৪৩৮ খ্রি.)
১০.	আয-যাহির আবু সাইদ জাকমাক	:	৮৪২-৮৫৭ হি. (১৪৩৮-১৪৫৩ খ্রি.)
১১.	আল-মানসুর আবুস সাআদাত ফখরুদ্দিন উসমান	:	৮৫৭ হি. (১৪৫৩ খ্রি.)
১২.	আল-আশরাফ আবুন নাসর সাইফুদ্দিন ইনাল আলায়ি	:	৮৫৭-৮৬৫ হি. (১৪৫৩-১৪৬১ খ্রি.)
১৩.	আল-মুআইয়াদ আবুল ফাতাহ শিহাবুদ্দিন আহমাদ	:	৮৬৫ হি. (১৪৬১ খ্রি.)
১৪.	আয-যাহির আবু সাইদ সাইফুদ্দিন খোশকদম	:	৮৬৫-৮৭২ হি. (১৪৬১-১৪৬৭ খ্রি.)
১৫.	আয-যাহির আবুন নাসর সাইফুদ্দিন বিলবাই	:	৮৭২ হি. (১৪৬৭ খ্রি.)
১৬.	আয-যাহির আবু সাইদ তিমুরবুগা	:	৮৭২-৮৭৩ হি. (১৪৬৭-১৪৬৮ খ্রি.)
১৭.	আল-আশরাফ সাইফুদ্দিন কাইতাবাই	:	৮৭৩-৯০২ হি. (১৪৬৮-১৪৯৬ খ্রি.)

১৮.	আন-নাসির নাসিরুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন কাইতাবাই	:	৯০২-৯০৪ হি. (১৪৯৬-১৪৯৮ খ্রি.)
১৯.	আয-যাহির আবু সাইদ কানসুহ	:	৯০৪-৯০৫ হি. (১৪৯৮-১৫০০ খ্রি.)
২০.	আল-আশরাফ আবুন নাসর জানবালাত	:	৯০৫-৯০৬ হি. (১৫০০-১৫০১ খ্রি.)
২১.	আল-আদিল আবুন নাসর সাইফুদ্দিন তুমান বাই	:	৯০৬ হি. (১৫০১ খ্রি.)
২২.	আল-আশরাফ কানসুহ আল-ঘুরি	:	৯০৬-৯২২ হি. (১৫০১-১৫১৬ খ্রি.)
২৩.	আল-আশরাফ ২য় তুমান বাই	:	৯২২-৯২৩ হি. (১৫১৬-১৫১৭ খ্রি.)

।। তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত ।।

এমন একটি দিনের স্বপ্ন দেখি!

আমি সেই দিনটির স্বপ্ন দেখি—

যেদিন পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে ‘ইসলামি ইতিহাস’। সত্য-অসত্যের মিশ্রণমুক্ত, বিকৃতি ও অতিরঞ্জনমুক্ত বিশুদ্ধ ‘ইসলামি ইতিহাস’।

মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে মানুষের হাতে-হাতে পৌঁছবে ‘ইসলামি ইতিহাস’।

আমি সেই দিনটির স্বপ্ন দেখি—

যেদিন প্রত্যেকে জানবে, শাশ্বত ধর্ম ইসলাম নির্মাণ করেছে এক অনুপম-বিশ্বজনীন ইতিহাস।

সকলে উপলব্ধি করবে, মুসলিম জাতির আছে সুগভীর অস্তিত্ব-শেকড়, কখনো তা উৎপাটন করা যাবে না।

সবাই বিশ্বাস করবে, এ মহান জাতি টিকে থাকবে ততদিন, যতদিন পৃথিবীতে থাকবে অনুভব ও প্রাণের স্পন্দন।

আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি—

একদিন যেমন মুসলিম উম্মাহ আসীন ছিল পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে, বিজয়ের পথ ধরে আবারও একদিন তারা গ্রহণ করবে জগতের নেতৃত্বভার।

মহান আল্লাহ তাআলা তো আপন কর্মে পূর্ণ ক্ষমতাবান; যদিও অধিকাংশ লোক তা জানে না!

—ড. রাগিব সারজানি

B0070
ISBN
9 789848 012604

মাকতাবাতুল হাসান